জীবনকথা

জসীম উদ্‌দীন (পল্লীকবি)

পলাশ প্রকাশনী

প্রকাশক ঃ
ফিরোজ আনোয়ার
পলাশ প্রকাশনী
C/০ ষ্টুডেন্ট ওয়েজ
বাংলা বাজার, ঢাকা—১

পরিবেশক ঃ
লতিফ বুক করপোরেশন
পাটুয়াটুলী, ঢাকা—১
নওরোজ কিতাবিস্তান
বাংলা বাজার, ঢাকা—১
সিটি লাইব্রেরী
বাংলা বাজার, ঢাকা—১

প্রথম প্রকাশ ঃ
১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১ (বাং)
১৫ই মে, ১৯৬৪ (ইং)
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ
২১, বৈশাখ, ১৩৭৫ (বাং)
৭, মে, ১৯৬৮ (ইং)
তৃতীয় মুদ্রণ ঃ
১লা আশ্বিন, ১৩৮৩ (বাং)
১৬, সেপটেম্বর, ১৯৭৬ (ইং)

বাঁধাই ঃ
ইউসুফ এণ্ড কোং
১৭, পি, কে, রায় লেন, ঢাকা

মুদ্রণে ঃ
শামিম প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২ নন্দলালদত্ত লেন, ঢাকা—১

উৎসর্গ:

সুসাহিত্যিক বন্ধুবর **আমির হোসেন চৌধুরী**, ঢাকা রায়ের বাজারের **জিন্নাত আলী মাষ্টার** ও তাঁহার পরিবারের যে সকল মহৎ-প্রাণ ব্যাক্তি গত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অসহায় হিন্দুদের রক্ষা করিতে যাইয়া জীবনদান করিয়াছেন তাঁহাদের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে এবং দেশের চারিদিকে শতে-সহস্রে যাঁহারা জান-মাল বিপন্ন করিয়া পূর্ব পাকিস্তান হইতে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা দূর করিয়াছেন তাঁহাদের হাতে অতি শ্রদ্ধার সহিত এই পুস্তক উৎসর্গ করিলাম।

॥ ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১ ॥ জসীম উদ্‌দীন

দুই বৎসর আগে অসুস্থ অবস্থায় করাচীতে বসিয়া আমি আমার জীবনকথা লিখিতে আরম্ভ করি, তারপর দেশে ফিরিয়া এই পুস্তকের প্রথম খণ্ড সমাপ্ত করিলাম। কিন্তু লিখিতে বসিয়া মনে হইল, আমার জীবন-কথা বুঝি কোন দিনই শেষ হইবার নয়। জীবনের সুদীর্ঘ পথ-বাঁকে কত জনের সঙ্গে পরিচয় হইয়া কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। কত জনের কাছে কত রকমের সাহায্য পাইয়াছি। তাঁহাদের কথাও একে একে লিখিতে হইবে। গ্রাম্য-গান সংগ্রহ করিতে আমাকে উভয় বঙ্গের বহু গ্রামে ঘুরিতে হইয়াছে। কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা ও অধ্যাপনা কালে এবং কলিকাতা ও ঢাকা সেক্রেটারিয়েটে চাকরী-জীবনে আমার অনেক অভিজ্ঞতা জমা হইয়া আছে। গ্রাম্য-গান প্রচারে আমাকে বহু প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। এই উপলক্ষে কলিকাতা ও ঢাকার বহু গায়ক গায়িকা ও বিভিন্ন গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গে আমার পরিচয় হইয়াছে। এই সকলও লিখিতে হইবে। কিন্তু পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হইয়া যায় মনে করিয়া এবারের মত শুধু আমার বাল্যজীবনের ঘটনাগুলিকেই প্রকাশ করিলাম।

চিত্রালীতে এই পুস্তক ধারাবাহিক প্রকাশ করিয়া সোদর-প্রতিম এস, এম, পারভেজ আমার ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। চিত্রালীতে বহু পাঠক পত্র লিখিয়া গ্রন্থকারকে উৎসাহিত করিয়াছেন। একজন লিখিয়াছেন ঃ

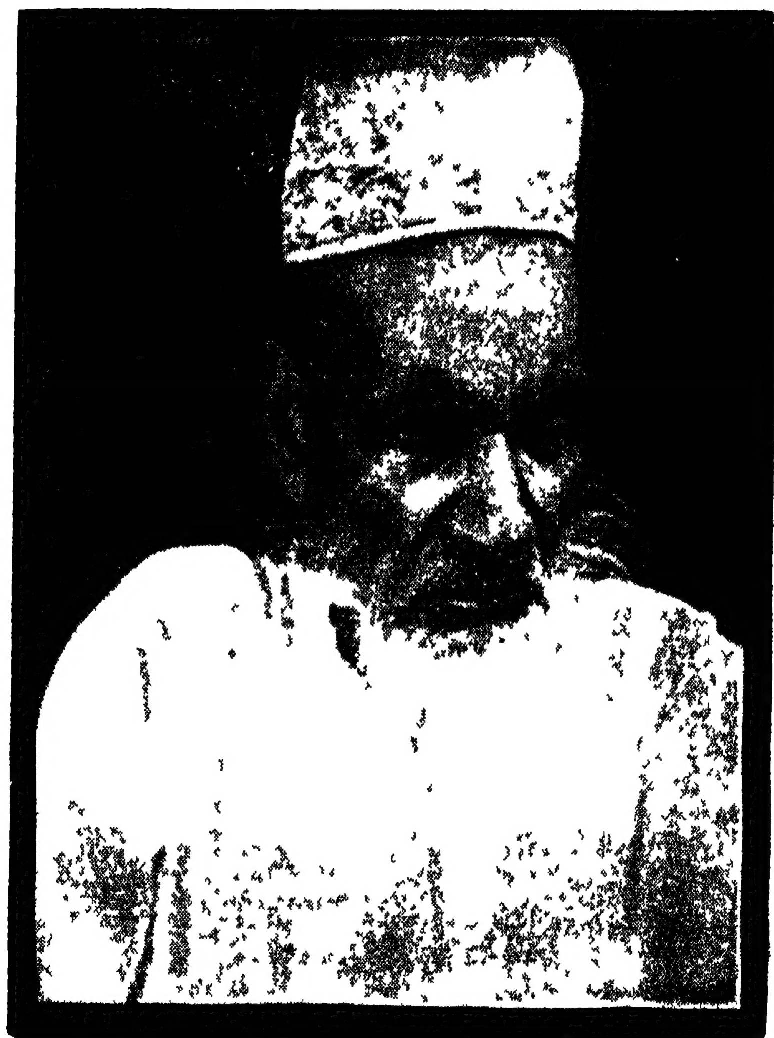
'জসীম উদ্‌দীনের জীবনকথা পড়িতেছি না মায়ের হাতে পিঠা খাইতেছি।' ইহাদের সকলকেই আমার ধন্যবাদ জানাইতেছি।

জসীম উদ্‌দীন

পলাশ বাড়ি
১০ নং কবি জসীম উদ্‌দীন রোড
কমলাপুর, ঢাকা—১৪
॥ ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৭১ ॥

সূচী

আমার অন্ধ দাদা ৩৫
আমার মা ৪৫
কেদারীর মা ৫৭
মায়ের সংসার ৬১
রাঙা ছুটুর বাপের বাড়ি ৬৬
গ্রাম্য মামলা ৯৫
হানিফ মোল্লা ৯৯
যাদব ঢুলী ১০৫
সরিতুল্লা হাজী ১০৭
হিতৈষী স্কুলে ১০৯
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ১১০
কবি গান ১১৬
কবিতা রচনা ১২৮
মধু পণ্ডিত ১৩১
চৈত্র পূজা ১৩৩
সেকালের যাত্রা গান ১৪০
থিয়েটার ১৪৩
সন্ন্যাসী ঠাকুর ১৪৫
অধ্যাপক এস, সি, সেন ১৮৭
ফরিদপুর জেলা স্কুলে ১৯৩
স্কুলের পথে ২০৭
ধীরেনদের বাসায় ২১৩
মনাদা ২২৭
মেজদি আর সেজদি ২৩৫
সেজদি ২৩৭
সেবা-সমিতির সভ্য হিসাবে ২৪৪
ডাক্তার সুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ২৬০
সুবোধ ডাক্তার ২৬৩
অন্যান্য সেবা কাজ ২৭৪
তেহের ফকির ২৭৯
বড়ু ২৮৩



আমার পিতা।

জীবনকথা

আজ রোগশয্যায় বসিয়া কতজনের কথাই মনে পড়িতেছে। সুদীর্ঘ জীবনের পথে কতজনই আসিয়াছে আবার কতজনই চলিয়া গিয়াছে। কেহ দূরে চলিয়া গিয়াছে! কেহ চির জনমের মত পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়া গিয়াছে! সকলের কথা আজ ভাল করিয়া মনে নাই। কিন্তু তাহাদের কেহ কেহ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে। যাহারা দূরে চলিয়া গিয়াছে, যাহারা মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে, তাহারা সকলেই আমার মানসলোকে নিত্য যাওয়া আসা করিয়া আমার সঙ্গে যোগ-সংযোগ করিতেছে। কত বিগত দিনের সুখ স্মৃতি বহিয়া আনিয়া তাহারা আমার মনে কল্পনার জাল বোনে, —দুঃখের দিনে সান্ত্বনার বাণী শুনাইয়া যায়।

ভাবিয়াছিলাম, ইহাদের কথা একদিন মনের মত করিয়া লিখিব। আজ রোগশয্যায় বসিয়া মনে শঙ্কা হইতেছে যদি সারিয়া না উঠি, আমারই সঙ্গে তাহারও চির জনমের মত বিস্মৃত হইয়া যাইবে। তাই যেমন করিয়া হোক তাহাদের কথা লিখিয়া রাখি।

জীবনের সুদূর অতীতের প্রথম পটভূমিতে যতদূর দৃষ্টি যায় চাহিয়া চাহিয়া দেখি। এই আলো-আঁধারের দেশে কতক বোঝা যায় কতক বোঝা যায় না, ভাসা ভাসা কয়েকটি ছবি আমার মনে উদয় হয়।

মেঘলা দিনে ঘরের মেঝেয় নক্সী কাঁথা মেলিয়া ধরিয়া মা সেলাই করিতেছেন আর গুণ গুণ করিয়া গান গাহিতেছেন।

* * * *

বাজান রাত ভোর না হইতেই উঠিয়া নামাজ পড়িতেছেন। তাঁর কণ্ঠে নামাজের সুরাগুলি যেন আমার আধ-ঘুমন্ত বালকমনে কি এক অপূর্ব অনুভূতি আনিয়া দিতেছে যা কোন দিনই ভাষায় কহিয়া বুঝাইতে পারিব না।

* * * *

দরজায় দাঁড়াইয়া এক ফকীর, আতসী পাথরের মালা গলায় পরিয়া ইউসুফ জুলেখার পুঁথি সুর করিয়া গাহিতেছে।

* * * *

সারা গায়ে ধূলি কাদা মাখিয়া সন্ধ্যা বেলায় ঘরে ফিরিয়াছি। মা ধরিয়া লইয়া গা ধুয়াইয়া আঁচল দিয়া মুছিয়া দিতেছেন।

*   *   *   *

আকাশ জুড়িয়া ঝড়ের দাপাদাপি। শব্দ করিয়া বজ্র ডাকিতেছে। বিছানায় শুইয়া বাজানের গলা জড়াইয়া ধরিয়াছি।

*   *   *   *

সারাদিন মেঘলা আকাশ। সামান্য সামান্য বৃষ্টি হইতেছে। কাছারী ঘরে মেজে চাচা সুর করিয়া পুঁথি পড়িতেছেন। কি পড়িতেছেন বুঝিবার বয়স তখনও হয় নাই। বৃষ্টির সুরের সঙ্গে পুঁথি পড়ার সুর মনের মধ্যে যেন কি এক উদাসীনতা আনিয়া দিতেছে।

*   *   *   *

রূপা মল্লিকের বোন জানকী রঙিন শাড়ী পরিয়া আমাদের বাড়ি বেড়াইতে আসিয়াছে। তার হাসি মুখে যেন হলুদের ডুগু ডুগু। রূপে সারা আঙিনা ঝলমল করিতেছে।

এমনি করেকটি ছোট ছোট ঘটনা আমার মনের পর্দায় আসিয়া ছবি হইয়া ফুটিতেছে। অনেক বড় বড় ঘটনা ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু এগুলি অবসর পাইলেই আমার মনের নাট্যমঞ্চে আসিয়া খেলা করিয়া যায়।

খুব আবছা আবছা মনে পড়িতেছে, আমাদের দু'খানা খড়ের ঘর। চারিধারে নল খাগড়ার বেড়া। চাটাই-এর কেয়াড় বা ঝাঁপ বাঁধিয়া ঘরের দরজা আটকান হয়। সেই ঘরের অর্দ্ধেক খানিতে বাঁশের মাচা! মাচায় ধানের বেড়ি, হাঁড়ি পাতিল থরে থরে সাজান সামনে সুন্দর কারুকার্য খচিত বাঁশের পাতলা বাখারী দিয়া নক্সা করা একখানি ঝাঁপ টাঙান। ইচ্ছামত সেই ঝাঁপ উঠাইয়া মাচায় যাওয়া যায়। মাচার কাজ সারিয়া ঝাঁপটি ছাড়িয়া দিলে উহা সমস্ত মাচাটিকে ঘরের মেঝে হইতে আলাদা করিয়া রাখে। বাঁশের পাতলা বাখারির ফাঁক দিয়া সমস্ত মাচাটিকে দেখা যায়। এই ঘরের মেঝেতে সপ বিছাইয়া আমরা শুইয়া থাকিতাম। শীতের সকালে নল খাগড়ার বেড়ার ফাঁক দিয়া লম্বা লম্বা রোদের রেখা আমাদের ঘরে প্রবেশ করিত। সেই রোদ রেখার উপর দিয়া গুঁড়ো গুঁড়ো ধূলিকণা নানা ভঙ্গী করিয়া যাওয়া আসা করিত। বিছানায় শুইয়া আধঘুমন্ত চোখে

তাহা দেখিয়া দেখিয়া কত রকমের কল্পনাই না মনে আঁকিতাম। মাঘ-মাসে আমাদের ঘরের পাশে বোরই গাছে বোরই পাকিত। শেষ রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিলে টুব টুব করিয়া বোরই পড়ার শব্দ শুনিতাম। সেই শব্দে আমার বুকের ভিতর যেন কেমন করিত।

ঘরেব সামনে ছিল প্রকাণ্ড উঠান। তার দক্ষিণ দিকের অংশ ছিল আমার পিতার চাচাতো ভাইদেব। উত্তর দিকের অংশ ছিল আমাদের। বাড়ির উত্তব দিকে ঘন বিচে-কলাব বাগান। কোন কোন দিন কলার পাতায় বাতাস দোলা দিত। আমার বালক মন সেই শব্দে কোথায় উদাস হইয়া যাইত।

আমাদের উঠানে বার মাসে বারো ফসল আসিয়া রঙের আর শব্দের বিচিত্র খেলা খেলিত।

আমার পিতাকে আমরা বাজান বলিয়া ডাকিতাম। বাজানের ছেলে বেলার খবর আমার বিশেষ জানা নাই। আমাদের পড়াশুনায় অবহেলা দেখিলে তিনি বলিতেন. আজকালকার ছেলেরা তেমন পড়াশুনা করে না। আমরা আগে কত পড়িতাম। রাত্র দশটা পর্যন্ত ত পড়িতামই, আবার শেষ রাত্রে উঠিয়া বই পুস্তক লইয়া বসিতাম। কেরোসিনের কুপীতে পড়াশুনা করিলে চোখ নষ্ট হয়। বন জঙ্গল হইতে তাই রঘনার ফল পাড়িয়া আনিতাম। মা সেই ফল ঢেকিতে কুটিয়া পানিতে জ্বাল দিয়া তৈল বাহির করিয়া দিতেন। আমরা সেই তৈলে প্রদীপ জ্বালাইয়া পড়াশুনা করিতাম।

বাজান ঘর সংসারেব কাজ ফেলিয়া স্কুলে যাওয়া আসা করিতেন বলিয়া আমার দাদা ছমিরউদ্দীন মোল্লা বাজানের উপর বড়ই চটা ছিলেন। বাজান তাঁব একমাত্র পুত্র। বৃদ্ধ বয়সে তিনি সংসারের সমস্ত কাজ দেখাশুনা করিতে পারিতেন না। কোন কঠিন কাজ করিতে কষ্টসাধ্য হইলে তিনি বাজানকে খুব গালমন্দ করিতেন।

তাই বাজান অবসর পাইলেই দাদার সাংসারিক কাজে সাহায্য করিতেন হয়ত সেই জন্যই তাঁহাকে শেষ রাত্রে উঠিয়া পড়াশুনা করিতে হইত।

বর্ষাকালে আমাদের দেশে সমস্ত মাঠ ঘাট জলে ডুবিয়া যাইত। গরুর জন্য কোথাও ঘাস মিলিত না। বাজান তাঁর সহপাঠি কাজেম মোল্লাকে সঙ্গে লইয়া পদ্মা নদীর ওপার হইতে মাঝে মাঝে নটা ঘাস কাটিয়া আনিতেন।

একবার তাঁহারা পদ্মা নদীর ওপার হইতে নৌকায় নটা ঘাস বোঝাই করিয়া এপারে আসিতেছেন, মাঝ নদীতে আসিয়া নৌকা ডুবিয়া গেল।

শাল কাঠের নৌকা না হইলে প্রায় সকল নৌকাই নদীতে ডুবিলে ভেসে থাকে। সেইজন্য মুরব্বীরা উপদেশ দিতেন, নদীর পাড়ি যদি অনেক দূরের হয় তবে নৌকা ডুবিলেও নৌকা ছাড়িয়া যাইও না। নৌকা ডুবিলেও তাহাতে বাঁশ, কাঠ, প্রভৃতি ভাসমান অনেক জিনিস থাকে। তাহা অবলম্বন করিয়া কিনারে আসিতে চেষ্টা করিও।

সুখের বিষয় বাজান আর তাঁর বন্ধু যে নৌকায় আসিতেছিলেন তাহা ডুবিয়া গেলেও পানিতে ভাসিতে লাগিল। অথই পদ্মার জলে তাঁহারা সেই ভাসমান নৌকা ধরিয়া রহিলেন। বাতাসে ভাসিতে ভাসিতে তাঁহারা জনমানবহীন পদ্মার চরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চারিদিকে নটা-ঘাসের জঙ্গল। সেখানে নটা-ঘাসের পাতায় বাবুই পাখিরা বাসা করিয়াছে। নানা রকমের রাশী রাশী পিঁপড়ে নটা-ঘাসের ডগা ধরিয়া তাহার রস খাইতেছে।

এই সব স্থানে কুমীর আসিয়া আস্তানা গাড়ে। জলবোরা সাপ এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়ায় বাবুই পাখির ডিমের লোভে। দুই বন্ধু সেই নটা খেতে লগি গাড়িয়া তাহার মাথায় গামছার ফরফরা উড়াইয়া দিলেন; দূর হইতে যদি কেহ আসিয়া তাহাদের উদ্ধার করে। খানিকটা দূরে দুই তিন খানা জেলে নৌকা চলিয়া গেল। তাঁহারা এত ডাকাডাকি করিলেন, জেলেরা ফিরিয়াও চাহিল না। জেলেরা বস্তুতঃ জলে ডোবা লোকদের উদ্ধার করিতে বড় একটা আসে না। তাহারা নদীতেই প্রায় কাটায়। এমনি জলে ডোবা নৌকা তাহারা সচরাচর দেখিতে পায়। তাহাদের উদ্ধার করিতে গেলে তাহারা মাছ ধরার সময় কোথায় পাইবে? তাহরা ত গরীব। মাছ না ধরিতে পারিলে জেলের পরিবার অনাহারে থাকিবে।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। লগি অবলম্বন করিয়া দুই বন্ধু প্রমাদ গনিলেন। রাতে তাঁহাদের উদ্ধার করিতে কেহই আসিবে না। নটা খেতে কুমীরের ভয়—সাপের ভয়। এমনি চুপ করিয়া থাকিলে কুমীর আসিয়া লইয়া যাইবে। তাঁহারা লগি উঠাইয়া মাঝে মাঝে সেই নটা খেতে বাড়ি মারিতে লাগিলেন। শীতে সমস্ত দেহ কোঁকড়াইয়া আসিতেছে। বিপদের রাত্র কিছুতেই কাটিতে চাহে না। কিন্তু তাঁহাদিগকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার

হইতেই হইবে। শরীর গরম করিবার জন্য দুই বন্ধু জড়াজড়ি করিয়া একে অপরকে আলিঙ্গণ করিয়া রহিলেন, আর মাঝে মাঝে লগি দিয়া নটা ঘাসের উপর বাড়ি মারিতে লাগিলেন।

এইভাবে রাত শেষ হইয়া আসিল। একখানা গৃহস্থ নৌকা সামনে দিয়া যাইতেছিল। তাঁহারা আসিয়া দুই বন্ধুকে নৌকায় তুলিয়া লইলেন। তখন তাঁহাদের শরীরের চামড়া কুচকাইয়া গিয়াছে। আগুন জ্বালিয়া কিঞ্চিৎ সেক্ দিয়া সেই নৌকার লোকেরা তাঁহাদিগকে এপারে আসিয়া নামাইয়া দিল।

বাজান ছিলেন অত্যন্ত সুপুরুষ। আজানুলম্বিত বাহু আর স্বাস্থ্যবান দেহের উত্তরাধিকারী। মুখ ভরা ছিল সুন্দর দাড়ী। তিনি ধুতি পরিয়া মাথায় টুপী রাখিতেন। পাঞ্জাবীতে গা আবৃত করিয়া 'একপাটা' নামক পাতলা একপ্রকার চাঁদর কাঁধে জড়াইতেন। শীতকালে গরম আলোয়ান গায়ে দিতেন। ছাতিও তখন পোষাকের অন্তর্গত ছিল। যখন রৌদ্র বৃষ্টি থাকিত না তখনও হাতে ছাতি না লইয়া তখনকার ভদ্রলোকেরা ঘরের বাহির হইতেন না। বাজানের প্রৌঢ়কালে ধর্ম্মীয় নব আন্দোলনের ফলে মুসলমানদের মধ্যে ধুতির স্থানে পাজামা, লুঙ্গী ও পাঞ্জাবীর উপরে আচ-কান পরার প্রচলন ছিল। মুখের দাড়ী ও মাথার টুপী আজ আধুনিক মুসলমানদের মধ্যে কচিৎ দেখা যায়।

বাজান ছোট বেলায় স্কুলে ভর্ত্তী হইয়া ইংরেজী বাঙলা উভয় ভাষাই শিক্ষা করিতেছিলেন। ওহাবী আন্দোলনের জের তখনও থামে নাই। ইংরেজ তাড়াইতে না পারিয়া তখনকার মুসলমানেরা নিজেদের সীমাবদ্ধ রুচি অনুসারে সমাজসংস্কারে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। হাজী শরিয়তুল্লার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দুদুমিয়া সাহেব সুবে বাঙলার খলিফা হইলেন। মাওলানা কেরামত আলীর দল তখন ইংরেজদের সঙ্গে রফা করিয়া তাঁর শাকরেদদিগকে ইংরেজী পড়ার অনুমতি দিয়াছেন। দুদুমিয়া কিন্তু টলিলেন না। তাঁর আদেশে একদিনে দশ বারটি নীল কুঠি জ্বলিয়া ছাই হইয়া গেল।

তিনি খবর পাইলেন বাজান স্কুলে নাছেরা ইংরেজের ভাষা শিক্ষা করিতেছেন। এর চাইতে বড় অপরাধ তাঁর জামাতের লোকদের মধ্যে আর কিছুই ছিল না। সুতরাং বাজানকে ইংরেজী পড়া ছাড়িয়া দিতে হইল।

তিনি বাঙনা ছাত্রবৃত্তি স্কুলে যাইয়া ভর্ত্তী হইলেন। সেই ছাত্রবৃত্তি স্কুলের যা পাঠ্য বই তা এণ্ট্রান্স ক্লাসের বইএর চাইতে কম কঠিন ছিল না। যোগেন্দ্র নাথ সরকারের আত্মোৎসর্গ, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারকৃত হাফেজের অনুবাদ—সদ্ভাবশতক, নবীন সেনের পলাশীর যুদ্ধ, মাইকেলের মেঘনাদবধ এবং যাদবের গণিত তখন ছাত্রবৃত্তির পাঠ্য ছিল। বাজান যদি ইংরেজী স্কুলে পড়িতেন তবে ডেপুটি হইতে পারিতেন, উকিল হইতে পারিতেন। আমাদের ছোট সংসারে কোন প্রকারের অর্থ কষ্ট থাকিত না।

বাজান ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া বাড়ি বসিয়া জমিজমার তদারক করিতে-ছিলেন। বাজানের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক রাজ মোহন পণ্ডিত মহাশয় ফরিদপুরে হিতৈষী এম, ই, স্কুল নামে একটি নূতন বিদ্যালয় খোলেন। তিনি বাজানকে ডাকিলেন সেই স্কুলের শিক্ষকতা করিতে। সামান্য বেতন। মাসে মাত্র পাঁচ টাকা। গুরুর আদেশে বাজান যাইয়া এই স্কুলে চাকরী লইলেন। ইহাকে চাকরী বলা যায় না। তিনি শিক্ষকতার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করিলেন। শুনিয়াছি সেকালের সর্ব্বজনের আকাঙ্ক্ষার বস্তু পুলিসের চাকরী বাজানকে দেওয়ার প্রস্তাব হইয়াছিল কিন্তু শিক্ষকতার কাজ ছাড়িয়া তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলিতেন, শিক্ষকতার কাজ বড়ই সম্মানের। দেশের সেবা করিতে ইহার চাইতে বড় কিছু নাই। এই স্কুলের কাজেই তিনি প্রায় সারাজীবন কাটান।

একবার এই স্কুলের খড়ের আটচালা ঘর আগুনে পুড়িয়া গেল। ফরিদপুর বাজারের একটি গুদাম ঘরে স্কুলের নূতন আবাস হইল। ছাত্র সংখ্যা কমিতে কমিতে ৮।১০ জনে পরিণত হইল। বেতন না পাইয়া স্কুলের অন্যান্য শিক্ষকের স্কুল ছাড়িয়া গেলেন। কিন্তু স্কুলের হেড মাষ্টার বাবু সুরেশচন্দ্র বসু আর বাজান স্কুল ছাড়িলেন না। একটি কাঠের উপরে কালো রঙ করিয়া সাদা কালিতে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল, ফরিদপুর হিতৈষী এম, ই স্কুল। সেই তক্তাখানা স্কুলের সামনে লটকাইয়া দুই শিক্ষক অপেক্ষা করিতে লাগিলেন নতুন নতুন ছাত্রের। যে কয়জন ছাত্র ছিল তাহাদের লইয়াই বিদ্যাদানের তপস্যা আরম্ভ করিলেন। সে কি ঘোর তপস্যা! ছাত্র বেতন হইতে মাসে ৩। টাকায় বেশী উঠিত না। তাহাই দুইজনে ভাগ করিয়া লইতেন। সুরেশ বাবু থাকিতেন শহরে। আমাদের মত কোন জমিজমার আয়

ছিলনা। কি করিয়া যে সংসার চালাইতেন তা খোদাই জানেন। কিন্তু দুই শিক্ষকের স্কুলের কাজের বিরাম ছিল না। প্রতিদিন ঘন্টা বাজাইয়া যথা সময়ে স্কুল বসিত। সেই ঘণ্টা হেড্‌মাষ্টার মহাশয় নিজেই বাজাইতেন। রুটিন অনুসারে দুই শিক্ষক যার যার ক্লাসে পড়াইয়া যাইতেন। ছুটি হইলে দুইজনে বসিয়া স্কুলের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতেন। কোন্ ছাত্রটি ভাল পড়াশুনা করে না, কি করিয়া তাহাকে পড়াশুনায় মনোযোগী করা যায় সে জন্য নতুন শিক্ষা পদ্ধতি অনুসন্ধান করিতেন। স্কুলটি শুধু একটি নাম নয়, একটি প্রতিষ্ঠান হিন্দুর দেবালয় বা মুসলমানের মসজিদের মত ইহা পবিত্র।

এই দুইজন পূজারী এই প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাইয়া রাখিতে তিলে তিলে নিজদিগকে দান করিতে লাগিলেন। যতদূর মনে পড়ে সেবার দেশে আকাল পড়িয়াছিল। ব্রহ্মদেশ হইতে আতপ চাউল আমদানী হইয়া দশটাকা মন দরে বিক্রয় হইত। এই সময়ে আমরা চাউল কিনিয়া খাইতাম, বিনা বেতনে চাকরী করিয়া যাঁহারা কি করিয়া সংসার চালাইতেন ভাবিয়া পাই না। এত সব অসুবিধার মধ্যে স্কুলের কাজ সমান ভাবেই চলিতে লাগিল। দুই শিক্ষক একত্র হইয়া কেবল ভাবিতেন, কি করিয়া স্কুলের ছাত্র বাড়ান যায়। কিন্তু ছাত্রসংখ্যা বাড়ে না। বাজারের মধ্যে গুদাম ঘরে স্কুল বসে। মাত্র দুইজন শিক্ষক। কে চাহে নিজের ছেলেকে এই স্কুলে দিতে। আমি তখন এই স্কুলে পড়িতাম। অন্য স্কুলের ছেলেরা আমাদিগকে দেখিয়া খেপাইত।

হিতৈষী স্কুলের ভেড়ি,
কানকাটা মেড়ি।

ইহার জবাব আমরা দিতে পারিতামনা। অন্যান্য স্কুলে কত শান-শওকৎ। খেলার মাঠ, দপ্তরী, লাইব্রেরী আরও কত কিছু। আমাদের স্কুলে আধা-ভাঙা কয়েকখানা টুল, আর শিক্ষকদের বসিবার দু'খানা চেয়ার তাহাও শিক্ষকদের দারিদ্র্যের মতই জীর্ণ অবয়বটা কোন রকমে খাড়া করিয়া আছে। আমরা এই গালির কোনই জবাব দিতে পারিতাম না। নীরবে তাহাদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য হজম করিতাম।

যে মহাজন তাঁর গুদাম ঘরে স্কুলের স্থান করিয়া দিয়াছিলেন তিনি কোথাও গুদাম ভাড়ার ব্যবস্থা করিয়া হেড্‌মাষ্টারকে অন্যত্র স্কুল লইয়া যাইতে হুকুম করিলেন। দুই শিক্ষক আবার পরামর্শ করিতে বসিলেন,

কি করিয়া স্কুলটি বাঁচাইয়া রাখিবেন। কোথায় কোন জায়গায় স্কুল লইয়া যাইবেন।

অধুনা যেখানে মুরগীর হাট তাহার পিছনে সাহাদের আরও একটি ঘর ছিল। প্রায় খালিই পড়িয়া থাকিত। সাহাদিগকে অনেক বুঝাইয়া সেই গুদাম ঘরে স্কুল স্থানান্তরিত হইল।

সুরেশ বাবুর সঙ্গে বাজানের গভীর বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। এই স্কুলটিকে অবলম্বন করিয়া তাঁহারা একে অপরকে বড়ই আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। একত্র হইলে পরস্পরের দুঃখ দারিদ্র বা সাংসারিক অনটনের কথা লইয়া কোনদিন তাঁহাদিগকে আলোচনা করিতে শুনি নাই। তাঁহাদের চাইতেও অসহায় দীনহীন এই স্কুলটির দুরবস্থার মধ্যে তাঁহারা নিজেদের অভাব অনটন লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। ক্রমে স্কুলের অবস্থা কিছু ভাল হইল।

এবার বাজানের খুব অসুখ হইল। সুরেশ বাবু ফরিদপুর শহর হইতে দুই মাইল পথ হাঁটিয়া রাজবজানকে দেখিতে আসিতেন বাজান সারিয়া উঠিলেন। সুরেশ বাবুকে সামান্য কি ম্যালেরিয়া জ্বরে ধরিল। সেই জ্বরেই তাঁহাকে মৃত্যুর দেশে লইয়া গেল। তাঁহার মৃত্যুর পরে বাজান একেবারে ডানাভাঙা পক্ষী শাবকের মত হইয়া গেলেন। সুরেশ বাবুর মত এমন আদর্শবাদী শিক্ষক কোথাও দেখা যায় না। যাহারা তাঁহার নিকট পড়াশুনা করিয়াছে তাহারা কোনদিন তাঁহার স্নেহ মমতার কথা ভুলিবে না তিনি শিক্ষকই ছিলেন না। তাঁর ছাত্রদের তিনি নিজ সন্তানের মত ভালবাসিতেন সুরেশ বাবুর মৃত্যুর পর তাঁর ছোটভাই উমেশ বাবু আসিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিলেন। তিনিও তাঁহার জেষ্ঠ ভ্রাতার মতই আদর্শবাদী ছিলেন। এরপর এই স্কুল নানাস্থানে ঘুরিল। ফরিদপুরে প্রসিদ্ধ মোক্তার মৌলবী আবদুল গণি সাহেব নিজের বৈঠকখানায় স্কুলের স্থান সঙ্কুলান করিলেন। তারপর ফরিদপুরের প্রসিদ্ধ লোকহিতৈষী, পরে কংগ্রেসনেতা, ডাক্তার সুরেশচন্দ্র বন্দোপধ্যায় এই স্কুলের সমস্ত ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি ডাক্তারী করিয়া যাহা পাইতেন সমস্তই দান খয়রাত করিয়া দিতেন। এই সময়ে স্কুল আলীপুরের একটি ভাড়াবাড়িতে স্থানান্তরিত হয়।

গত প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সুরেশ বাবু যুদ্ধে চলিয়া যান। তারপর নানা হাত ঘুরিয়া স্কুলটি থানার দক্ষিণে একটি ভাড়াবাড়িতে স্থানান্তরিত

হয়। এখনও স্কুলটি সেইখানে আছে। দিনে দিনে স্কুলের ছাত্র সংখ্যা বাড়িতে থাকে। সেই সঙ্গে শিক্ষকের সংখ্যাও বাড়িয়াছে।

এই সময়ে আমাদের সাংসারিক অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল। আমার পিতা স্কুল হইতে মাত্র মাসে ১৫ টাকা বেতন পাইতেন। ইহা লোকের কাছে বলিতেও লজ্জা করে। তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তাঁহার অধীনে যে কেরানী কাজ করিতেন তিনিও মাসে ৩০ টাকা করিয়া বেতন পাইতেন। আমরা বাজানকে স্কুলের কাজ হইতে অবসর লইতে বলিতাম কিন্তু তিনি তাহা কিছুতেই শুনিতেন না। তিনি বলিতেন, মাসে পনেরটি করিয়া টাকা পাই, তাহাতে বাড়ির নুন, তেল কেনার খরচ হয়। ইহা তাঁহার অন্তরের কথা নহে। এখন আমাদের অবস্থা ভাল। আমি চাকরী করিয়া যথেষ্ট টাকা সংসারে দেই। তাহা ছাড়া পদ্মার চর পড়িয়া আমার পিতা অনেক নতুন জমিজমার অধিকারী হইয়াছেন। নিজের জমিজমা দেখাশুনা করিলে এবং প্রজাদের খাজনা পত্র আদায় করিলে অনেক বেশী টাকা তাঁহার আয় হইত। প্রকৃতপক্ষে বাজান স্কুলের কাজে ছিলেন বলিয়া এদিকে অনেকটা বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। সময়মত তাগিদ না দেওয়াতে প্রজারা প্রায়ই খাজনা বাকি ফেলিত। জমিজমার ফসলও ঠিকমত বাড়ি আসিত না। আমরা মনেপ্রাণে কামনা করিতাম বাজান আর স্কুলের কাজ না করেন।

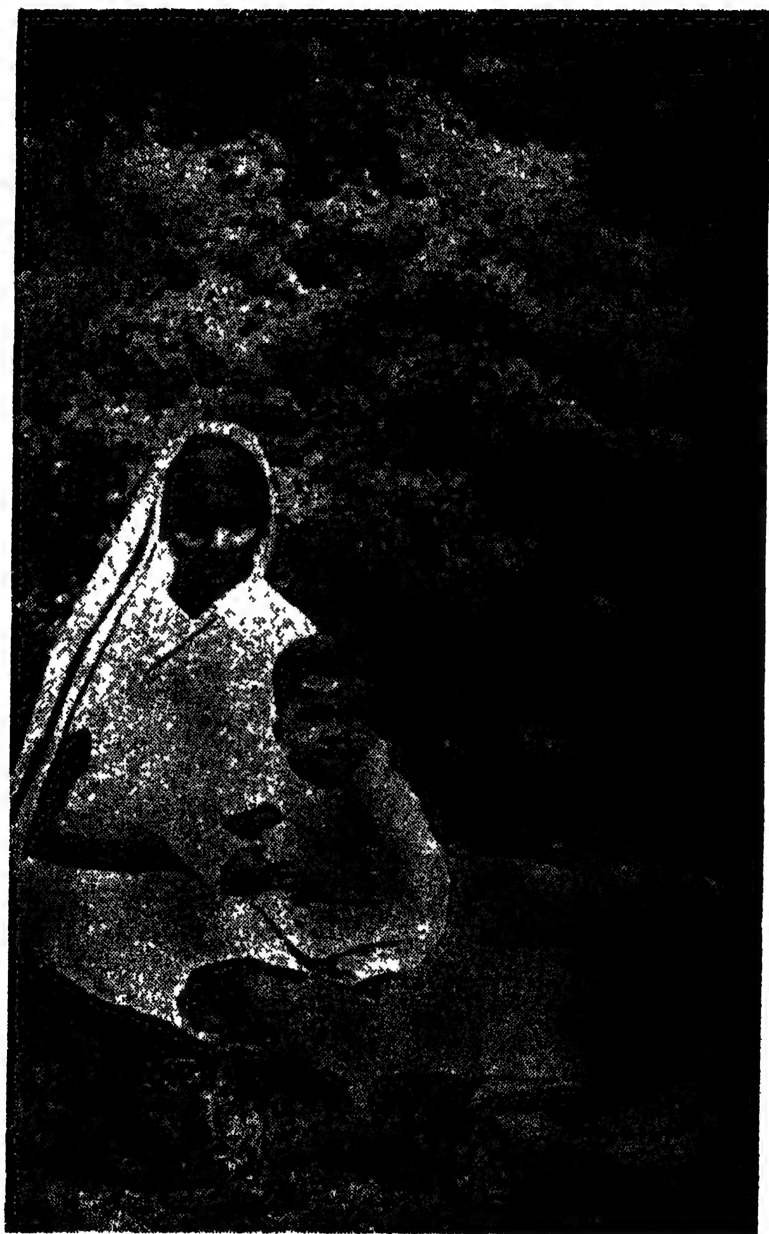
কিন্তু তিনি কিছুতেই স্কুল ছাড়িবেন না। আসল কথা প্রায়, ৩৫।৩৬ বৎসর পর্যন্ত ছেলেদের সঙ্গে কাটাইয়া শিক্ষকতার কাজ তাঁহার জীবনের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। যে সব ছোট ছোট ছেলেদের তিনি প্রতিদিন পড়াইতেন তাহাদের মায়ায় তিনি নিজেকে জড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন একদল উপর শ্রেণীর ছেলেরা পাশ করিয়া যখন স্কুল ছাড়িয়া যাইত তখন তাহাদের সঙ্গে বাজানও চাদরের খোঁটায় চোখের পানি মুছিতেন। কিন্তু অল্পদিনে ছাত্রদল আসিয়া তাহাদের শূন্যস্থান পূরণ করিত। তাঁহার পুরাতন ছাত্রেরা যখন পথে ঘাটে কোথাও তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাকে সালাম করিয়া শ্রদ্ধা জানাইত, তিনি তাহাতে বড়ই গৌরব অনুভব করিতেন। তাঁহার কোন ছাত্র বি, এ পাশ করিয়া বাজানের মধ্যে দেখা হইলে বহুলোকের সামনে তাঁহাকে পায়ে হাত দিয়া সালাম করিয়াছিল এই ঘটনাটি কত ঘটা করিয়া

তিনি মায়ের কাছে বলিয়াছিলেন। শুধু কি মায়ের কাছে—যেখানে যাহার সঙ্গে দেখা হইত সুযোগ বুঝিয়া তিনি এই ঘটনাটি বিবৃতি করিতেন।

শুধু ছাত্রদের সঙ্গে নয় এই স্কুলের প্রতিটি জিনিসের সঙ্গে ছিল তাঁর প্রাণের মমতা। তাই এই স্কুল হইতে তাঁহাকে আমরা কিছুতেই ছাড়াইতে পারিলাম না। আমরা পারিলাম না কিন্তু আমার এক কায়স্থ বন্ধু সেই কার্যটি করিয়া দিলেন। তিনি যখন আমার সঙ্গে বি, এ ক্লাশে পড়িতেন তখন প্রায়ই আমাদের বাড়ি আসিতেন। আমার পিতা তাঁহাকে আমার বন্ধু বলিয়া বড়ই স্নেহ করিতেন। আমাদের বাড়ি আসিলে তাহাকে এটা ওটা না খাওয়াইয়া ছাড়িতেন না।

তিনি বি, এ পাশ করিলে স্কুলের হেড. মাষ্টারের পদ খালি হয়। বাজানই চেষ্টা চরিত্র করিয়া গবরনিংবডির লোকদের বলিয়া কহিয়া তাহাকে এই কাজে নিয়োগ করান। কিন্তু হেডমাষ্টারের পদ পাইয়াই কিছু দিনের মধ্যে তিনি তাহার ভোল বদলান। বাজান তাঁহাকে হেড. মাষ্টার বলিয়া অন্যান্য শিক্ষকদের মত সমীহ করিয়া চলিতেন না। আগের মতই তুমি বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইহা তিনি পছন্দ করিলেন না। স্কুলের কার্য নির্বাহক সমিতিতে তিনি বয়স বৃদ্ধি হেতু বাজানকে অবিলম্বে অবসর গ্রহণে সুপারিশ করিয়া এক প্রস্তাব পাঠাইলেন। কার্যনির্বাহক সমিতিতে বাজানের মত আরও দু'একজন বৃদ্ধলোক ছিলেন। তাঁহাদের হস্তক্ষেপে সেবার তাঁহার প্রস্তাব বানচাল হইয়া গেল। সেই সভায় আমিও উপস্থিত ছিলাম। হেড. মাষ্টার মহাশয় তখন অভিযোগ করিলেন, আমার পিতা তাহাকে সম্মান করিয়া চলে না। অনেক সময় তাহার কাজে প্রতিবাদ করেন। ইহাতে স্কুলের শৃঙ্খলা রাখা যায় না। কার্যনির্বাহক সমিতির একজন তরুণ সভ্য প্রস্তাব করিলেন, হেডমাষ্টারের কাছে এ জন্য বাজানের ক্ষমা চাওয়া উচিত। আমি ভাবিয়াছিলাম এরূপ আত্মসম্মানহীন প্রস্তাবে বাজান রাজি হইবেন না কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ হাত জোর করিয়া গদগদভাবে বলিলেন, "দেখন হেড. মাষ্টার মহাশয়। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। আপনি আমার ছেলের বয়সী। যদি আপনার নিকট কোন অপরাধ করিয়া থাকি আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

তখন অনেক কষ্টে আমি চোখের পানি রোধ করিলাম। কি সামান্য চাকরীর জন্য আমার পিতাকে ওই অসভ্য অকৃতজ্ঞ হেড.মাষ্টারের নিকট



আমার মাতা।

এতটা নীচতা স্বীকার করিতে হইল। আমার পিতার সুদীর্ঘ জীবনে কখনো তাঁহাকে এরূপ করিতে দেখি নাই। একবার আমাদের বাড়িতে কবি নজরুল ইসলাম আসিয়া কিছুদিন থাকিলেন। গভর্ণমেণ্টের চাকুরীয়া আমার এক ভগ্নিপতি খবর পাঠইলেন, নজরুল ইসলাম রাজনৈতিক দলের লোক। গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কথা বলেন। আমাদের বাড়িতে জায়গা দিলে শ্বশুর বাড়ি আসা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইবে। ইহাতে আমার পিতা বড়ই খাপ্পা হইয়া আমার সেই ভগ্নীপতিকে বলিয়া পাঠাইলেন তিনি যদি আমার বাড়িতে না আসেন না আসিতে পারেন। কিন্তু বাঙালীর এই প্রসিদ্ধ কবি তাঁহার কাছে বড় সম্মানের পাত্র, জামাতার অসুবিধার জন্য তাকে তিনি নিজের বাড়ি হইতে চলিয়া যাইতে বলিবেন না।

আরও একবার কোর্ট হইতে একটি মামলার বিচারের ভার বাজানকে দেওয়া হইয়াছিল। আমাদের পার্শ্ববর্তী গ্রামের একজন ঢেঙ্গাইত লোক বাজানকে ভয় দেখাইয়া খবর পাঠাইয়াছিল, তার লোকের পক্ষে যদি বাজান ডিগ্রী না দেন তবে পথে ঘাটে সে বাজানকে অপমান করিবে বাজান বলিয়া দিয়াছিলেন কারো ভয়ে তিনি অবিচার করিবেন না। দুই পক্ষের সব কিছু জানিয়া শুনিয়া তিনি ন্যায় বিচার করিবেন। সেই মামলায় তিনি এই মাতব্বরের সমর্থনকারীর বিরুদ্ধে রায় দিয়াছিলেন। তাহারা ভয়ে এতটুকুও বিচলিত হন নাই। নিজের বিবেক ও আত্মবিশ্বাসের প্রতি যাহার এতটা বিশ্বাস ছিল, কি করিয়া তিনি এমন অপমানজনক প্রস্তাবে রাজি হইলেন ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। আর কিছুদিন স্কুলে কাটাইবার জন্যই তিনি এইভাবে নিজেকে হেয় করিয়াছিলেন। ইহার কয়েকমাস পরে যখন স্কুলের বয়স্ক কর্মকর্তারা দুইজনই ফরিদপুরের বাহিরে ছিলেন, হেড্ মাষ্টার মহাশয় সেই সময় গোপনে এক সভা ডাকিয়া বাজানকে স্কুল হইতে অপসরণের ব্যবস্থা করেন। বাজান খবর পাইয়া আকাশ হইতে পড়িয়া গেলেন কিন্তু কর্মপরিষদে একবার যাহা পাশ হইয়াছে তাহা আর বাতিল হইবার নয়।

ধীরে ধীরে বাজানের বিদায়ের শেষ দিনটি চলিয়া আসিল। জীবনের সুদীর্ঘ ৩৫ বৎসর ব্যক্তিগত নানা অভাব অভিযোগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া যিনি এই স্কুলটিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন আজিকার দিনে সে ইতিহাস কেহই

স্মরণ করিল না। আজ এই বয়োবৃদ্ধ শিক্ষককে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্কুল হইতে অপসরণ করাইয়া স্কুলের কর্তৃপক্ষ তাঁর আজীবন ছাত্রসেবার উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিলেন। মাত্র পনেরটি টাকাই ত তিনি মাসে মাসে পাইতেছিলেন। স্কুলের দপ্তরীও তাঁর চাইতে বেশী মাহিনা পাইত। কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হইত তাঁকে আরও দুই এক বৎসর স্কুলে রাখিলে! আমার পিতা বলিয়া নয়। তাঁর জীবনের সুদীর্ঘ ৩৫ বৎসর কত শত সহস্র ছাত্র তাঁর নিকট শিক্ষা পাইয়াছে। তাহারা সকলেই এক বাক্যে সাক্ষ্য দিবেন তিনি কত ভাল শিক্ষক ছিলেন। তিনি ক্লাশে যে পাঠ বুঝাইয়া দিতেন, বাড়ি যাইয়া ছাত্রদের তাহা না পড়িলেও চলিত। কিন্তু নূতনের জন্য পুরাতনকে স্থান করিয়া দিতেই হইল। কারন পুরাতনের চাইতে নুতনেরা দলে ভারি। এমনি ঘটনা নিত্য নিত্য ঘটিতেছে পুরাতনের আজীবনের অভিজ্ঞতার চাইতে নূতনের দু'একটি নতুন কথার জৌলুস বেশী। কাঞ্চন ফেলিয়া সমস্ত দেশ কাঁচের আদর করিতে শিখিয়াছে। এই ঘটনা শুধু ফরিদপুর হিতৈষী স্কুলের ঘটনাই নয়। দেশের শত শত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, গভর্ণমেন্টের অফিসে, কাছারীতে নিত্য নিত্য এমনি শত শত অবিচার চলিতেছে। কে তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে? যাহাদিগকে এমনি ইচ্ছার বিরুদ্ধে চাকরী হইতে অপসারণ করান হয়, দেখা গিয়াছে কর্মময় জীবন হইতে হঠাৎ বিচ্যুত হইয়া তাহারা অবিলম্বে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়ে। যে সব কর্তৃপক্ষ এইভাবে শত শত লোকের মৃত্যুর ঘটাইয়া তাহাদের পোষ্যবর্গকে পথের ভিখারী করিয়া দেয় তাহাদিগকে নরঘাতক আখ্যা দিলেও যোগ্য বিশেষণ হয় না।

বাজানের বিদায়ের দিন শুনিয়াছি তাঁহার প্রিয় ছাত্রেরা বহু ফুলের মালার সঙ্গে চোখের পানি মিশাইয়া নিজেরা কাঁদিয়া তাহাদের প্রিয় শিক্ষককে বালকের মত রোদন করাইয়াছিল।

আমরা আশঙ্কা করিয়াছিলাম, স্কুলের কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বাজান খুবই ভাঙিয়া পড়িবেন। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করি। খবর পাইয়া আমি তাড়াতাড়ি বাড়ি চলিয়া আসিলাম। বাজানের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে লাগিলাম। অবসর পাইলেই তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতাম, স্কুলের কাজ ছাড়িয়া তিনি ভালই করিয়াছেন। এখন হইতে

তিনি প্রচুর পরিশ্রম করিতে পারিবেন। গ্রামের লোকদের জন্য এটা ওটা ভাল কাজ করিতে পারিবেন। বাজান আমার এই বোঝান পছন্দ করিতেন না। কোন কোন দিন শেষরাত্রে জাগিয়া তিনি বসিয়া থাকিতেন।

কিন্তু অল্পদিনেই তিনি অন্যান্য দেশ-হিতকর কার্যে মনোনিবেশ করিলেন স্কুল ছাড়িয়া তাঁহার যে মনোব্যথা হইয়াছিল তাহা তিনি অল্পদিনেই সামলাইয়া লইলেন। আমার পিতার শিক্ষকতার প্রথম জীবনে আমাদের সাংসারিক অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না। পৈত্রিক কয়েক বিঘা মাপঁ জমিজমা ছিল। তাহাই ভাগে চাষ করিয়া অর্ধেক ফসলে আমাদের আট নয় মাসের খোরাক হইত। স্কুলের কাজ ছাড়া বিবাহ পড়াইয়া, মৃতের জানাজা দিয়া, মহাজনের খত ও নৌকার চালান লিখিয়া বাজানের আরও সামান্য সামান্য আয় হইত। আমাদের গ্রামে মুসলমানেরা কেহই টাকা কর্জ দিয়া সুদের ব্যবসা করিত না। তাঁতীপাড়ার কারিকরেরা যদিও মুসলমান, আমাদের পাড়ার লোকদের সঙ্গে তাহারা এক মালতে থাকিত না। অথবা আমরাই তাহাদিগকে আমাদের মালতে লইতাম না। তাহার কারণও ছিল। তাঁতীদা কেহ কেহ টাকা কর্জ দিয়া সুদ লইত। হিন্দুদের মত তাহাদের মেয়েরা পানি আনিতে নদীতে যাইত। আমাদের পাড়ার মেয়েরা নদীতে যাইত না। পানির জন্য প্রায় বাড়িতেই পাতকুয়া থাকিত। ইহার ফলে এই হইয়াছিল, দেশে কলেরা মহামারী আসিলে প্রথমেই তাঁতী পাড়ায় আসিয়া আস্তানা গাড়িল। কারণ তাঁতীরা নদীর পানি খাইত। নদীর পানিই কলেরা সময় সব চাইতে মারাত্মক ছিল

যদিও সুদে টাকা খাটান আমাদের পাড়ায নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু সুদে টাকা ধার করা বা সুদী মহাজনের খত লিখিয়া দেওয়া কোন অপরাধের মধ্যে গণ্য ছিল না। প্রত্যেকখানা খত লিখিয়া বাজান চারি আনা করিয়া পাইতেন। মহাজনের নৌকা লইয়া যাহারা বিদেশে বা অন্যগ্রামে ব্যবসা করিতে যাইত, মহাজন তাহাদিগকে কিছু টাকা ব্যবসার জন্য ধার দিত। ব্যাবসায়ে লাভ হইলে তাহার এক অংশ নৌকার জন্য এবং এক অংশ অগ্রিম টাকার জন্য মহাজন পাইত। নৌকার বেপারী ও ভাগীরা সকলে মিলিয়া মহাজনের নিকট একটি চুক্তিপত্র লিখিয়া দিত। ইহাকে চালান বলে। এই চালান লিখিয়া দিয়াও বাজান আট আনা করিয়া পাইতেন।

বহুকাল হইতে আমাদের বংশের একজন না একজন দুই তিন গ্রামের মোল্লাকীর ভার পাইতেন। আমার পিতার চাচা জহিরুদ্দীন মোল্লা আমাদের গ্রামের মোল্লা ছিলেন। কি কারণে তিনি দেশ ছাড়িয়া মালদা চলিয়া যাওয়ায় গ্রামের মোল্লাকীর ভার আমার পিতার উপর পড়ে। এই উপলক্ষে পীর বাদ্‌শা মিঞার দাদা দুদুমিয়া বাজানকে একটি সনদ দিয়াছিলেন। গ্রাম্য চাষীদের বিবাহ পড়াইয়া বাজান এক টাকা হইতে তিন টাকা পর্যন্ত পাইতেন। মৃতের জানাজা পড়াইয়াও তিনি মাঝে মাঝে কাঁশার থালাখানা বা ঘটিটি বাটিটি পাইতেন। এখনও আমাদের গ্রামের বাড়িতে সেই সব থালি বাসনের দু'একটি নিদর্শন আছে।

এর পরে আমার পিতার আর্থিক অবস্থা যখন আরও খারাপ হইয়া পড়ে তখন আমাদেরই মোল্লাবংশের বচন মোল্লা নামক এক ব্যক্তি বাজানের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া পড়েন। একটি উপলক্ষে গ্রামের অধিকাংশ লোক বচন মোল্লাকে মোল্লা বলিয়া মানিয়া লইল। বাজানের পক্ষে মাত্র দুইচার ঘর লোক রহিল। ইহার পরে আমাদের সাংসারিক অবস্থা যখন ভাল হইল বাজান নিজেই ডাকিয়া সমস্ত মোল্লাকীর ভার বচন মোল্লাকে ছাড়িয়া দিলেন। গ্রাম্য বিচার আচারে বাজান মাতবরের পদবী পাইলেন।

আগেকার দিনে গ্রামদেশে পাকা মুসলমান খুব কমই দেখা যাইত। লক্ষ্মীপূজা, হাওই সিন্নি ও গাস্বীর উৎসবে সমস্ত গ্রাম মাতিয়া উঠিত। হাওয়া বিবির সম্মানে হাওয়া সিন্নি হইত। খুব সম্ভব লক্ষ্মী পূর্ণিমার পরের পূর্ণিমার হাওয়া সিন্নির উৎসব হইত। একটি চিত্রিত হাঁড়ির মধ্যে খইমুড়ির মোওয়া, লাড়ু বাতাসা প্রভৃতি ভরিয়া শূন্যে ঝুলাইয়া রাখা হইত। সামনে থাকিত দু'চারখানা পাকা কলার কাঁদি। আমার পূর্বপুরুষেরা এই সব উৎসবে কোরান শরিফ পড়িয়া আসিতেন। তাঁহারা বলিতেন লোকে ত এসব উৎসব করিবেই। আমরা ইহার মধ্যে কোরানশরিফ পড়িয়া কিছুটা মুসলমানীত্ব বজায় রাখি। হাওয়া সিন্নির পরদিন কদমতলা নামক এক জায়গায় মেলা বসিত। সেই মেলায় খেলনা পুতুল, সিকা, নক্সী-কাঁথা প্রভৃতি নানা রকমের পল্লী শিল্পের নিদর্শনগুলি বিক্রি হইত। তাহা ছাড়া সারারাত্র ভরিয়া নানা রকমের জারী, বিচার, যাত্রা, গাজীর গান প্রভৃতি বহু রকমের গ্রাম্যগানের আসর বসিত। এই মেলায় গ্রামবাসীরা যার যার

গুণপনার পরিচয় দিয়া শত শত লোকের বাহবা পাইত। মেলা শেষ হইলে আবার এক বৎসর ধরিয়া গুণীজনেরা এই মেলায় আপনাপন কৃতিত্ব দেখাইবার জন্য অবসর সময়ে নিজ নিজ গুণপনার অনুশীলন করিত। শুনিয়াছি আমার দাদার চাচাত ভাই জহিরুদ্দিন মোল্লার আমলে হাওই সিন্নির অনুষ্ঠান হইতে ভারে ভারে যত খই মুড়ি লাড়ু ও কলা আসিত যে তাহা ১২।১৩ দিন খাইয়াও ফুরাইত না। পরে সেগুলিকে গরু দিয়া খাওয়ান হইত। অধুনিক কালে নুরুল্লাপুর সানাল ফকিরের বাড়িতে লক্ষ্মী পূর্ণিমার পরের পূর্ণিমায় হাওয়া-সিন্নির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। কিন্তু সেই অনুষ্ঠানে আগের মত তেমন জাঁকজমক নাই। সেকালে আশ্বীন কার্ত্তীক মাসের সংক্রান্তির দিনে গাস্বী উৎসব হইত। হিন্দুরা আশ্বীন মাসের শেষ দিনের আগের রাত্রে এই উৎসব করে। মুসলমানেরা তার পরের রাত্রে গাস্বী করে। কথায় বলে—

আশ্বীনে রান্দে কার্ত্তীকে খায়,
যে বর মাঙে সেই বর পায়।

আজও গ্রাম দেশে মুসলমানদের মধ্যে গাস্বী জাগানোর প্রচল আছে। আমরা ছেলেবেলায় সারা বৎসর এই গাস্বীর দিনটির প্রতি চাহিয়া থাকিতাম। সারাদিন এ বন ও বন ঘুরিয়া তেলাবুচের পাতা, আমরুজের পাতা, হলদী, পানের গাছ, বড়কচুর পাতা প্রভৃতি সংগ্রহ করিতাম। তাহার পর উঠানের এক জায়গা ভালমত লেপিয়া সারাদিনের কুড়ান সামগ্রীসহ তালের আঁটি ও একটি নারিকেল, পান-সুপারী, সুন্দা-মেথি, কাজল তুলিবার জন্য কলার ডাঁটা প্রভৃতি একটি বড় কচুর পাতার উপর রাখিয়া আর একটি কচুপাতা দিয়া ঢাকিয়া রাখিতাম। শেষ রাত্রে উঠিয়া আগুন জ্বালাইয়া আগুনের চারিদিকে ঘুরিয়া মশা তাড়ানর মন্ত্র পণিতাম। মন্ত্রটি ভাল মত মনে নাই।

"যা যা মশা মাছি উইড়া যা,
আমাগো বাড়িত্যা অমুকের বাড়ি যা।"

সেই অমুকের বাড়ি বলিতে আমাদের খেলার যাহারা প্রতিদ্বন্দ্বী তাহাদের নাম জোরে জোরে বলিতাম। তাহারাও আবার মন্ত্র পড়িবার সময় আমাদের নাম করিত।

গাস্বীর রাত্রে আমরা যে গাছে ফল ধরে না একটি কুড়াল লইয়া সেই গাছে দু'একটি কোপ দিতাম আর বলিতাম, "এই গাছে ফল ধরে না এই গাছ আজ কাটিয়াই ফেলিব।" আর একজন যাইয়া বলিত, "না না কাটিস না। এ বৎসর গাছে ফল ধদিবে।" তখন নিরস্ত হইতাম। আমাদের বিশ্বাস ছিল এরূপ করিলে গাছে ফল ধরিবে। গাস্বীর রাত্রে গ্রামের যাহারা মন্ত্র-তন্ত্র জানে তাহারা সারারাত জাগিয়া সেই মন্ত্র-তন্ত্র আওড়াইত। তাহাদের বিশ্বাস ছিল এরূপ করিলে সেই মন্ত্র-তন্ত্র ফলদায়ক হইবে। অনেকের বাড়িতে সারারাত্র গান হইত। আস্তে আস্তে ভোরের আসমান রঙীন করিয়া সূর্য উঠিত। আমরা তখন সেই সুন্দা-মেথী, আমরুজের লতা, তেলাকুচের পাতা ও হলদী পাটায় বাটিয়া সারা গায়ে মাখিয়া নদীতে স্নান করিতে যাইতাম। ফিরিয়া আসিতে কলার ডাঁটার কাজল করিয়া মা আমাদের চোখে কাজল পরাইয়া দিতেন। তারপর তালের শাঁস, নারিকেল গুড়, আর চিড়ামুড়িসহ অপূর্ব নাস্তা করিয়া পাড়ায় বেড়াইতে যাইতাম। নইমদ্দী মোল্লার বাড়ির হালটে কুস্তী ও হাডুডু খেলা হইত। নদীর ওপারে চরে লাঠি খেলা হইত। তাহা দেখিয়া দুপুরে বাড়ি ফিরিতাম। বাড়িতে সেদিন ভাল খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হইত। গাস্বীর পরদিন বড়রা বিলে ঝিলে পলো লইয়া মাছ ধরিতে যাইত। গাছিরা অন্ততঃ একটি খেজুর গাছের ডগা কাটিয়া ভবিষ্যতে রস বাহির করার ব্যবস্থা করিত।

এদেশে হিন্দু মুসলমান বহুদিন একত্র বাস করিয়াও দুই সমাজ সামনে যোগ দিতে পারে এমন কোন অনুষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। এই গাস্বী উৎসবের মধ্যে কোন রকমের ধর্মীয় ব্যাপার নাই। এই উৎসবটিকে ভালমত সংগঠন করিয়া ইহাকে হিন্দু মুসলমানের একটি জাতীয় উৎসবে পরিণত করা যাইতে পারে।

আমার পরদাদার নাম ছিল আরাধন মোল্লা। একেবারে বাঙলা নাম আগেকার দিনে বহু মুসলমানের বিশেষ করিয়া বহু মেয়ের বাঙলা নাম থাকিত। শুনিয়াছি আরাধন মোল্লা গ্রাম দেশের প্রসিদ্ধ জোতদার ছিলেন। তাঁহার অবস্থা খুব ভাল ছিল। মাঠ ভরিয়া আখের খেত হইত, সেই আখ মাড়াইয়া, কলে পিষিয়া রস বাহির করিয়া গুড় জ্বাল দেওয়া হইত। হাজার হাজার মণ গুড় বাঁকে করিয়া বেপারীরা যখন আরাধন মোল্লার বাড়ি হইতে

গঞ্জের হাটে যাইত. তাহা নাকি দেখিবার জন্য খরের বউঝিরা পর্যন্ত বাড়ির বাহির হইয়া আসিত। বাড়িতে অতিথি মুসাফির ফিরিয়া যাইত না। মুড়ি মওয়া নারকেলের নাড়ু কাচারি ঘরেই বড় বড় কোলায় ভর্তি থাকিত। যার খুশী আসিয়া খাইলেই হইল। নিজের ছেলে-মেয়ে; জন-মানুষ মিলিয়া প্রতিবারে ২।৩ শত লোক তাঁহার বাড়িতে আহার করিত।

আরাধন মোল্লার মৃত্যুর পর পদ্মানদীতে আমাদের জমিজমা।বাড়িঘর সব ভাসাইয়া লইয়া গেল। আমার দাদারা—কলিমদ্দীন মোল্লা ছমিরদ্দীন মোল্লা আর দানু মোল্লা অন্যত্র যাইয়া বাড়ি করিলেন। ছমিরদ্দীন মোল্লা আমার আপন দাদা। তিনি বড়ই সুপুরষ ছিলেন। যৌবন কালে তাঁহার সুন্দর চেহারা দেখিয়া ঢোল সমুদ্দুরের মিয়ারা তাঁহাকে কন্যা দান করিয়াছিলেন। আমার দাদার অবস্থা ভাল ছিল না বলিয়া দাদীর ভাইরা দিনের আমাদের বাড়ি বেড়াইতে আসিতেন না। রাত্রে গোপনে আসিয়া আমার দাদীকে দেখিয়া যাইতেন। আমার দাদী ছিলেন আগুনের ফুলকীর মত সুন্দরী। আমার খুব ছোট বয়সে তিনি এন্তেকাল করেন।

আগেকার দিনে পাড়ায় পাড়ায় গানের আসর বসিত। গাজীরগান জারীগান, কেচ্ছাগানে সমস্ত গ্রাম মাতিয়া থাকিত। শহর তখনও দেশের গুণীজনকে আকর্ষণ করে না। গ্রামের শ্রেষ্ঠ গায়ক গ্রামেই থাকিত। মাঠ ছিল স্বর্ণপ্রসবা। সামান্য লাঙলের আচর দিয়া বীজ ছড়াইয়া দিলেই সবুজ ধান্যের অঙ্কুরে দিগন্ত ছড়াইয়া যাইত। নদী খাল বিল কিলবিল করিত মাছে। হাত বাড়াইয়া ধরিয়া লইলেই হইল। টাকা পয়সায় জিনিস পত্রের আদান-প্রদান খুব কমই হইত। বাৎসরিক ধানের বিনিময়ে সুতোর মিস্ত্রী লাঙাল গড়াইয়া দিয়া যাইত, নাপিত খেউরি করিয়া দিত, কুমার হাঁড়ি পাতিল দিয়া যাইত তিল সরিষার বিনিময়ে কুলুরা বাড়িতে বাড়িতে তৈল দিয়া যাইত। এখনও গ্রামদেশে এই সব বিনিময়ের প্রথা কিছুটা বজায় আছে।

প্রত্যেক বাড়িতে দুগ্ধবৎসলা গাভী ছিল। যার গাভী ছিল না সে অপরের বাড়ি হইতে চাহিয়া দুধ লইতে পারিত। আমার অন্ধ-দাদা দানু মোল্লার কোলে বসিয়া আমি বালককালে এই সব পরিপূর্ণতার কাহিনী শুনিতাম। আমার নক্সী-কাঁথার মাঠ ও সোজন বাদিয়ার ঘাট পুস্তকে আমি

এই গ্রাম বাঙলার পরিবেশেরই চিন্তা করিয়াছি। আজও গ্রামদেশের পরিপূর্ণতার ছবি মনে মনে চিন্তা করিতে আমার ভাল লাগে। আজিকার এই অভাবভরা নিরানন্দ দেশের সঙ্গে নানা কুসংস্কারপূর্ণ ধনধান্যে আনন্দ-গানে ভরা দেশকে আমি সহজেই বিনিময় করিতে পারিলে আনন্দে নাচিয়া উঠিতাম।

ছোট বেলায় আমি বড়ই চঞ্চল ছিলাম। আমাদের বাড়ির চারিধারের সকলেই কৃষক। তাহাদের ছেলেদের সঙ্গে পাড়া ভরিয়া খেলিয়া বেড়াইতাম। আমাকে কাপড় পরার এক মুস্কিলের ব্যাপার ছিল। বহু বয়স পর্যন্ত আমি লেংটা ছিলাম। গ্রাম সম্পর্কে আমার এক দাদী আমার মাজায় ব্যাঙ বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। তাহাতেও আমাকে কেহ কাপড় পরাইতে পারে নাই। ভাবী এখনও আমাকে ঠাট্টা করিয়া বলেন, "ক্লাশ থ্রিতে যখন তুমি পড় তখনও দেখিয়াছি স্কুল হইতে আসিয়া ওই পথের মধ্যে তুমি পরনের কাপড়খানা মাথায় বাঁধিয়া বাড়ি ঢুকিতে।" জামা কাপড় পরা আমার কাছে একটি শাস্তির মত মনে হইত। এখনও আমি ভাল মত পোষাক আশাক পরিতে পারি না বলিয়া বন্ধুজনের উপহাসের পাত্র হই। ইহার ফলে এই হইয়াছে যে ঠাণ্ডা ও গরম আমি যতটা সহ্য করিয়াও সুস্থ থাকি অপরে তাহা পারে না।

ছেলেবেলায় আমরা নানা রকমের খেলা খেলিতাম। গ্রামে বিবাহে যেমনটি দেখিতাম তেমনি করিয়া আমরা বিবাহের উৎসব বসাইতাম। ওপাড়ার সাগরী, ময়না, নেহাব ফুফাত বোন মাজু, এরা বউ হইত। আমি আমার চাচাত ভাই নেহাজদ্দীন এবং গ্রামের আরও কেহ কেহ হইতাম বর। গাছের পাতার টুপী পরিয়া আমরা বর সাজিতাম। সেই টুপী আবার বরকেই গড়িয়া লইতে হইত। ইদুরের মাটির মিষ্টান্ন দিয়া বর ও কনের ক্ষিরভুজানি হইত। শ্বশুরবাড়ি যাইবার সময় নতুন বধূ যে কৃত্রিম কান্না করিত তাহা শুনিয়া মুরব্বীরা পর্যন্ত হাসিয়া খুন হইতেন। নতুন বউকে বাঁশের কচি পাতা দিয়া নথ গড়াইয়া দিতাম, গায়ের মুখের চোকলা দিয়া মালা গাঁথিয়া দিতাম। বুনো পুঁই-লতার পাকা ফল ঘসিয়া নতুন বধুর হাত পা রাঙা করিয়া দিতাম। ইহাতেই সেই খেলাঘরের বধুরা যে খুশী হইত আজকাল হাজার টাকার জড়োয়া গহনা পাইয়াও কোন বধূর মুখে তেমন খুশী দেখিতে পাই না।

আমাদের বাড়ির ধারে তাঁতীপাড়ায় গভীর জঙ্গল ছিল। সেখান হইতে আমি আর আমার চাচত ভাই কাউয়ার ঠুটি লইয়া আসিতাম কাউয়ার ঠুটি এক রকমের লাল রঙের মিষ্টি ফল। ইহা কাকদের বড়ই প্রিয়। একবার এই ফল পাড়িতে আমার চাচাত ভাই নেহাজদ্দীনের মাথায় কাকে টোকর দিয়াছিল। জঙ্গলের ভিতর হইতে সজারুর কাঁটা সংগ্রহ করিয়া আনা তখনকার দিনে আমাদের মধ্যে একটি রোমাঞ্চকর ঘটনা ছিল। বনে বনে বারোমাসে বারো ফসল পাকিত। গাবের ফল পাকিত আমরা পাড়িয়া আনিয়া খাইতাম। ডুমকুর গাছে ডুমকুর পাকিলে আমরা সেই গাছের পাশেই প্রায় সারাদিন কাটাইতাম। ডুমকুরের মালা গাঁথিয়া গলায় পরিতাম। আর সেই মালা হইতে একটা একটা করিয়া পাকা ফল ছিঁড়িয়া খাইতাম। জ্যৈষ্ঠ মাসে যখন গাছে গাছে কাঁদি ভরা খেজুর পাকিত আমরা খুব ভোরে উঠিয়া তলা হইতে তাহা কুড়াইয়া আনিতাম। এই খেজুর যেদিন বেশী কুড়াইয়া আনিতে পারিতাম, মা তাহার সঙ্গে চাল-ভাজা মিশাইয়া ঢেকিতে কুটিয়া ছাতু করিয়া দিতেন। এই সামান্য খাবার তখনকার দিনে কি লোভনীয়ই না ছিল। বনের মধ্যে গ্রীষ্মকালে শেওড়া গাছে শেওড়া ফল পাকিত। হলদে হলদে পাকা ফলে সমস্ত গাছে আলো ঝলমল করিত। মনে হইত যেন কোন রাজকন্যা গা ভরিয়া গহনা পরিয়া বনের মধ্যে বসিয়া আসে। কলরব করিয়া সব ছেলেমেয়ে মিলিয়া আমরা সেই ফল খাইতাম। আমের দিনে আমাদের সব চাইতে আনন্দ ছিল।

আমাদের বাড়ির আশেপাশে কারো বাড়িতে আমগাছ ছিল না। আমরা কারিকর পাড়ায় যাইয়া আম কুড়াইয়া আনিতাম। মেঘলা করিয়া ঝড় আসিলে আমাদের কি আনন্দ হইত! আমি আর নেহাজদ্দীন মুরব্বী-দের সমস্ত বাধা ঠেলিয়া বাহির হইয়া যাইতাম আম কুড়াইতে। কাঁচা পাকা আমগুলি কুড়াইয়া আমরা যখন বাড়ি ফিরিতাম তখন তাঁতীদের বউরা, ছেলেরা পিছন হইতে আমাদিগকে গালি গালাজ করিত। আমরা গ্রা হ্যকরিতাম না। তাঁতীরা আয়াসপ্রিয়। সেই ঝড় জলে আমতলায় আসিতে সাহস করিত না।

তাঁতীপাড়ায় হদু মল্লীকের দুইটি বড় বড় তালগাছ ছিল। হদু মল্লীকের পুত্রবধূ নাকি কবে সেই তালগাছের সঙ্গে গলায় দড়ি বাঁধিয়া আত্মহত্যা

করিয়াছিল। সেই গাছের নিকট দিয়া যাইতে ভয়ে আমাদের গা ছমছম করিত। লোকের মুখে শুনিতাম, রাত্র হইলে সেই বউ নাকি তালগাছের উপর দাঁড়াইয়া মাথায় এলোচুলা মেলিয়া দেয়। এই তালগাছের একটি এখনো জীবিত আছে। রাত্রকালে এই তালগাছের তলা দিয়া যাইতে আমার গা ছমছম করিত। কিন্তু গা ছমছম করিলে কি হইবে! বর্ষাকালে টুবটুব করিয়া গাছ হইতে পাকা পাকা তাল পানিতে পড়ে। পাকা তাল খাইতে কতই মিঠা। আমি আর নেহাজদ্দীন ঠিক করিলাম, কাল রাত থাকিতে উঠিয়া তাল চুরি করিতে যাইব। সারাদিন ভরিয়া কলাগাছ কাটিয়া কলার ভেলা তৈরী করিলাম। প্রথম মোরগ ডাক দিতেই নেহাজদ্দীনের কুক শব্দ শুনিতে পাইলাম। বাজান তখনও ঘুমাইয়া আছেন। আস্তে আস্তে দম বন্ধ করিয়া বিছানা হইতে উঠিয়া আসিলাম। বাজান টের পাইলে এত ভোরে কোথাও যাইতে দিবেন না। আমাদের উঠান পার হইয়া নেহাজদ্দীনের ঘরের পিছনে কলার ভেলা। আস্তে আস্তে দুই ভাই ভেলার উপর সোয়ার হইয়া দুইটা চড়ই দিয়া ভেলা ঠেলিতে লাগিলাম। হনু শেখের পাটখেত বামে ফেলিয়া কমিরদ্দীর ধানখেতের পাশ দিয়া ভেলা লইয়া ভাসিয়া চলিলাম। এখানে ওখানে দু'একটিমাছ লাফালাফি করিতেছে। কারিকর পাড়ার জঙ্গলে কত রকমের পাখি ডাকিতেছে। ওইতো দূরে তালগাছ দুইটি দেখা যায়। হদু মল্লিকের পুতের বউ এখনো এলোচুলা মেলিয়া দিয়া গাছের উপর দাঁড়াইয়া আছে কিনা! ভয়ে নিশ্বাস বন্ধ হইতে চায়। কিন্তু পাকা পাকা তালের ঘাণ নাকে আসিতেছে। এখনই শব্দ করিয়া একটি তাল পানিতে পড়িল। দুই ভাই আরো জোরে জোরে ভেলা ঠেলিয়া তালগাছের গোড়ায় লইয়া গেলাম। তখন একটু একটু আলো হইয়াছে। দেখি গাছতলায় সামান্য মাথা জাগাইয়া কত তাল ভাসিতেছে।

আমরা মনের আনন্দে পাঁচ ছয়টা তাল ভেলায় উঠাইয়াছি, এমন সময় শব্দ করিয়া হাতের লগি পানিতে পড়িয়া গেল। হদু মল্লিক গলা খেকাড়ী দিয়া ডাকিয়া উঠিল, "এত সকালে তালতলায় কেরে?" অমনি আমরা ভেলা ঠেলিয়া বাড়ির মুখে। ইরালি-বিরালি লতার ঘাসে ভেলা আটকাইয়া যায়। প্রাণপণে তাহা ছাড়াইয়া গায়ের যত জোর দিয়া ভেলা ঠেলি কিন্তু প্রভাতের সূর্য আমাদের শত্রু হইয়া উঠিয়াছে। হদু মল্লিক উচ্চ গলায় চিৎকার

করিতে লাগিল—ওই যে জছী আর নেহা আমার তাল চুরি করিয়া লইয়া যায়! ধর! ধর! কিন্তু ধরিবে কে? তাঁতীদের বাড়ি উচ্চ জায়গায়, তাদের নৌকা বা কলার ভেলা নাই। আমরা তাড়াতাড়ি বাড়ি আসিয়া পৌঁছিলাম। মুরব্বীরা এই জন্য কম বকিলেন না; কিন্তু তাল চুরির মধ্যে যে অপূর্ব রোমাঞ্চ অনুভব করিয়াছিলাম তাহা সমস্ত বকাবকিকে অতিক্রম করিল। হদু মল্লিকের এই তালগাছ আরও এক কারণে আমার নিকট বড়ই রহস্যময় ছিল। এই তালগাছের ডালে ডালে শত শত বাবুই পাখির বাসা। স্কুল হইতে ফিরিবার সময় কতদিন যে বইখাতা বোগলে করিয়া এই তালগাছ দুটির পানে চাহিয়া থাকিয়াছি তাহার আর কোন ইয়াত্তা নাই। স্কুল হইতে ফিরিবার সময় ক্ষুধায় পেট জ্বলিয়া যাইত। জোরে জোরে পা ফেলিতাম বাড়ি আসিবার জন্য। কিন্তু এই তালগাছ দুটির নিকটে আসিয়া সকল ভুলিয়া যাইতাম। কি সুন্দর নৈপুণ্যের সঙ্গে বাবুই পাখিগুলী বাসা বানাইত। একটি পাখি থাকিত বাসার উপরে আর একটি বাসার ভিতরে বসিয়া। সে চঞ্চুর সাহায্যে অতি কলা-কৌশলের সঙ্গে তালপাতার আঁশরলি উপরে উঠাইয়া দিত. আবার উপরের পাখিটা সেই আঁশকে চঞ্চুর সাহায্যে নিচে বিলি দিয়া দিত। এইভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাসের পর মাস কোন এক জোড়া পাখি সবুজ পাতার, আঁশ দিয়া নতুন বাসা বানাইত। তাদের বোধ হয় নতুন দাম্পত্য জীবন সবে আরম্ভ হইয়াছে। বাসা বানাইতে এ ওর গায়ে পাখা ঘষিয়া আদর করিত। ঠোঁটের পাতার সুতালী ফুরাইয়া গেলে দুইজনে উড়িয়া যাইয়া অপর গাছ হইতে পাতা চিরিয়া সুতালী তৈরী করিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া বাঁসা বানানর কাজে লাগিয়া যাইত।

কোন কোন বাবুই দম্পতি তাহাদের পুরাতন বাসার যেটুকু ঝড়ে বা রৌদ্র বৃষ্টিতে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা নতুন করিয়া বুনট করিত। দুইটি তালগাছ ভরিয়া শত শত বাসা। কত রকমেই বাবুই পাখিরলি ডাকিত। আস্তে, জোরে, বিলম্বিত লয়ে। যাহাদের বাসা তৈরী হইয়া গিয়াছে তাহারা দল বাধিয়া যাইয়া নিকটের ফসল খেত হইতে শস্যকণা টুকাইয়া লইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিত। একি কম রহস্যের ব্যাপার। দেখিয়া দেখিয়া আশ মিটিত না। আমার দাদাজানের কাছে শুনিয়াছিলাম, কোন অপরাধের জন্য বাবুই পাখিদের কে নাকি অভিসম্পাত করিয়াছিল. এত

সুন্দর বাসা বানাইলে কি হইবে ? 'এই বাসায় তোরা থাকিতে পারিবি না।' সেই অভিসম্পাতের জন্য এত যে নৈপুণ্য করিয়া বাবুই পাখিরা বাসা করে কিন্তু সেই বাসায় তাহারা বাস করিতে পারে না। ঝড়ে জলে রোদ্রে বর্ষায় তাহারা বাসার উপরেবসিয়া থাকে। বাসার ভিতরে ছোট কুঠরিতে ডিম পেড়ে। দরকার মত সেই ডিমে তা দেয়। ডিম ফুটিয়া বাচ্চা হইলে এধার ওধার হইতে আহার টুকাইয়া আনিযা বাচ্চাদের খাওয়ায়। বাচ্চারাও উড়িতে শিখিয়া আর বাসায় থাকে না। মা-বাপের মত বাসার উপরেই রাত্র যাপন করে। রাত্রে নিজেদের বাসায় আলো করিবার জন্য বাবুই পাখিরা চঞ্চুতে কদিয়া একটু গোবর আনিয়া বাসার এক কোণে রাখে। সেই গোবরের গাদায় জোনাকীপোকা ধরিয়া আনিয়া আটকাইয়া দেয়। রাত্র হইলে সেই জোনাকী পোকার আলোকে সমস্ত বাসা আলোকিত হয়। তারই সলথে বাবুই পাখিরা বাসার ভিতরকার ডিম বা বাচ্চাগুলিকে রাতভর পাহারা দেয়। শত্রুর আনাগোনা নিরীক্ষণ করে। রাত্রে যখন বাতাস শোঁ শোঁ করে বাবুই পাখির বাসায জোনাকীর বাতিগুলি অন্ধকারে ঝিকমিক করে মনে হয় কে যেন এক সঙ্গে অনেকগুলি মণিমানিক্য লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে। এই তালগাছ দুটি বালককালে আমার নিকট অপূর্ব রহস্যে ভরা ছিল। আজ বড় হইয়া সেই রহস্যের দেশ হইতে অনেক দূরে চলিয়া আসিয়াছি। এখনও গ্রামে গেলে কখনো কখনে দেখিতে পাই কোন রাখাল ছেলে দুগ্ধের কেড়ে হাতে লইয়া একদৃষ্টিতে তালগাছটির দিকে চাহিয়া আছে। বাজারের বেলা চলিয়া যাইতেছে, সেদিকে তাহার খেয়ালও নাই। এই পরিণত বয়সে সেই রাখাল ছেলেটির সঙ্গেই আবার সেই তালগাছটির দিকে চাহিয়া থাকি। হায়, গ্রাম্য রাখাল ছেলের চোখেদুখে এই বৃদ্ধ তালগাছ যে অপূর্ব রহস্যজাল মেলিয়া ধরে তার শতাংশের একাংশেরও ভাগী আমি যদি হইতে পারিতাম!

আমাদের বাড়ির সামনে ছিল একটা নদী। পদ্মা এখান হইতে চর ফেলিতে ফেলিতে চলিয়া যাইবার সময় এই জলরেখার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছিল। একে আমরা বলিতাম মরাগাঙ। এই গাঙে সাঁতার কাটা ছিল আমাদের ছেলেবেলার আর এক আকর্ষণ। বেলা নয়টা দশটা বাজিতেই আমরা দল বাঁধিয়া নদীতে নামিয়া পড়িতাম। গাঁয়ের আর সব ছেলেদের সঙ্গে হৈলডুবি, ঝাপড়ি প্রভৃতি নানা খেলা খেলিতাম। হৈলডুবি খেলা ছিল

এইরূপ। একজন দূরে যাইয়া খানিকটা পানি হাতে লইয়া আর আর সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করিত, আমার হাতে কি? তারা উত্তর করিত দুধ। তখন সে হাতের পানি মাঝগাঙে ছড়াইয়া দিয়া বলিত, অতদূর যে যাইতে না পারিবে সে খাইবে কুত্তার মুত। আমরা সকলে যখন সেই অতদূরে সাঁতরাইয়া যাইতাম সে তখন ডুব দিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইত। যে তাহাকে সাঁতরাইয়া আগে ধরিতে পারিত তাহারই জিত হইত। সে পরবর্তীকালে পানি ছুড়িবার সুযোগ পাইত। ঝাপড়ি খেলার বেশ সুন্দর একটি ছড়া ছিল। ভালমত মনে নাই। আমরা গোল হইয়া একটি ছেলেকে ঘিরিয়া দাঁড়াইতাম। সে একটা কুটা লইয়া সেই ঘেরের মাঝখানে ছাড়িয়া দিত। আমরা সকলে মিলিয়া পানি ওলট পালট করিতাম। তারপর সেই কুটাটি যে খুঁজিয়া পাইত তাহারই জিত হইত। পরবর্তী খেলার সে আমাদের ঘেরের মধ্যে কুটা ছাড়িয়া দেওয়ার অধিকার পাইত। ইহা ছাড়া বয়স্ক একজন কেহ আমাদের এক একটি ছেলেকে কাঁধে করিয়া অনেক পানিতে আনিয়া ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিত। আমরা সাতার কাটিয়া কিনারে আসিতাম। ইহা ছাড়া চিতসাঁতার, এক হাতের সাঁতার, কত রকমের সাঁতারই না জানিতাম। আমার যতদুর মনে পড়ে তখনকার দিন পাঁচ ছয় ঘণ্টা পানির মধ্যে সাঁতার কাটিয়াও আমি হয়রান হইতাম না। প্রায় সারাটা দিন পানিতে কাটাইতাম। পানিতে ডুবিয়া ডুবিয়া দুইটি চোখ যখন জবাফুলের মত লাল হইয়া উঠিত তখন বাড়ি ফিরিতাম। আমার পিতা স্কুলের কাজে দুপুরে বাড়ি হইতে চলিয়া যাইতেন। সুতরাং শাসন করিবার কেহ ছিল না। সাঁতার কাটিয়া যখন বাড়ি ফিরিতাম, মা তাঁর আঁচলে গা হাত মুছাইতে মুছাইতে বকুনি দিতেন। কিন্তু তখন ত সাঁতার কাটা শেষই হইয়াছে। পরদিন আবার যখন নদীতে নামিতাম নদীর এই রহস্যের কাছে মায়ের বকুনি কোথায় তলাইয়া যাইত।

ছেলেবেলায় আমাকে স্কুলে পাঠাইতে আমার পিতাকে বড়ই বেগ পাইতে হইয়াছিল। গ্রামে কারো বাড়িতে কেহই স্কুলে যাইত না। সমবয়সী সাথীদের নিকট শুনিতাম স্কুলে গেলে মাষ্টারের নিকট নানারকমের শাস্তি পাইতে হয়। তাই যেদিন বাজান বলিতেন, কাল আমি তোমাকে আর নেহাজদ্দীনকে পাঠশালায় লইয়া যাইব, আমি আর আমার চাচত

নেহাজদ্দীন রাত্রে বসিয়া নানরূপ ফন্দী-ফিকির আঁটিতাম। কি কৌশল করিলে পাঠশালায় যাওয়ার হাত হইতে রেহাই পাইব। হায়! হায়! পাঠশালায় ভর্তি হইলে আর ত সারাদিন নদীতে যাইয়া সাঁতার কাটিতে পারিব না। ডুমকুর গাছে ডুমকুর পাকিবে, গাবগাছে গাব পাকিবে। কাঁদিভরা খেজুর পাকিয়া লাল টুকটুকে হইবে। অপরে পাড়িয়া লইয়া যাইবে। আমাদের সেই খেলাঘরে অপরে আসিয়া খেলা জমাইবে। পাঠশালার সে কঠিন কারাগারে বসিয়া এই দুঃখ কেমন করিয়া সহ্য করিব। রাত্রে ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতাম, যমদুতের মত পাঠশালার মাষ্টার তাহার বেত্র উঠাইয়া আমাকে মারিতে উদ্যত হইযাছে।

ভোর না হইতেই আমি আর নেহাজদ্দী বাড়ি হইতে পালাইয়া যাইয়া সামনের আঁখের খেতে ঢুকিতাম। সেখানে বসিয়া বসিয়া দুই ভায়ের চোখে পানি আসিত। বাজানকে আমি বড়ই ভালবাসিতাম। আমার এতটুকু অসুখ করিলে তিনি আমার বিছানার পাশে বসিয়া কত পাখার বাতাস করিতেন। আমাকে খুশী করার জন্য মেলার দিন পুতুল কেনার পয়সা দিতেন। সেই বাজান আজ আমার প্রতি এমনি নিষ্ঠুর হইয়া উঠিলেন। কোন প্রাণে তিনি আজ তাঁর এত আদরের ছেলেকে নিষ্ঠুর মাষ্টারের হাতে সপিয়া দিতে যাইতেছেন। পৃথিবীতে ধর্ম বলিয়া কি কোন বস্তু নাই! যদি থাকিত তবে কি এমন হইতে পারিত! প্রায় অর্ধেক দিন এইভাবে আখের খেতে কাটাইতাম। দুই পাশের আখ ভাঙিয়া চিবাইতে চিবাইতে মুখে ঘা হইয়া যাইত। তারপর যখন বুঝিতাম, বাজান এখন বাড়ি নাই, স্কুলে চলিয়া গিয়াছেন, আমরা আখের খেত হইতে বাহির হইয়া বাড়ি ফিরিতাম।

এইভাবে আজ পালাই আখের খেতে কাল পালাই শরষে খেতে। শরষে খেতের তলায় মটরের সীম, খেসারী কলায়ের সীম। সেগুলি খাইয়া অনায়াসে ক্ষুধা নিবৃত্তি করা যায়। কিন্তু কতদিন আর পালাইয়া বাঁচা যায়। নিজের বাপই যার এমন শত্রু তার কপালে কি দুঃখ না থাকিয়া পারে? সেদিন শরষে খেত হইতে বাজান আমাদের দু'ভাইকে ধরিয়া আনিয়া স্কুলে লইয়া চলিলেন। কোরবানীর খাসীর মত আমরা দু'ভাই কাঁপিতে কাঁপিতে পাঠশালায় চলিলাম।

আমাদের বাড়ির পশ্চিমে শ্মশানঘাটের রাস্তা, সেখান দিয়া হানিফ

বাড়ি পারাইযা ছোট গাঁও। তার উপরে বাঁশের সাঁকো। আমরা যেন পোলছুরাত পার হইতেছি। সেই সাঁকো পার হইয়া সীতানাথ চৌধুরীর বাড়ি। তারপরই বৈঠকখানায় পাঠশালার ঘর। যাইযা দেখিলাম মাষ্টার মহাশয় বেত হাতে বসিয়া আছেন। বারান্দায় দুই-তিনটি ছেলে নিলডাউন ও হাপ নিলডাউন হইযা আছে। আর একটি ছেলে সূর্যের দিকে চাহিয়া আছে। মাষ্টার মহাশয তাড়াতাড়ি উঠিযা দাঁড়াইয়া আমার পিতাকে সালাম করিলেন। আর আর ছাত্রেরাও উঠিযা দাঁড়াইল। যাহারা নিলডাউন, হাপ নিলডাউন হইযা শাস্তি পাইতেছিল তাহারাও শাস্তি ইহতে রেহাই পাইল। আমার পিতার যে এত সম্মান তাহা আগে জানিতাম না। গর্বে আমার বুক তিন হাত হইল। কিছুক্ষণ মাষ্টার মহাশযের সঙ্গে কথাবার্তা বলিযা বাজান চলিযা গেলেন। মাষ্টার মহাশয আমাদিগকে বড়ই স্নেহের চোখে দেখিলেন। বলিযা দিলেন, কাল হইতে দোযাত কলম ও কলাপাতা লইযা আসিও।

স্কুলের ছুটি হইলে আমি আর নেহাজদ্দীন বাড়ি ফিরিবার পথে বলাবলি করিতে লাগিলাম, নারে পাঠশালা ত তত খারাপ নয। কাল আবার আসিব। মাষ্টার মহাশয আমাদিগকে মারিবেন না।

বাড়ি আসিযা দেখি মা পথের দিকে চাহিযা আছেন। আমি যেন কোন দেশ জয করিযা দেশে ফিরিযছি, মায়ের চোখে মুখে এই ভাব। কত আদর করিযা মা নিজের হাতে ধরিয়া ধরিযা আমাকে তাঁর সত্ত তৈরী পাকান পিঠাগুলি খাওযাইলেন।

পরের দিন সকাল না হইতে নদীর ধারে যাইয়া কাশবনে ঢুকিয়া লাল রঙের সুন্দর দুইটি খাগের ডাগা কাটিযা আনিলাম। আমার বড় ভাই তাহা কাটিয়া আমাদের দুইজনেই জন্য দুইটি খাগের কলম বানাইয়া দিলেন। তারপর লাউপাতাতায় পানি মিশাইয়া হাড়ি-পাতিলের পিঠের কালিতে ঘষিয়া কালি তৈরী করিলাম। বাড়িতে অসংখ্য কলাগাছ ছিল। সুতরাং কলাপাতা কাটিয়া সাইজ মত চিরিয়া লইতে অসুবিধা হইল না। পাঠশালায় আসিয়া দেখি, মাষ্টার মহাশয় এখনো আসিয়া পৌঁছেন নাই। ছেলেরা সারাটি গ্রাম ঘুরিয়া এ-বাড়ি সে-বাড়ি হইতে গাছের ফল পাড়িয়া আনিয়া খাইতেছে। কেহ কেহ মাঠে যাইয়া কলাইয়ের সীম টুকাইতেছে,

কেহ কেহ দল বাঁধিয়া খেলা করিতেছে। কিন্তু সকলেরই লক্ষ্য আছে মাষ্টার মহাশয় কখন আসেন। রোজ যে পথ দিয়া তিনি আসেন সে পথে পাহারা বসা আছে। দূর হইতে মাষ্টার মহাশয়কে দেখিয়াই তাহারা আর সব ছেলেদের খবর পাঠায়। সেদিন দুপুর বেলায় এরূপ খবর পাইয়া, কোন ছেলে পেয়ারা খাইতে খাইতে, কোন ছেলে তার আধেক খাওয়া আখের খণ্ডটি যথাস্থানে লুকাইয়া রাখিতে রাখিতে, কোন ছেলে পান খাওয়া মুখ ধুইতে ধুইতে, কোন ছেলে সদ্য তামাক খাওয়া মুখে কয়েকটি পেয়ারা পাতা চিবাইতে চিবাইতে, পাঠশালার ঘরে আসিয়া যার যার পড়ায় মনোযোগ দিল! তাহাদের সুউচ্চ পড়ার ধ্বনিতে পাঠশালা ঘরের চালা কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। মাষ্টার মহাশয় খুশী হইয়া চেয়ারে আসিয়া বসিলেন। দুখটি ঢেঙা ছেলে দুইপাশ হইতে দুখানা তালের পাখা লইয়া মাষ্টার মহাশয়কে বাতাস করিতে লাগিল। আর দুইজন ছুটিল মাষ্টার মহাশয়ের জন্য তামাক সাজিয়া আনিতে। অনেকক্ষণ তামাক টানিয়া মাষ্টার মহাশয় বড় বড় ছেলেদের পড়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। যে-সব আধেক বয়সী ঢেঙা ঢেঙা ছেলেদের আমরা কেউকেটা বলিয়া মনে করিতাম, পড়া নাপারার জন্য মাষ্টার মহাশয় তাহাদের মারিয়া অস্থির করিলেন। কাউকে কাউকে নিলডাউন ও হাফ নিলডাউন হইয়া পড়া তৈরী করিয়া আনিতে বলিলেন। এই বার আমার ও নেহাজদ্দীনের পালা। আমাদের আনা কলাপাতার উপর তিনি শ্লেট পেন্সিল দিয়া সবগুলি বর্ণমালা লিখিয়া দিয়া বলিলেন, ইহার উপরে কালি দিয়া দাগ দিতে থাক বলা বাহুল্য অপটু হাতে কালিতে কলম ডুবাইয়া সেই কলাপাতার উপর কলম চালাইতে মাঝে মাঝে অক্ষর আকা রেখাগুলির ডাইনের বামের বহুস্থানই শুধু কলঙ্কিত করিলাম না, আমার হাতের আঙুলগুলির সঙ্গে জামা-কাপড়ও কলঙ্কিত হইয়া উঠিল।

এইভাবে আমরা পড়াশুনা করিতেছি, ও পাড়া এ পাড়া হইতে কত জন আসিয়া নালিশ আরম্ভ করিল, মাষ্টার মহাশয়, আপনার পাঠশালার ওমুক আমার আখের খেত হইতে আখ চুরি করিয়া আনিয়াছে অমুক আমার গাছের পেয়ারা চুরি করিয়াছে রাশি রাশি পেয়ারা সহ গাছের ডালখানা ভাঙিয়া আনিয়াছে, অমুক আমার শশাগাছের জালি শশাটি ছিঁড়িয়া আনিয়াছে। এক একজনের জবানবন্দী লইয়া মাষ্টার মহাশয়ের বেত সমানে অপরাধীদের

পিঠে পড়িতে লাগিল। এমনি করিয়া রোজ পাঠশালার পড়াশুনা চলিত। বাহির হইতে মাষ্টার মহাশয়কে বড়ই কঠোর মনে হইত কিন্তু তিনি মাঝে মাঝে বড়ই স্নেহপ্রবণ হইতেন। ছাত্রদের সুখ-দুঃখের কাহিনী শুনিতেন। যাহারা বেতন দিতে পারিত না তাহাদিগকে তিনি স্কুল হইতে তাড়াইয়া দিতেন না।

আমাদের পাঠশালায় গভর্ণমেণ্টের কোনই সাহায্য ছিল না। ছাত্রবেতন মাত্র দুই টাকা আড়াই টাকার মত আদায় হইত। নিজের ঘর-সংসারের কাজ সারিয়া মাষ্টার মহাশয় স্কুলে পড়াইতে আসিতেন। তাই সময়মত আসিয়া উপস্থিত হইতে পাড়িতেন না। পাঠশালায় যাহারা মনোযোগী ছাত্র ছিল তাহাদিগকে তিনি বড়ই আগ্রহ করিয়া পড়াইতেন। তাঁর স্কুল হইতে বহুবার ছাত্রেরা জলপানি পাইয়াছে। কিন্তু সেজন্য মাষ্টার মহাশয়ের কোনই উন্নতি হয় নাই।

হিন্দু পাড়ার এই পাঠশালা আমার কাছে বড়ই আকষনের বস্তু হইয়া উঠিল। হিন্দুদের বাড়িতে বাড়িতে নানা রকম ফুলের গাছ। শীতকালে রক্তগাঁদা আর বড় গাঁদার রঙে আর গন্ধে উঠানের অর্দ্ধেকটা আলো হইয়া থাকে। গাঁদা ফুলের চাইতেও সুন্দর হিন্দু বউরা কপালভরা সিঁদুর পরিয়া উঠানের উপর সুনিপুন করিয়া চালচিত্র আঁকিত। কার্ত্তীক পূজা লক্ষ্মী-পূজায় জোকার দিয়া শঙ্খ বাজাইত। বিবাহের উৎসবে ঢোল সানাই বাজিত। আমাদের মুছলমান পাড়ায় গান বাজনা নাই। কারো বাড়িতে ফুলের গাছ নাই। ওহাবী আন্দোলনের দাপটে গ্রাম হইতে আনন্দ-উৎসব লোপ পাইয়াছে। আমি আমার হিন্দু বন্ধুদের বাড়ি হইতে চাহিয়া-চিন্তিয়া ফুলের গাছ, পাতাবাহারের ডাল আনিয়া বাড়িতে লাগাইতাম। গাছগুলিকে কতই না যত্ন করিতাম। কিন্তু ফসল কাটার সময় আসিলে তাহার উপরে রাশি রাশি খড় মেলিয়া শুকান হইত। কৃষাণদের অসাবধান পায়ের তলায় কত গাছের ডালগুলি ভাঙিয়া যাইত। আমি চিৎকার করিয়া কাঁদিতাম। একটা ফুলের গাছ ভাঙার জন্য যে কেহ দুঃখ পাইয়া কাঁদিতে পারে একথা বাড়ির কেহই বুঝিত না।

এমনি করিয়া উঠানের ধারে বাগান করায় ব্যর্থ হইয়া আমাদের কলা-বাগানের জঙ্গলের মধ্য একটি জায়গা কোপাইয়া ফুলের বাগান করিলাম।

একে ত সেখানে রৌদ্র নাই। তার উপরে গাছের তলায় সব সময় ছায়া করিয়া আছে। ফুলের গাছ তেমন জোর ধরিয়া ফুল ফোটাইল না। কিন্তু কয়েকটি পাতাবাহারের ডাল রঙ-বেরঙের পাতা মেলিযা ঝলমল করিযা উঠিল। আমার পরিচিত কেহ বাড়ি আসিলে আমি আগ্রহ করিযা তাহাকে এই বাগান দেখাইতাম।

আমাদের গ্রামে এক কাকচরিত ব্রাহ্মন আসিতেন। বাড়িতে বাড়িতে যাইয়া তিনি লোকের হাত দেখিযা গোণাপড়া করিতেন। তিনি গ্রামে আসিলেই আমি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতাম। গ্রামের কেহ তাঁহার নিন্দা করিলে আমি গোপনে তাহাকে বলিযা দিতাম। সেই নিন্দুক লোকটির ভাগ্য গণিতে তিনি ঐ নিন্দার কথা বলিযা দিতেন। লোকে বলাবলি করিত, দেখ ঠাকুরের কত কেরামতি। মনের কথা জানিতে পারে। এই ঠাকুর আমাকে বড়ই ভালবাসিতেন। একবার আমি এই ঠাকুর মহাশযকে আমার বাগান দেখিতে লইযা গেলাম। পাতাবাহারের গাছগুলি দেখিয়া তিনি বড়ই খুশী হইলেন। আমাকে কানেকানে বলিযা দিলেন, এই গাছ-গুলির কাছে আসিয়া তুমি মনে মনে বলিবে, এই পাতাবাহারর মত সুন্দব একটি বউ যেন আমার হয়। এরপর এই পাতাবাহারের গাছে পানি দিতে আসিয়া কেমন যেন লজ্জায রাঙা হইযা উঠিতাম। হযতো মনে মনে দুই একবার বলিতামও, গাছ, তোমার মত সুন্দর বউ যেন আমার হয। বিবাহের বাসর রাতে নতুন বউকে এই গল্প বলিয়া তার মুখে কিঞ্চিত লজ্জামিশ্রিত হাসি উপহার পাইয়াছিলাম।

পাঠশালায় আমার এক বন্ধু ছিল বিনোদ। সে এখন রাজমিস্ত্রীর কাজ করে। তাহাদের বাড়িতে ছিল একটি কালো তুলসীর গাছ। বিনোদ বলিত, এই কালো তুলসীর পাতায অনেক অসুখ সারে। কারো যদি হাত পা কাটিয়া যায়, ইহার রস ক্ষতস্থানে দিলেই রক্ত বন্ধ হইয়া যায়। কালো তুলসীরগাছের আরও অনেক গুণপনার কথা সে বলিত। আজ তাহা মনে নাই। পাঠশালার ছুটির পরে বিনোদের বাড়ি যাইয়া এই তুলসীগাছটির পানে চাহিয়া থাকিতাম। লাল কালতে মিশান পাতাগুলি কতই সুন্দর। কাছে যাইযা গন্ধ শুকিতে প্রাণ ভরিয়া যাইত। বিনোদকে বলিলাম, এই গাছের একটি চারা আমাকে দে। কিন্তু সে কিছুতেই আমার অনুরোধ

রাখিল না। সেবার আমার শ্লেট পেন্সিলের অর্দ্ধেকটা ভাঙ্গিয়া দিয়া বহু অনুনয়-বিনয় করিয়া তাহার নিকট হইতে একটি কালো তুলসীর চারা বাড়িতে আনিয়া লাগাইলাম। মুসলমান বাড়িতে তুলসীগাছ লাগাইয়া অনেকের কাছে সমালোচনার পাত্র হইলাম, কিন্তু আমার তুলসীগাছটি যখন বড় হইল তখন ঔষধি হিসাবে তাহার পাতা লইতে এবাড়ি ওবাড়ি হইতে যখন লোক আসিত, আমার বুক গর্বে ভরিয়া যাইত আজও হাটের পথে বিনোদের সঙ্গে যখন দেখা হয়, এই কালো তুলসী গাছটির গল্প বলিয়া আবার আমরা ছেলে বেলায় ফিরিয়া যাই।

আমার পিতার দোস্ত ছিলেন জোয়াইড় গ্রামের মনসুর মৌলবী। ইনি ঢাকা হইতে আরবী-পারসী শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। গ্রামে আসিলে তিনি আমাদের বাড়িতে আস্তানা গাড়িতেন, আর এবাড়ি ওবাড়ি মিলাদের দাওয়াত রক্ষা করিতেন। ছোট বেলায় আমি বড়ই নোংরা ছিলাম। মুখ দিয়া সর্বদা লোল পড়িত। কেহই আমাকে কাছে বসিতে দিত না। কিন্তু এই মৌলবী সাহেব কেন যেন আমাকে অত্যাধিক স্নেহ করিতেন। নিজের পাতে বসিয়া খাওয়াইতেন। আমার অসাবধান মুখের ভাত তাহার পাতে পড়িত। তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। আমাদের বাড়ির ধারেকাছে মৌলবী সাহেবের দাওয়াত হইলেও আমি তালেব-এলেম হইয়া তাঁহার সঙ্গে যাইতাম। কিস্তিটুপী মাথায় দিয়া মৌলবী সাহেবের কেতাব কোরান কাঁধে ঝুলাইয়া যখন তাঁহার সঙ্গে যাইতাম তখন গর্বে আমার বুক ফুলিয়া উঠিত। মনে মনে বলিতাম, যাহারা আমাকে নোংরা বলিয়া দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দেয় একবার তাহারা চাহিয়া দেখুক, আমি কেউ কেটা নই। বারবার মৌলবী সাহেবের সঙ্গে দাওয়াতে যাইয়া মিলাদের সমবেত দরূদশরীওগুলি আমি বেশ আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলাম। মিলাদের সময় মৌলবী সাহেবের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া এই দরূদশরীফগুলি আমি শুর করিয়া পড়িতাম। মৌলবী সাহেব যখন থাকিতেন না, আমি আমার পিতার বইগুলি কাপড় দিয়া বাঁধিয়া গলায় ঝুলাইয়া আমাদের পাশ্বর্তী বচন মোল্লার বাড়িতে যাইয়া কৃত্তিম মৌলুদ পড়িতাম। বচন মোল্লা গ্রাম সম্পর্কে ছিলেন আমার দাদা। তাঁর স্ত্রী, বোন ও ভায়ের বউরা সবাই সম্পর্কে আমার দাদী। তাঁহারা

আদর করিয়া আমাকে উঠানের মধ্যে মাদুর পাতিয়া বসিতে দিতেন। কলার কচিপাতা দিয়া মোমবাতী বানাইয়া আমার সামনে রাখিতেন। পোলছুরাতের বর্ণনা হইতে আরম্ভ করিয়া গোর-আজাব শেষ করিয়া আমি যখন সুর করিয়া গান ধরিতাম।

মৌলবীর মাফেলেতে মোমবাতি চাহিরে
মৌলবীর মাফেলেতে আতর গোলাপ চাহিরে

তখন আমার দাদীরা আতর গোলাপে পরিবর্তে আমার মাথায় বদনা হইতে পানি ছিটাইয়া দিয়া হাসিয়া কুটি কুটি হইতেন।

ছোট বেলায় আমার ইচ্ছা ছিল, বয়স হইলে আমি ঢাকায় যাইয়া মৌলবী হইব। মায়ের কাছে অপরাধ করিয়া বকুনি খাইলেই আমি আমার পিতার বইপত্র বোগলে ঝুলাইয়া ঢাকায় রওয়ানা হইতাম তখনও বাড়ি হইতে বেশী দূরে যাইবার সাহস হয় নাই। আমাদের বাড়ির সামনে ছোনের খেত। সেখানে যাইয়া গোসা করিয়া দাঁড়াইয়া থাদিতাম বাজান আসিয়া অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া আমাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতেন।

আজকাল আগেকার মত সেই মিলাদ আর নাই। মৌলবী সাহেবরা মিলাদের মহাফেলে বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় কার কতটুকু উপকার হয় জানি না। কিন্তু মনসুর মৌলবী সাহেব মিলাদ পড়িতে কোরান কেতাব ঘাটিয়া অনেক সুন্দর সুন্দর কাহিনী বলিতেন। লাইলী মজনুর কেচ্ছা, ইছুফ জোলেখার কেচ্ছা, মহরমের কেচ্ছা, ইসমাইলের কোরবানীর কেচ্ছা, প্রভৃতি কত কাহিনীই না তিনি বলিতেন। খাওয়া দাওয়ার পরে তিনি মিলাদ আরম্ভ করিতেন। এই মিলাদের সময় কাহিনী বলিতে মাঝে মাঝে তিনি সুর করিয়া দরূদ শরীফ পড়িতেন। শ্রোতারাও তার সঙ্গে যোগ দিত। কাহিনীর করুণ স্থানে আসিয়া তাহার সুন্দর মুখখানা অশ্রু-শিক্ত হইয়া উঠিত। শ্রোতারাও সেই সঙ্গে কাঁদিয়া আকুল হইত। কোন কোন সময় মিলাদ শেষ হইতে রাত্র ভোর হইয়া যাইত।

শ্রোতারাও গৃহে ফিরিয়া যাইতে সেই কাহিনীর আদর্শবাদ তাহারা মনে আঁকিয়া লইয়া যাইত। তাহাদের নিত্যনৈমিত্তিক কাজে আত্মীয় পরিজনের প্রতি ব্যবহারে এই আদর্শবাদ অনেকখানি প্রভাব বিস্তার

করিত। মনসুর মৌলবী সাহেবের পরে গৈজদ্দীন মুন্সী সাহেব আমাদের গ্রামে আসিয়া মিলাদ পড়িতেন। তিনিও মিলাদের মহাফেলে সুন্দর সুন্দর কাহিনী বলিতেন। গ্রামের অশিক্ষিত চাষীরা অতি উৎসাহের সঙ্গে তাহার মিলাদ পড়া শুনিত। আগেকার দিনে মৌলবী হইতে হইলে অনেক পড়াশুনার প্রযোজন ছিল না। কোরান শরীফের দু'চারটি সুরা সুর করিয়া পড়িয়া গোলেস্তা বুস্তা অথবা অন্যান্য গ্রন্থ হইতে যিনি সুন্দর সুন্দর গল্প বলিতে পারিতেন তিনিই মৌলবী হইতেন। গল্প বলার ক্ষমতা খোদা দত্ত। ইহা কেহ ইচ্ছা করিযা আযত্ত করিতে পারে না। তাই আগেকর মৌলবীরা মিলাদ পড়ার ক্ষমতা লইয়াই জন্মগ্রহণ করিতেন। এখনকার মৌলবীরা কোরান কেতাব পড়িয়া বক্তৃতা করেন। তাই প্রথা হিসাবে মিলাদের প্রচলন এখন যদিও আছে, আগেকার মত মিলাদের মাহ্‌ফিলে শ্রোতাদের তেমন আগ্রহ না।

আমার প্রথম জীবনে এই মৌলবী সাহেবের যে প্রভাব পড়িয়াছিল, তারার জন্য আজও আমি আর দশজনের মত আমাদের আলেম সমাজকে সমলোচকের দৃষ্টিতে দেখিতে পারি না। পূর্বকালে এঁরা আমাদের সমাজে যে আদর্শবাদের বীজ রোপন করিযা গিযাছেন তাহা স্মরণ করিযা কৃতজ্ঞতায আমার অন্তর ভরিয়া উঠে। কিন্তু তাই বলিয়া আধুনিক কোন ভণ্ড মৌলানাকে আমি সমথন করি না। কাজী নজরুলের সঙ্গে আমার নিবিড় সম্পর্ক ছিল। আমার 'মুন্সী সাহেব' কবিতাটি যখন সওগাতে ছাপা হয, তিনি ঠাট্টা করিরা বলিয়াছেন, "দেখ গিয়া, তোমার কবিতাটি কাঠ মোল্লার মসজিদের দেয়ালে দেয়ালে লটকাইয়া রাখিয়াছে।" এই উপহাসে আমি এতটুকুও লজ্জিত হই নাই। নজরুলের সঙ্গে আমার সাহিত্যিক আত্মীয়তা থাকিলেও আমরা দুইজনে দুই জগতের লোক। নজরুল ছিলেন বিদ্রোহী—ভাঙার প্রতীক। তিনি বলিতেন, "আমী আগে ভাঙিয়া যাইব। তারপর সেখানে নবনবীনেরা আসিয়া নতুন সৃষ্টির উল্লাসে মাতিবে।" আমি বলিতাম, "আমাদের যা আছে তারই উপর নতুন সৃষ্টিকরিতে হইবে। পুরাতনের ভিতরে যা কিছু মনিমানিক্য আছে তাহা ঘসিয়া মাজিয়া লোকচক্ষুর গোচর করিতে হইবে।" যাক সে কথা।

মনসুর মৌলবী সাহেব বিবাহ করিয়াছিলেন আমাদের গ্রাম

হইতে ষোলসতের মাইলদূরে চরভদ্রাসন গ্রামে। আমার পিতা মাঝে মাঝে সেই গ্রামে বেড়াইতে যাইতেন। শুনিয়াছি, আমার পিতার মত একজন শিক্ষিত লোককে দেখিবার জন্য সেখানে গ্রাম গ্রামান্তর হইতে বহুলোক আসিয়া জড় হইত। আর এবাড়ি ওবাড়ি দাওয়াতের ত অন্তই ছিল না। প্রেত্যক বারেই অন্ততঃ শতলোক তাঁহার সঙ্গে আহারে নিমন্ত্রিত হইত। এই গ্রামের লোকেরাও ফরিদপুরে মামলা মকর্দ্দমা করিতে আমাদের বাড়ি আসিয়া অতিথি হইতেন। মাঝে মাঝে কুড়ি পঁচিশ জনের অধিক অথিতি সমাগম হইত। এই অতিথিদিগকে আদর যত্ন করিতে আমার পিতা পাগল হইয়া উঠিতেন। ফরিদপুর হইতে সন্দেশ, রসগোল্লা ও নানা রকম মিঠাই আনা হইত। তারই সঙ্গে সকাল বেলা কাঁচারসের ক্ষীর, পাকান পিঠা, দুপুরে ভাতের সঙ্গে ঘি মিশাইয়া পোলাও আর মুরগীর গোস্ত। রাত্রেও মাছ ভাত গোস্ত।

জুলফিকারের মা অথবা জলার মা আমাদের সম্পর্কে দাদী। তাঁর স্বামী আদালতে চাকরী করিতেন। যাহা উপার্জন করিতেন পোলাও গোস্ত ও ভাল ভাল খাবার খাইয়া শেষ করিতেন। সে জন্য আমাদের এই দাদী ভাল রান্না-বান্না করিতে পারিতেন। চরভদ্রাসনের কুটুম্ব আসিলেই জলার মার ডাক পড়িত। তিনি আসিয়া মেহমানদের জন্য পোলাও গোস্ত রান্না করিয়া দিতেন। খুব সুক্ষ্ম করিয়া সুপারী কাটিয়া দিতেন। সে সুপারি এতই সুক্ষ্ম যে সামান্য বাতাস হইলে পানদান হইতে উড়িয়া যাইত। আমার মাও পরে এইরূপ শুপারি কাটা শিখিয়াছিলেন। সেই সুপারী জলার মা এক বোটায় পাঁচটি পান বানাইয়া দিতেন। ঝালরের মত করিয়া একটি ডালের সঙ্গে অনেকগুলা পান আটকাইয়া দিতেন। অতিথিরা খাইয়া ধন্য ধন্য করিতেন। কেহ কেহ দেশে যাইয়া দেখাইবার জন্য সেই সুপারির খানিকটা গামছায় বাঁধিয়া লইতেন জলার মার সুপারি কাটার সুখ্যাতি এদেশ হইতে আরেক দেশে যাইয়া শত শত লোকের তারিফ কুড়াইয়া আনিত। স্বামী মরিয়া যাইবার পর তাঁর অবস্থা ভাল ছিল না। কিন্তু তাঁহার এইসব গুণপনার জন্য গ্রামের সকলেই তাঁহাকে খুব সম্মান করিত। কারও বাড়িতেনতুন কুটুম্ব আসিলেই জলার মার ডাক পড়িত।

এইভাবে চরভদ্রাসনের কুটুম্বেরা দুই তিন দিন থাকিয়া চলিয়া যাইত। তারপর আমার পিতা ভাবিতে বসিতেন এই কয়দিন কত টাকা খরচ হইয়াছে। ওখানে চিনির দাম বাঁকি পড়িয়া আছে। সে দোকানে মিষ্টির দাম পড়িয়া আছে। মা তখন বাজানের সঙ্গে বকরবকর করিতেন। আমি কিন্তু মনে মনে কেবলই বলিতাম, এরূপ কুটুম্ব যেন রোজই আসে। রোজ তাহা হইলে ভালমত খওয়া যাইবে।

অতিথিজনকে আদর অপ্যায়ন করিতে আমার পিতা একেবারে বেহুঁস হইয়া পড়িতেন। একবার একটা জমি বিক্রি করিয়া তিনি শ'দেড়েক টাকা পাইলেন। তখন বর্ষাকাল। ঘরের ধান ফুরাইয়া গিয়াছে। কিনিয়া খাইতে হইবে। স্থির হইল এই টাকা দিয়া আগামি কয়েক মাসের জন্য চাউল কিনিয়া রাখা হইবে। এমন সময় হোগলা কান্দি হইতে নৌকায় করিয়া আমাদের বাড়িতে সাট অটজন কুটুম্ব আসিলেন। তিন চারিদিন ত তাঁহাদিগকে নানা উপাচারে খওয়ান হইল, যাইবার সময় বাজান তাহাদের প্রত্যেককে এক জোড়া করিয়া কাপড় আর ডবল নৌকাভাড়া দিয়া বিদায় করিলেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে আমার পিতা মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। হায়! হায়! কি করিয়াছি! এই কয়দিনে জমি বেচার সবগুলি টাকা ত খরচ হইয়াছেই, উপরন্ত এখানে সেখানে আরও কিছু কিছু ধার পড়িয়া আছে। তারপর কি করিয়া তিনি সংসার চালাইযাছিলেন সেই বয়সে তাহা জানিতে পারি নাই।

চরভদ্রাসনের লোকেরা আমার পিতাকে কেমন ভালবাসিতেন, একটি দৃষ্টান্ত দিলে বোঝা যাইবে। তখন আমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। গ্রাম্য-গান সংগ্রহ করিতে আমি একবার এই গ্রামে গিয়াছি। মোমিন মোল্লা নামক এক বৃদ্ধ ব্যক্তি আমাকে তাঁর বাড়িতে একদিন নিমন্ত্রণ করিলেন। বৈঠকখানায় খাইতে বসিয়া দেখি, ঘরের ভিতর হইতে হেলিয়া প্রকাণ্ড একটি আমগাছ শাখা বাহু মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আহারের পরে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ তো বড় তাজ্জবের ব্যাপার! ঘরের মধ্যে আমের গাছ লাগাইয়া বাহিরে হেলাইয়া দিয়াছেন।" হাতের হুকাটি নামাইয়া রাখিয়া 'মমিন মোল্লা বলিতে লাগিলেন, "আজ তিরিশ বছর আগের কথা। তোমার বাবা আমার

বাড়িতে জ্যৈষ্ঠ মাসে বেড়াইতে আসিয়াছেন। যেখানটিতে তুমি বসিয়া আজ খাইলে, ওখানটিতে বসিয়া তিনি আম দুধ খাইয়া আঁটিটি এইখানে ফেলিয়াছিলেম। কয়েকদিন পরে তোমার বাবা যখন চলিয়া গেলেন, ওই আঁটিটি ওখান হইতে আর ফেলিয়া দিলাম না। কিছু মাটি আনিয়া আঁটিটির উপর রাখিয়া দিলান। দিনে দিনে সেই আঁটি হইতে অঙ্কুর হইয়া আজ এত বড় গাছটিতে পরিণত হইয়াছে। এই গাছের একটি আম যদি তোমাকে আজ খাওয়াইতে পারিতাম কত খুশীই না হইতাম! কিন্তু তুমি অদিনে আসিয়াছ। এখন গাছে আম পাকে নাই। যদি বাঁচিয়া থাকি, আমের দিনে আসিয়া এই গাছের একটি আম খাইয়া যাইও। তোমার বাপের প্রতি আমাদের যে কত-খানি মহব্বত গড়িয়া উঠিয়াছিল, আমি মুর্খ মানুষ, তোমার মত সুন্দর করিয়া তাহা বলিতে পারিব না, কিন্তু এই গাছটি আর সমস্ত ডাল মেলিয়া দিন রাত আমার সকল কথা বলিতেছে। বাবা জসীম! আমাদের কাল শেষ হইয়া আসিয়াছে। এই ভালবাসা যেন তোমাদের কালে যাইয়াও বর্তে।" বৃদ্ধের মুখে এই কাহিনী শুনিতে শুনিতে আমার চোখ দুইটি অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। এমন করিয়া মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে কোথাও দেখি নাই। আমার সামান্য কবিখ্যাতি হওয়ায় লোকের কাছে কিছু প্রশংসাও পাইয়াছি কিন্তু আজ ভাবিয়া আশ্চর্য হইতে হয়, আমার পিতা তাঁর কোন্ সেবা দিয়া, কোন্ ভাল-বাসা দিয়া এই মুর্খ গ্রামবাসীটির অন্তরে কোন্ তারে আঘাম করিতে পারিয়াছিলেন, যে তাহাই আজ শত শাখা-বাহু মেলিয়া ধরিয়া এই মূক আমগাছটি প্রকাশ করিতেছে। পদ্মার ভাঙনে চর ভদ্রাসন ভাঙিয়া গিয়াছে। মোমিম মোল্লাও সেই করে মরিয়া গিয়াছেন। এই গাছটিরও আজ আর কোন চিহ্ন নাই। এমনি করিয়া কোন কিছুরই চিহ্ন থাকিবে না। মানুষ তবুও বালুর উপরে ঘর বাঁধে।

আমার অন্ধ দাদা

আমার পিতার এক চাচা ছিলেন। নাম দানু মোল্লা। লোকে তাঁহাকে ধানু মোল্লা বলিয়া ডাকিত। অতি ছোট বয়সে চোখের কি অসুখ হয়। কোন এক বিদেশী গ্রাম্য কবিরাজ লঙ্কাবাটার সঙ্গে এক ঔষধ তাঁর চোখে লাগাইয়া দিয়া যায়। সেই ঔষধ চোখে লাগাতেই তিনি সাত আটটা দিন শুধু চিৎকার করিতে থাকেন। তারপর চোখের মণি দুইটি গলিয়া পড়িয়া যায়! অল্প বয়সে চোখ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তিনি কোন লেখাপড়া শিখিতে পারেন নাই। কিন্তু এই স্নেহ-প্রবণ বৃদ্ধলোকটি ছিলেন গ্রাম-বাংলার কৃষ্টির জীবন্ত প্রতীক। কেচ্ছা, সমস্যা, শ্লোক এসব ত তিনি জানিতেনই, তাহা ছাড়া যত রকমের গ্রাম্যগান ও সুর তাঁর পেট ভরা ছিল। আমি আর আমার চাচাত ভাই নেহা দুইজনে প্রতিযোগিতা করিয়া এই দাদার স্নেহ কুড়াইতাম। আজ আমার চোখে ভাসিতেছে জ্যোৎনা-ফিনিক ফোটা রাত। আমাদের উঠানে মাদুর বিছাইয়া দাদাকে সামনে লইয়া বসিয়া আছি। এবাড়ি ওবাড়ি হইতে কয়েকজন চাষী আসিয়া সেই মাদুরের কোনায় বসিয়া গিয়াছে। দক্ষিণের ঘরের বারান্দায় আমার চাচীরা, এবাড়ি ওবাড়ির দু'একটি বউ, এধারে উত্তরঘরের দরজার কাছে পানের খিচা পাশে রাখিয়া পা ছড়াইয়া আমার মা বসিয়া আছেন।

আমরা দাদাকে বলিতেছি, "দাদা কেচ্ছা কও।" দাদা বলেন "কেচ্ছা কি আমার মনে আছেরে, সেই কতকালের কথা?" আমরা ছাড়িনা, "না দাদা! কেচ্ছা বলিতেই হইবে। দাদা! তোমার পায়ে পড়ি একটা ভাল কেচ্ছা কও।" দাদারও ইচ্ছা কেচ্ছা বলিবার কিন্তু আমাদের দিয়া নানা অনুরোধ উপরোধ করাইয়া তিনি আমাদের কেচ্ছা শোনার আগ্রহ বাড়াইতেছেন। দাদা বলেন, "নারে আজ গলা ভাল নাই। তা ছাড়া কেচ্ছা বলিতে আমার সঙ্গে গান ধরিবে কে?"

আমি আর নেহা বলি "আমরা ধরিব গান আপনার সঙ্গে।" ওবাড়ির বুধাই মোল্লা বলেন "ছ্যামড়ারা যহন দরছে, কন না একক। কিচ্ছা মোল্লার বেটা?"

দাদা তবু নারাজ। আমরা দু'ভাই দাদার পা জড়াইয়া ধরি, "দাদা! আজ কেচ্ছা না বলিলে ছাড়িবই না।" ও কোণা হইতে চাচীরা পানদানে করিয়া চুন ছাড়া পান সাজিয়া দাদাকে পাঠাইয়া দিয়া বলে, "কন না চাচাজান! একটা কেচ্ছা কন। কতদিন কেচ্ছা শুনি না।"

দাদা তখন পানদান হইতে পানটি মুখে দিয়া আরম্ভ করিতেন।

কেচ্ছা কিচকিচানি কেমনে কেচ্ছা ছাড়ি,
এক ছিলুম তামুক দিলে কেচ্ছা কইতে পারি।

বড়দের মধ্যে হইতে কেহ উত্তর করিত, "মোল্লার বেটা! আপনি ত তামাক খান না। এবার পান মুখে দিয়াই কেচ্ছা আরম্ভ করের।"

তখন দাদা বলিতেন, "কোন্ কেচ্ছা শুনিবে?" কেউ বলিত, রুপ্বান কন্যা—কেউ বলিত মধুমালা -কেউ বলিত আবদুল বাদশা আমি আর নেহা বলিআম, দাদা! সবগুলি কেচ্ছাই শুনিব।" দাদা আমাদের বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতেন "ওরে ভাই! সব কেচ্ছা একদিনে শুনিতে পারিবি না। আজ রাত্রে একটা কেচ্ছাই শোন্।' আমরা বলিতাম 'তবে দাদা মধুমালার কেচ্ছাই বলেন।" দাদা কেচ্ছা আরম্ভ করিতেন।

কাঞ্চন নগরে ঘর,
নামে রাজা দণ্ডধর,

রাজার হাতি শালায় হাতি, ঘোড়াশালায় ঘোড়া, সভা ভরিয়া পাত্র মিত্র, মন্ত্রী কোটাল লোকজন সর্ব্বদা গমগম করে। রাজার মালখানা ভরিয়া লাল ইয়াকুত জবরুত চুণিমণি ঝকমক করে। এত থাকিতেও রাজার সুখ নাই। রাজার কোন বেটা পুত্র নাই। এই ভাবে দাদা কেচ্ছার ইন্দ্রজাল ছড়াইয়া যাইতে লাগিলেন। হরিণ শিকারে যাইয়া মধুমালাকে স্বপ্নে দেখিয়া মদন কুমার যখন মায়ের আঁচল ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া গাহিতে লাগি,

ও আমি যাব মা ধন
মধুমালার দেশে হে।

তখন আমাদের বালক কণ্ঠের সঙ্গে দাদা আর গ্রামবাসীদের কণ্ঠ মিলিয়া কি যে এক সুরের উন্মাদনা সৃষ্টি করিতে লাগিল তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। পদের শেষে মধুমালার কথাটিতে আসিয়া গানের সুর কি যে মধু ছাড়ইয়া দিত তাহা যদি গাহিয়া শুনাইতে পারিতাম! মদন কুমার যোল ডিঙ্গা মধুকোষ সাজাইয়া মধুমালার দেশে রওয়ানা হইতেছেন। তাহাকে বিদায় দিতে মদন কুমারের দুঃখিনী মায়ের জবানীতে দাদা যখন গান

ও আমার যায়রে মদন মধুমালার দেশে হে।

ধরিলেন তখন আমার চাচীরা মায়েরা কাঁদিয়া বুক ভাসাইতেন। আমাদের এই পোড়া দেশে এমন কয়জন মা আছে, যার কোলের একটি ছেলেও মৃত্যুর কোলে না ঢলিয়া পড়িযাছে। আজ নদম কুমারের বিদায়ের দৃশ্য স্মরণ করিয়া হযত, তাহাদের আদরের ছেলেটিকে যে ভাযে কাফনে সাজাইয়া একদিন চিরবিদায় দিতে হইযাছিল তাহাই নতুন করিয়া তাঁহাদের মনে পড়িতেছিল। বস্তুতঃ এইসব রূপকথার অন্তরালে যে মানবতাবোধ আর বাঙালী জীবনে যে নিত্য-নৈমিত্তিক সুখ-দুঃখের ছায লুকাইয়া রহিযাছে তাহাই এই কহিনী গুলিকে এতদিম গ্রাম বাংলায় জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছে। দিনে দিনে এই কাহিনীগুলিকে তাহারা নিজেদের জীবনে অভিনয় করিয়া ইহাদের মধ্যে নব নব রূপাযন আনিযা দিযাছে।

মদন কুমার যখন নানা পাহাব পর্ব্বত ডিঙ্গাইযা, সাতসমুদ্র তের নদী পাড়ি দিয়া, কত দুঃখ-বিগদ উত্তীর্ণ হইয়া কাঞ্চন নগরে যাইয়া মধু মালাকে সঙ্গে লইযা মাযের কোলে ফিরিযা আসিত, আমিও গানের আসর হইতে ঘরে যাইযা মাযের কোলটি ঘেসিযা ঘুমাইযা পড়িতাম। মনে হইত আমিই যেন সেই মদন কুমার। তারই মত কত দেশ বিদেশ পাড়াইয়া স্বপ্নের মধুমালাকে সঙ্গে লইয়া মায়ের কোলে ফিরিয়া আসিয়াছি। কত রাত্রে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া মধুমালাকে সপ্নে দেখিয়াছি।

এমনি করিয়া দাদার কাছে কত রকমের কেচ্ছাই না শুনিতাম। কেচ্ছা বলিবার সময় তিনি আঙুলে তুড়ি দিয়া, দুই হাত ঘুরাইয়া ফিরাইয়া. কণ্ঠস্বর কখনও বিলম্বিত লয়ে টানিয়া, কখনও দ্রুত লয়ে খাটো করিয়া. কখনও ধমকের সুরে কথমও আবেগ মিশ্রিত সুরে, কখনও জোরে জোরে দাপটের সঙ্গে, কখনও ফিসফিস করিয়া মনে

মনে কথা বলার মত করিয়া, কাহিনীর বিসয় বস্তুটিকে তিনি শ্রোতাদের মধ্যে জীবন্ত করিয়া তুলিতেন।

এই ভাবে দাদার মুখে যে কত শুনিয়াছি তাহার আর ইয়ত্তা নাই। সেই সব কেচ্ছা বলাইতে আমাকে আর নেহাকে অনেক কাঠ-খড়ি পোড়াইতে হইত। কত কষ্ট করিয়া খেজুর টোকাইয়া আনিয়া অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া দাদাকে তাহার ভাগ দিতাম। ডুমকুর, জাম, পেয়ারা, বেথুল পাড়িয়া আনিয়া দাদাকে সাধিয়া সাধিয়া খাওয়াইতাম। আর গল্প আরম্ভ করিবার আগে যে কত অনুনয় বিনয় করিতে হইত তাহার কিছুটা পরিচয় পাঠক আগেই পাইয়াছেন। দাদার নিকট আমরা আবদুল বাদশার গল্প, জিতুধরের গল্প, রূপবান কন্যার গল্প আরও কত কি শুনিয়াছি, আজ ভালমত মনেও নাই। যে বয়সে গল্প শুনিয়া মনে রাখিতে পারিতাম, দাদা তখন চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছেন। মনের অগোচরে কখনও কখনও কোন কোন গানের কলি আমার কণ্ঠে ভাসিয়া ভর করে।

"মা তো আমার বকরি রাখে
বাপ্ তো অন্ধ ঘরেরে,
লাউকি রইল পথের দিকে চায়ারে।"

এই লাউকি কে? কেন পথের দিকে চাহিয়া থাকে? গান গাহিতে গাহিতে কেবলি এই প্রশ্ন আমার মনে উদয় হয়। কিন্তু কে ইহার উত্তর দিবে?

আরও একটি গানের কলি মনে পড়ে।

"পূর্ণিমার চান্দ উঠেছেরে
ও বিবি তারা লয়া সাথেরে,
হারে নারে ও নারে নারেরে।"

তারা সঙ্গে লইয়া কোন দেশে এমন চাঁদ উঠিয়াছে। একথা কোন বিবিকে কে বলিতেছে, কেন বলিতেছে?

আরও একটি গানের কলি:

"আমার ভুজা রসের ভুজারে
ও কন্যা লক্ষ টাকা দামরে,
ও হারে নারে ও নারে নারেরে।"

কে সেই ভুজাওয়ালা? কোন কন্যার দুয়ারে দাঁড়াইয়া সে ভুজা বেচিতে আসিয়াছে। এই প্রশ্নের উত্তর কে দিবে?

সেই কহকুণ্ড পাখির কেচ্ছার গান:

"আজ কেন কহরে কুণ্ড কোথায় রইলা?
মাতো গেল আগুন আনতে
ফিরা নহরে—আইল।"

আরও একটা কিচ্ছার গান মনে পড়ে।

"তোমার হাতে দেখি নাল গামছা—
তোমার কান্ধে নাল ও ছাতিরে,
ছাদেরে সিধাড়ী
কোন শহরে ভাল হে তোমার বাড়ি ঘরহে।"

গান গাহিতে গাহিতে দুই চোখ ভরিয়া পানি আসে। ভাসা ভাসা মনে পড়িতেছে, স্বামীকে খাইয়া তার রক্তে সমস্ত অঙ্গ লাল করিয়া গিধারী আসিয়া রাজকন্যার ছাতের উপর বসিয়াছে। রাজকন্যার প্রশ্নের উত্তরে গিধারী কি উত্তর দিল? এই সব কথা বিস্মৃতির অন্ধকারে মিলাইয়া গিয়াছে। হয়ত আজও কোন গ্রামবৃদ্ধ এই সব গল্প বলিয়া আমাদেরই মত তার নাতি নাতনীদের মুগ্ধ করিতেছে। যদি সামর্থ থাকিত, পল্লী বাংলার ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইবার শক্তি পাইতাম, তবে এই অমৃত ভোগ কুড়াইয়া আনিয়া আমার দেশবাসীকে উপহার দিতাম; কিন্তু বাত ব্যাধিতে প্রায় পঙ্গু হইতে বসিয়াছি। আর কি ফিরাইয়া পাইব স্বাস্থ্য? আর কি ফিরাইয়া পাইব সামর্থ? জীবনে কত আজে বাজে কাজ করিয়া সময় নষ্ট করিয়াছি। তখন সামর্থ থাকিতে কেন এ কাজ করি নাই?

দাদা অন্ধ ছিলেন। কিন্তু আমি আর নেহা দু'ভাই তার দুইটি চক্ষু দিলাম। দাদা যখন যেখানে যাইতেন, লাঠি ধরিয়া তাঁর আগে আগে যাইতাম। মাঠের পথ দিয়া চলিতে চলিতে চাষীভাইরা খেতের কাজ ফেলিয়া ডাক দিত, 'মোল্লাজী! একটু জিড়াইয়া যান।" লাঠি ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইত তাদের খেতের আলিতে। অন্ততঃ আধ ঘণ্টা শ্লোক সমস্যা বলাইয়া, নানা রকমের গান গাওয়াইয়া তবে

তাহারা দাদাকে ছাড়িয়া দিত। দাদা ছিলেন গ্রাম দেশের আনন্দের প্রতীক। যেখানে যাইয়া বসিতেন সেখানেই আনন্দের বন্যা বহাইয়া দিতেন। তাই গ্রাম পথ দিয়া যাইতে বাড়ির বউঝিরা ছেলেদের দিয়া দাদাকে ডাকাইয়া লইয়া যাইত। বাড়িতে ভাল কিছু খাবার থাকিলে দাদাকে খাইতে দিত। বলা বাহুল্য আমরাও তার ভাগ পাইতাম। খাইতে দিয়া বউঝিরা তাহাদের সুখ দুঃখের কথা বলিতে স্বামী মারিয়া পিঠে দাগ করিয়া দিয়াছে। দাদা বউটির পিঠে হাত বুলাইয়া দিতেন। কারো বাপ আসিয়াছিল মেয়েকে লইয়া যাইতে, দেয় নাই। এদেশে একটা আম কাঁঠালের মুখ দেখিবার জো নাই, মেয়েটির বাপের বাড়িতে আম কাঁঠাল গড়াগড়ি যায়। দাদা সকল কথা খুব মনোযোগ দিয়া শুনিতেন। কখন কখন সমবেদনায় তাঁর চোখ দুটি অশ্রুসিক্ত হইত। তারপর কি কৌশলে গল্প করিয়া গান গাহিয়া সেই বিষাদপূর্ণ মুখগুলিতে হাসি ফুটাইয়া দিয়া তবে বিদায় লইয়া ফিরিতেন।

দাদা বিবাহ করিয়াছিলেন আমাদের বাড়ি হইতে আড়াই মাইল দূরে গোয়ালচামটের মুন্সীর মাকে। অন্ধ মানুষের সঙ্গে কে আর কুমারী মেয়ের বিবাহ দিবে? এই বিধবা মহিলাটি দাদার ঘর করিতে আসিলেন। আগেই তা বলিয়াছি, আমার পর-দাদার মৃত্যুর পর পদ্মার জমিজমা ভাঙ্গিয়া লওয়ায় আমাদের অবস্থা খুব খারাপ হইয়া পড়ে। দাদার ভাগে যা জমিজমা পড়ে তা বরগা দিয়া সামন্য মাত্র কয়েক মাসের খোরাকী হইত তা দাদা নিজেই খাইবেন, না বউকে খাওয়াবেন। আমার পিতা বা তাঁর অন্যান্য ভাজতেরা যে সাহায্য করিবেন তাঁদেরও অবস্থা ভাল ছিল না। একবেলা খাইয়া, আটপেটা খাইয়া, দু'একমাস পরে দাদী চলিয়া যাইতেন। তখন দাদা আমার চাচাদের সঙ্গে থাইতেন। কয়েক মাস যাইতে না যাইতে গ্রামের একে ওকে সঙ্গে লইয়া দাদী আবার ফিরিয়া আসিতেন। দাদীর বাড়ির ধারে ছিল অনেক বহেরার গাছ। আসিবার সময় দাদী এর যতগুলি সম্ভব বোঁচকায় করিয়া বাধিয়া আনিতেন। তারপর সেগুলি পাটায় ছেঁচিয়া শাস বাহির করিয়া আমাকে খাইতে দিতেন। দাদার

মত দাদীও আমাকে বড়ই ভালবাসিতেন। পরে দাদীর ছেলে মুন্সী খাঁ বড় হইয়া উঠিল। ব্যবসা বানিজ্য করিয়া তার অবস্থা ভাল হইল। আমাদের বাড়িতে আসিলে মায়ের অযত্ন হয় - পেট ভরিয়া খাইতেও পায় না। তাই সেবার আসিয়া সেই যে সে দাদীকে লইয়া গেল আর তাঁকে আমাদের বাড়ি আসিতে দিল না। ইহার কয়েক বৎসর পরে তিনি মারা গিয়াছেন। আমার ভাসা ভাসা মনে পড়িতেছে স্নেহাতুরা সেই মহিলাটিকে। গায়ের বর্ণ শ্যামা। মুখে চোখে বার্দ্ধক্যের দাগ তিনি কত আদর করিয়া আমার হাত পা ধোয়াইয়া আমাকে ঘরে লইয়া যাইতেন!

দাদার অবস্থা আগে কিন্তু অত খারপ ছিল না। দাদার আগেকার বাড়িতে তিনি নানা রকম ফলের বাগান করিয়াছিলেন। বাগান করিতে করিতে আল্লার কাছে মোনাজাত করিতেন, আল্লা। আমার বাগানে ফলফুল পাখিপাখালিতে খাইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই আমি খাইব। দাদার বাগানখানি নাকি হইয়াছিলও খুব সুন্দর। আম, জাম' লিচু, পেয়ারা, আরও কত রকমের ফলই না তাহাতে ধরিয়াছিল! দাদা গাছের ডালে ডালে হাঁড়ি বাঁধিয়া দিতেন। পাখিরা অনায়াসে সেখানে বাসা বাঁধিয়া ডিম পাড়িত—বাচ্চা উঠাইত। গাছের ফলফলারী খাইতে পাখিদিগকে বাঁধা দিতেন না। পরে নদীতে বাড়ি ভাঙিয়া এই বাগান-টিকেও শেষ করিয়াছে। দাদা ত চোখে দেখিতেন না। এই বাগানে বসিয়া নানা রকম পাখির ডাক শুনিতেন। তিনি নিজেও পাখির ডাকে সুন্দর নকল করিতে পারিতেন।

একবার দাদার কলেরা হইল। আমার পিতা ডাক্তার আনিয়া দাদার ভালমত চিকিৎসা করাইলেন। দাদার অসুস্থ হওয়ার মধ্যে এই কলেরা রোগে নেহার বিমাতা ও একটি ভাইও বোন মারা গেল। এই খবর দাদাকে জানান হইল না। নেহার বিমাতা দাদাকে বড়ই যত্ন করিতেন তাঁর ছেলে রোকন আর মেয়ে কুটিকে দাদা কোলেপিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন। আমাদেরই মতন তিনি তাহাদিগকে ভালবাসিতেন দাদা অসুখ হইতে ভাল হইয়া উঠিয়া আমাদের সঙ্গে খাইতে লাগিলেন। খাইতে বসিয়া ওবাড়ির বড় বউর কথা জিজ্ঞাসা করেন, ছোট ছেলে

মেযে দুটির কথা জিজ্ঞাসা করেন। মা আড়ালে চোখের পানি মুছিয়া বলিতেন, "বড় বউ বাপের বাড়ি গিয়াছে ছেলেমেয়ে দুইটিও সঙ্গে গিয়াছে।" গ্রামের লোকদেরও বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল দাদাকে যেন বড় বউর মৃত্যুর কথা জানান না হয়। হঠাৎ একদিন বড় বউর বাপের বাড়ির গ্রাম হইতে একটি লোক আসিযা দাদার সঙ্গে আলাপ করিতে থাকে। দাদা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, "আচ্ছা, বড় বউ আমাকে এত আদর যত্ন করিত। আমার এত বড় অসুখ জানিযাও সে কোন্ প্রাণে বাপের বাড়ি যাইযা বসিযা আছে। ছেলেমেযে দুইটিকেও লইযা গিযাছে। তাদের না দেখিযা ত আমি বাঁচি না!"

লোকটি বলিযা ফেলিল, "তারা কি আছে? কলেরা হইযা তাহারা সবাই মরিযা গিযাছে।" চিৎকার করিযা দাদা মাটিতে পড়িযা কাঁদিতে লাগিলেন। তারপর ছয সাতদিন প্রায অনাহারে। সকালে দুপুরে কেমন করিয়া দাদা যেন লাঠিখান। ভর দিযা যাইযা তাহাদের কবরের পাশে বসিয়া থাকিতেন। আমি আর নেহা তাঁকে টানিয়া আনিতে কত চেষ্টা করিতাম—দাদা আসিতেন না।

এই শোক তাপে আর কলেরার আক্রমনে দাদার মতিভ্রম হইযা পড়িল। আগের সেই গল্প কেচ্ছা সমস্ত ভুলিয়া গেলেন। গলার সেই সুন্দর কণ্ঠস্বরও হারাইযা ফেলিলেন। এই হৃতসর্বস্ব বৃদ্ধকে তখন কে আদর করে! পথ দিযা চলিতে গ্রামের বৌঝিরা আর তেমন আগ্রহ করিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া লয় না। মাঠ দিযা যাইতে চাষীরা আর তাঁর লাঠি ধরিয়া টানে না। আমাদের উঠানে আর সেই রূপকথার রাজা তাঁর কাহিনীর ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া গ্রামবাসীদের মুগ্ধ করিতে পারেন না। আজ জরায় জীর্ণ অসহায় এই বৃদ্ধটিকে কেহই আসিয়া জিজ্ঞাসা করে না, মোল্লার বেটা কেমন আছেন?

আমাদেরও তখন বয়স হইয়াছে। পাঠশালায় স্কুলে যাইয়া নানা রকমের আকর্ষণের সন্ধান পাইয়াছি। খেলার মাঠ আমাকে ডাকে, নদীর পানি আমাকে ডাকে তার অতলে সাঁতার কাটিতে। দাদাকে সঙ্গ দিবার সময়ও ধীরে ধীরে সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল

দাদা একা একা বসিয়া থাকিতেন। মাঝে মাঝে পুরাতন গানের দুই এক কলি গাহিয়া মনে করিতে চেষ্টা করিতেন। খাইবার সময় হইলে মা তাঁকে খাবার দিয়া আসিতেন। মায়ের সংসারে বহু কাজ। আমরা তখন চার ভাইবোন জন্মিয়াছি। আমাদের দেখাশুনা করিয়া সাংসারিক নানা রকমের কাজকর্ম করিয়া দাদাকে সেবা যত্ন করিবার অথবা ভাল মত তাঁর সঙ্গে বসিয়া দু'চারটি কথা বলিবার মার অবসরও ছিল না! মায়ের রান্না দাদার ভাল লাগিত না। মা তরকারীতে ঝালকম দেন। প্রতিবেশীরা কেহ দাদার কাছে আসিলে দাদা বড় বউর সঙ্গে মায়ের রান্নার তুলনা করিতেন। তাছাড়া তাঁর স্মৃতিশক্তি ধীরে ধীলে লোপ পাইতেছিল। তখন তাঁহার বয়স প্রায় ৮০ বৎসরের কাছে। এইমাত্র মা খাওয়াইয়া দিয়া গেলেন। পর মুহূর্তে কেহ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "না ত, আজ বউ আমাকে ভাত দেয় নাই।" মা খুব চটিয়া যাইতেন। ইহাতে মায়ের আত্ম-অহঙ্কারে বাধিত।

আজ এই কাহিনী লিখিতে লিখিতে নিজের অনাগত কালের কথাই ভাবিতেছি। যখন আর লিখিতে পারিব না, আর লোকের মনোরঞ্জন করিতে পারিব না, তখন সেই অকৃতজ্ঞ দিনগুলির কথা ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিতেছি।

এইভাবে এবাড়ি ওবাড়ি খাইয়া দাদার পেটের অসুখ হইল। ঘরের এক পাশে একটি গর্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সেখানেই তিনি পায়খানা প্রস্রাব করিতেন। দুপুর বেলা তাহা মাটির চাড়ায় করিয়া মাথায় করিয়া সামনের মাঠে ফেলিয়া দিয়া আসিতেন। পাড়ার ছেলেরা ছড়া কাটিয়া তাড়া করিত। আমি বাড়ি থাকিলে এরূপ হইতে দিতাম না।

একদিন তিনি বিকাল বেলা গাঙের ঘাটে একলা নাইতে নামিয়াছেন। হঠাৎ পরণ কাপড়ে পা জড়াইয়া পানিতে পড়িয়া যান। আর উঠিতে পারেন নাই। পানিতে পড়িয়া কত যেন লোকজনকে ডাকিয়াছিলেন।

অবেলায় কেহ গাঙের ঘাটে ছিল না। সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তখনও তিনি বাড়ি ফিরিলেন না। চারদিকে খোঁজ পড়িল, এবাড়ি সেবাড়ি কোথাও তিনি যান নাই। আমার চাচারা জাল লইয়া গাঙের

ঘাটে ফেলিলেন। দাদার মৃতদেহ জালে আটকাইয়া আসিল। আমার পিতা, চাচারা, মা সকলেই দাদার জন্য উহু আহা করিলেন কিন্তু কেহই ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন না। যে ব্যক্তি সারাজীবন ভরিয়া কেচ্ছা কাহিনীর মাধ্যমে পরের কল্পিত কথা লইয়া সুখে দুঃখে আজিবন হাসিয়াছেন কাঁদিয়াছেন আজ তাঁহার জন্য কেহই এক ফোটা চোখের পানি ফেলিল না। আমি একান্তভাবে আমার দাদার কথা যখন ভাবি তখন আত্মধিক্কারে সমস্ত মন দলিত মথিত হইতে চায়। যাঁর কথা কাহিনীর ভিতর দিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছিলাম, তাঁকে কেন একদিনের জন্যও সেবা করিলাম না! কেন তাঁর ময়লা কাঁথা কাপড় একদিনের জন্যও ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া দিলাম না! হয়ত তখন বুঝিবার বয়স হয় নাই। হয়ত বা সেই শিশু জীবনে যতটুকু মনে আসিয়াছিল তাহাই তাঁর জন্য করিয়াছিলাম কিন্তু মনে আজ কিছুতেই প্রবোধ মানিতেছে না। আমার পিতা লোকজন ডাকিয়া সান সওকাত মত তাঁর দাফন কাফন করিয়াছিলেন। তাঁহার কবরে প্রথম মাটি দেওয়ার সময় তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার মুরুব্বীদের মধ্যে এই একজন একটু আগেও জীবিত ছিলেন। আজ তার শেষকৃত্য করিয়া যাই। মিয়া সাহেবরা! আমার চাচা জ্ঞানে অজ্ঞানে তোমাদের কারো কাছে যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকেন তোমরা মাফ করিয়া দাও।" গ্রামের লোকেরা বলিল, "তিনি কারো কাছে কোন অপরাধ করিয়া যান নাই—কোনদিন কারো কোন ক্ষতি করেন নাই।"

আমার কবি জীবনের প্রথম উন্মেষ হইয়াছিল এই দাদার গল্প, গান ও কাহিনীর ভিতর দিয়া। সেই ছোট বেলায়ই মাঝে মাঝে আমাকে গানে পাইত। নিজে মনোক্তি করিয়া ইনাইয়া বিনাইয়া গান গাহিয়া যাইতাম। দাদা একদিন একজনকে বলিতেছিলেন, "পাগলা গানের মধ্যে কি যে বলে কেউ শোনে না। আমি কিন্তু শুনি মনোযোগ দিয়া ওর গান।" কি অন্তদৃষ্টির বলেই না আমার রচক-জীবনের প্রথম আকুলি-বিকুলি তিনি ধরিতে পারিয়াছিলেন।

আমার মা

আমাদের সংসারে আমার মায়ের দুঃখের সীমা পরিসীমা ছিল না। আমার মা ছিলেন নানার আদরের মেয়ে। আর দুইটি মেয়ে আগেই মারা গিযাছে। এই একমাত্র মেয়েটিকে নানা নানী বড়ই আদর করিযা পালিতেন। নানার বাড়ী ছিল তাম্বুলখানা গ্রামে। আম'দের বাড়ি হইতে ছয় সাত মাইল দূরে। সেই গ্রামের চারিদিকে বিজ বা জঙ্গল। সেই জঙ্গলের এখানে সেখানে দু'চার ঘর মানুষ। শুনিয়াছিলাম অনেকআগে সেখানে জঙ্গল ছিল না। বড় বড় আটচালা ঘর তৈরী করিয়া বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থের বাস করিত। লোকজনে সমস্ত গ্রাম কলরব করিত; তারপর কলেরা মহামারীতে, ম্যালেরিযা জরে প্রায সমস্ত গ্রাম উজাড় হইয়া যায়। যেখানে ফলবান বৃক্ষ ছিল সে সব জাযগায় বেত, শ্যামালতা, কুমারলতা প্রভৃতি জন্মাইয়া স্থানটি মানুষের অগম্য করিয়া তোলে। তারপর শেয়াল, খাটাশ, বাঘ প্রভৃতি জানোয়ারেরা ধীরে ধীরে সেখানে আসিয়া বসতি আরম্ভ করে। বনের মাঝে মাঝে এখানে সেখানে যে সব গৃহস্থেরা, তখনও বসতি উঠাইয়া লইয়া সুদূর লোকালয়ে চলিয়া যায় নাই তাহা- দিগকে সর্বদা এই সব হিংস্র জানোরের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইত।

এতদূরের এই বুনোগাঁয়ের মেয়ে কি করিয়া আমাদের বাড়ি আসিল সেই ইতিহাস অনেক চেষ্টা করিয়াও জানিতে পারি নাই। মাকে কতবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি, "মা! বল ত সেই বুনো দেশের মেয়ে, তুমি কি করিয়া আমাদের বাড়ি আসিলে? কে সে বিয়ের ঘটক ছিল? বিয়ের দিন কে কে সঙ্গে গিয়াছিল, কে কলমা পড়াইয়াছিল?" মা কোন উত্তর করিতেন না। কখনো কখনো কৃত্রিম রাগ করিয়া বলিতেন, "তুই তলের কথা টান দিয়া বাহির করিতে চাস।" যখন মনে মনে আমি রসুলউল্লার কথা ভাবিতে চাহি তখন আমার নানার চেহারা মনে পড়ে। মনে হয় নানার মত তেমনি তিনি স্নেহপ্রবণ—তেমনি তিনি পরহেজগার ছিলেন। নানা যখনই আমাদের বাড়ি আসিতেন, হয়ত নারকেলের লাড়ু, খইএর

মওয়া অথবা কদমা বাতাসা লইয়া আসিতেন। তারপর দু'একদিন থাকিয়া চলিয়া যাইতেন। যাইবার সময় মা কাঁদিয়া ফেলিতেন। কোঁচার খোঁটে চোখ মুছিতে মুছিতে তিনি মাঠের পথ ধরিতেন।

মার সংসারে শ্বাশুড়ী নাই, ভাজ নাই। রান্না হইতে আরম্ভ করিয়া ঘর সংসারের সমস্ত কাজ মাকে একলা করিতে হইত। খাইয়া লইয়া আমরা যখন ঘুমাইয়া পড়িতাম তখন মা দুই তিন ধামা ধান ভানিতে ঢেঁকীঘরে ঢুকিতেন সেই ধান ভানিবার সময় তাহা আলাইবার জন্য লোক নাই। ঢেঁকীতে পার দিতে দিতে মা কাড়াইল দিয়া মাঝে মাঝে লোটের আধভাঙা ধান নাড়িয়া চাড়িয়া দিতেন।

আমার পিতার প্রতি সব চাইতে অভিযোগ ছিল, তিনি ঢেঁকী ঘরের তদ্বির তালাস করিতেন না। ঢেঁকীর কাতলা দুইটা প্রায়ই নড়বড় করিত। চুরুনে ঘুণ ধরা। নোটের তলার কাঠের গইড়ার খানিকটা ইদুরে কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। সেখান দিয়া যে ধানগুলি ঢুকিয়া পড়ে তাহা ঢেঁকীর পাড়ে ভাঙে না। মা বাজানকে বকিতেন আর ধান ভানিতেন। বাজান কিন্তু সেদিকে গ্রাহ্যও করিতেন না। তিনি আমাদের লইয়া দিব্যি আরামে ঘুমাইয়া পড়িতেন। অনেক ঝগড়া ফ্যাসাদের পরে গ্রামে কারো বাড়িতে সুতোর মিস্ত্রী আসিলে বাজান তাকে ডাকিয়া আনিয়া ঢেঁকীর সকল সাজ সরঞ্জাম মেরামত করাইয়া দিতেন। কিন্তু সে কয় দিনের জন্য? দুই চার মাস যাইতে ঢেঁকী যন্ত্র আগে যেমনটি ছিল তেমনই হইয়া পড়িত। মা'র বকুনি আবার আরম্ভ হইত। আমাদিগকে পিঠা খাওয়াতে মা যে কত কষ্টই না করিতেন। পিঠার চাল আলাইবার কেহ না থাকিলে তাহা গুঁড়া করা যায় না। মা ঢেঁকীতে দু'চার পাড় দিতেন আবার নামিয়া আসিয়া নোটের চাল নাড়িয়া চাড়িয়া দিয়া যাইতেন। এইরূপে প্রায় অর্ধেক রাত মা পিঠার চাল কুটিতেন। একটু বড় হইয়া আমি মাঝে মাঝে পিঠার গুঁড়া আলাইয়া দিতাম। তা কি মা আমাকে করিতে দিতে চাহিতেন? যদি আমার কচি হাতে চুরুনের গুতা লাগে? অতি সাবধানে মা ঢেঁকীতে পাড় দিতেন। শীতকালের শেষ রাত্রে উঠিয়া মা পিঠা বানাইতে বসিতেন। সেমুই পিঠা যদি বানাইতে হইত আগের রাতেই মা আটা তৈরী করিয়া রাখিতেন।

মায়ের শব্দ পাইয়া আমি আসিয়া মায়ের পাশে বসিতাম। মার পরণে থাকিত দুইখানা ডুমা। একখানা পরিতেন অপরখানা গায়ে জড়াইতেন। উদল গায়ে আমি শিতে ঠির ঠির করিয়া কাঁপিতে থাকিতাম। মা আর একখানি ডুমা আনিয়া আমার গায়ে জড়াইয়া দিতেন। মা আটা-গুলিকে দুইহাতে ছানিয়া ছোট ছোট গুলি বানাইতেন। সেই গুলি গুলিকে পিঁড়ির উপর ডলিয়া মা ছোট ছোট দড়ির মত করিতেন। আমি অপটু হাতে মাকে এরূপ দু'একটি দড়ি পাকাইয়া দিতাম। তারপর সেই দড়িগুলিকে একটি একটি করিয়া পিঁড়ির এক কোণে রাখিয়া হাতের তেলো দিয়া ঘসা দিতেন। মায়ের হাতের কি কৌশলে একটি একটি করিয়া টুকরো সিমাই পিঁড়ির নীচে মাদুরের উপর পড়িত। চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে আমার আশা মিটিত না। মায়ের হাতের ঘষায় ঘষায় টুন টুন করিযা হাতের চুরিগুলি বাজিত। আমি মনে মনে ভাবিতাম আমার মা কত কি না জানে! রুটি পিঠা বানাইবার সময় মায়ের দুইখানা হাত আরও সুন্দর করিয়া ঘুরিত।

সব চাইতে আশ্চর্য হইতাম যেদিন মা ভাপা পিঠা বানাইতেন। এই পিঠা এক বছর আগে খাইয়াছি। কি করিয়া মা তৈরী করিয়া-ছিলেন ভালমত মনে নাই। শুধু পিঠার স্বাদ মনে আছে। এই পিঠা বানানোর আনুপূর্বিক সব কিছু জানিবার জন্য তাই শেষ রাত্রে মায়ের সঙ্গে রান্না ঘরে উঠিয়া আসিতাম। মা চুলায় জ্বাল ধরাইয়া প্রথমে হাঁড়িতে পানি ভরিয়া জ্বাল দিতেন। হাঁড়ির মুখে ভাঙ্গা সরার কান্দাটি আগের দিনেই কাদা দিয়া পরিপাটি করিয়া আটকাইয়া রাখা হইয়াছিল। জ্বাল দিতে দিতে যখন হাঁড়ির পানি টগবগ করিয়া ফুটিতে থাকিত, তখন মা চালের গুঁড়ার সঙ্গে কিছু গরম পানি মিশাইয়া চালুনের মধ্যে পরি-পাটি করিয়া চালিতেন। এ যেন মায়ের সুন্দর হাতের মমতা পাইয়া গুঁড়িগুলি ঈসৎ বড় হইয়া চালুনের ফাঁক দিয়া গলিয়া পড়িত। ইহার আগেই নতুন খেজুরে গুড়ের পাটালী কাটিয়া কাটিয়া টুকরো করিয়া রাখা হইয়াছিল। ছোট ছোট সরার মধ্যে মা এক পরত সেই গুঁড়িগুলি ভরিতেন, তার উপরে নিপুন হাতে পাটালীর কয়েকটি টুকরো সাজাইয়া উপরে নারকেল কোরা ছড়াইয়া আবার চাউলের গুঁড়ি ভরিতেন।

তার উপরে আরও একবার পাটালীর টুকরো ও নারকেল কোরা ভরিয়া আরও গুঁড়ি লইয়া উপরে সাজাইয়া দিয়া হাতের নখের সাহায্যে একটু একটু করিয়া টিপিয়া দিতেন। সেই সরাটিকে ভেজা ন্যাকরা দিয়া জড়াইয়া উনুনের উপরে হাঁড়ির ভিতর হইতে কান্দা ভাঙা দিয়া যেখানে গরম পানির ভাপ আসিতেছিল সেইখানে সরাটি উপুর করিয়া বসাইয়া কি কৌশলে সরার পিঠে একটি টোকা দিয়া সরাটি তুলিয়া আনিতেন। তারপর ন্যাকড়ার বাকি অংশটা দিয়া পিঠাটি ভালমত জড়াইয়া আর একটা বড় সরা দিয়া ঢাকিয়া দিতেন। এইসব কাজ মা যে পরিপাটি করিয়া করিতেন! মা যে তার স্নেহের সন্তানদের জন্য একটি মহাকাব্য রচনা করিতেছিলেন। মা যেন কোন নিপুন ভাস্কর! কত যত্ন লইয়া কত মমতা লইয়া কত আয়াস আরাম ত্যাগ করিয়া মা তার সৃষ্টিকার্য্যে মশগুল রহিতেন। মনে মনে আমি কেবল মায়ের তারিফ করিতাম। মা আমার কত কি জানে। মায়ের হাতের যাদুর স্পর্শ পাইয়াই চাউলের গুঁড়িগুলি এমন মিষ্টি পিঠা হইয়া নব-জন্ম লাভ করিবে। প্রত্যেক শিল্পিই ত তাই করে। যা কিছু আছে তাই লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া আপন মনের মাধুরীর নব-জন্ম দেয়।

আমি হা করিয়া চাহিয়া থাকিতাম। কখন পিঠা হইবে। কখন খাইতে পাইব! মা কিন্তু আমার আগ্রহের দিকে খেয়ালও করে না। পরমনিধি সাঁই দরদীর সৃষ্টিকার্য্যে তাড়াহুড়া নাই। যখন প্রথম পিঠাটি হইল সেটি খাইতে মানা। কেন মানা কেউ জানে না। সেজন্য কেউ প্রশ্নও করে না। প্রথম পিঠাটি খাইতে মানা এই ত যথেষ্ট। হয়ত কোন দূর অতীতকালে, হাজার হাজার বৎসর আগেই হয়ত কারো ছেলেটি প্রথম পিঠাটি খাইতে হাত পোড়াইয়া ফেলিয়াছিল; সেই হইতে নিষেধ হইল প্রথম পিঠাটি বানাইয়া কেহ খাইবে না। তাহাকে দ্বিতীয় পিঠাটির জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। শিল্পি তার সৃষ্টিকার্য্যের মধ্যে যেটি সব চাইতে ভাল সেটিকেই ত রসীক সমাজের সমালোচনার জন্য দিবেন। দ্বিতীয় পিঠাটি খোলায় দিয়া মা মিয়া ভাইকে ডাকিতেন। কি মিষ্ট করিয়াই ডাকিতেন, "মফি আয়রে পিঠা হইয়াছে।" দ্বিতীয় পিঠাটি নামাইয়া ভাঙিয়া মা আমাদিগকে খাইতে দিতেন। পিঠা বানাইতে বানাইতে বারবার আমাদের মুখের দিকে চাহিতেন। মায়ের মুখচোখে কি অপূর্ব তৃপ্তি!

আমাদের গরীবের সংসার। ঘি ময়দা ছানা দিয়া জৌলুস পিঠা তৈরী করিবার উপকরণ মায়ের ছিল না। চাউলের গুঁড়া আর গুড় এই মাত্র মায়ের সম্পদ। তাই দিয়া তিনি আমাদের জন্য অমৃত পরিবেশনের চিন্তা করিতেন।

ছোট বেলায় মাকে খুশী করিবার জন্য মাঝে মাঝে চেষ্টা করিতাম। শীতের দিনে সকাল হইলে আমি আর নেহা নদীর ওপারে চলিয়া যাইতাম। সেখানে সরষে খেতের পর সরষে খেত চলিয়া গিয়াছে। ফোটা ফোটা হলদে সরষে ফুলের গাছগুলি একের সঙ্গে অপরে মেশামেশি হইয়া দূরের গ্রামে মেশা আল্লার আছমান তক যাইয়া ঠেকিয়াছে। গন্ধে বাতাস তেলেসমাত। আমরা সেই খেতের মধ্যে যাইয়া কেবল ঘুরিয়া বেড়াইতাম। সরষে গাছের গোড়া জড়াইয়া আছে দুধালী লতায়। সাদা সাদা সুন্দর ফুল। সেই লতা কুড়াইয়া মাথায় জড়াইতাম। তারই তলায় আস্তে আস্তে পাতা মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে মটরশুঁটি আর খেসারী গাছ। এখনও সীম হয় নাই। মটরশুঁটির সাদা গোলাপী-মেশা পরের উপরে সুন্দর লালের ফোঁটা। গ্রাম্য মেয়ের নোলকের মত। আর খেসারী ফুলগুলি নীল। আমরা ফুল ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া কানে গুঁজিতাম। তারপর চষাখেত হইতে শামুক কুড়াইয়া কুড়াইয়া তাহা ছিদ্র করিয়া মালা গাঁথিতাম। সেই মালা একটি গলায় পরিতাম আর একটি মাজায় জড়াইতাম। তারপর দুইভাই চষাখেতের মধ্য দিয়া দিতাম দৌড়। কে আগে যাইতে পারে। আমাদের গলায় শামুকের মালার শব্দে সমস্ত চর ঝম ঝম করিয়া বাজিয়া উঠিত। এই ভাবে ভর দুপুর খেলিয়া বাড়ি ফিরিতাম। এত বেলায় বাড়ি ফিরিলে মা যদি বকে সেই জন্য রাশি রাশি মটরের শাক, সরষে-শাক কুড়াইয়া লইয়া আসিতাম। চরে যখন মটরশুঁটির খেতে আর খেসারী কলায়ের খেতে সীম ফলিত, তখন আর আমাদের পায় কে! সকালে কিছু সামান্য খাইয়া চরে যাইতাম। আর সারাদিন সেখানে কাটাইতাম। মটরের সীম খেসারীর সীম খাইয়া ক্ষুধার নিবৃত্তি করিতাম। মাঝে মাঝে ছোট ছোট হাঁড়ি লইয়া গিয়া সীমগুলি নাড়ার আগুনে সিদ্ধ করিয়া চাষীদিগকে নিমন্ত্রণে ডাকিতাম। তাহারা খাইয়া আমাদিগকে কতই তারিফ করিত।

খেতে মই দেওয়ার সময় সেই মইএর উপর চড়া আমার একটি বড় সখ ছিল। সারাদিন কোন চাষীর খেতের ঢেলা ভাঙ্গিয়া দিতাম যদি সে দয়া করিয়া মই দেওয়ার সময় আমাকে একটু উঠিতে দেয়। নিজে মইয়েয় এক পাশে উঠিতে সাহস পাইতাম না। চাষীর মাজা ধরিয়া পিছনে দাঁড়াইতাম। চড় চড় করিয়া আলি ঘুরিয়া যখন মই চলিত আমার সকল অঙ্গে কেমন যেন এক শিহরণ জাগিত। বাঁশের চঙের মইএ চড়ার চাইতে কাঠের ডলনের মইএ চড়ায় আরও আনন্দ ছিল। এই মই চড়ায় আমার এমনই নেশা ছিল যে একবার একজন চাষীকে বলিয়াছিলাম, তুমি যদি আমাকে মইতে চড়াও তবে আমার বাপের কাম করিবে। এই কথা লইয়া বহুদিন পাড়ার ছেলেরা আমাকে খেপাইত।

শহরে যাইয়া যে সব দালান কোঠা দেখিয়াছি তারই অনুকরণে মাঝে মাঝে আমরা মাঠের ঢেলা কুড়াইয়া নকল দালান গড়িতাম। তার অনেকগুলি কুঠরী থাকিত। সেই দালানের মধ্যে মাঠের শুকনো নাড়া পুরিয়া আগুন জ্বালাইয়া দিতাম। আগুনের তাপে দালানের রঙ ইটের মত হইত। সেই দালানে কত বাজপুত্র রাজকন্যাকে আনিয়া বসাইতাম। এইভাবে খেলিয়া দিন শেষ হইত। সারাদিন চরে কাটাইয়াছি। মা যে বকিবেন একথা তখন মনে হইত। চর হইতে যত শুকনো ঘুটো কুড়াইয়া লাল আলোয়ানে বাঁধিয়া চাষীদের ডিঙি নৌকায় সোয়ার হইয়া বাড়ি ফিরিতাম। মা খুব বকিতেন কিন্তু আলোয়ান খুলিয়া যখন শুকনো ঘুটোগুলি দেখাইতাম মায়ের মুখে একটু মৃদু খুশী দেখা যাইত। বস্তুতঃ সংসারে আমার মায়ের অসুবিধার আর অন্ত ছিল না। বাজান কোন দিন মায়ের রান্নার জন্য জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করিয়া দিতেন না। অপর বাড়ির মেয়েদের মত আমার মা বাহির হইয়া এখান সেখান হইতে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করিতেও যাইতেন না। আমাদের বাড়ির বধুদের আঙিনার চারধারের চারখানা ঘরের ওপারে যাওয়ার রেয়াজ ছিল না। বাড়ির পাশেই ত নদী। সেই নদীতে মা একদিনও স্নান করিতে যাইতে পারিতেন না। আমাদের বউরা যখন ঘরে আসিল তখন মা তাহাদের সঙ্গে করিয়া লোকজনের বিরলতা বুঝিয়া মাঝে মাঝে নদীতে যাইয়া দুই এক ডুব দিয়া আসিতেন।

আমাদের মাত্র দুইটি গাভী ছিল। সেই গাভী দুইটির গোবর মা শুকাইয়া রাখিতেন। বাড়ির চারিধারে ছিল অগুন্তি বীজেকলার ঝাড়। তাহারই পাতা শুকাইলে তাকে বলিত ফাতরা, সেই ফাতরা কুড়াইয়া মা রান্নাবান্না করিতেন। গোবরের ঘসিগুলি বর্ষাকালের জন্য বাঁচাইয়া রাখিতেন। সেই জন্য আমার আনা সেই সামান্য উপহার মায়ের কাছে কম ছিল না। আমাদের আশে পাশের চাষীদের প্রত্যেকের বাড়িতে অনেক গরু থাকিত। সেই সব গরুর গোবর শুকাইয়া চাষী-বউরা রান্না-বান্না করিত। তাছাড়া পাটের মৌসুমে তাদের স্বামীরা ভারা ভারা পাট-খড়ি আনিয়া বাড়ির চারিদিকে দেয়াল করিয়া ফেলিত। সারাক্ষণ তাহারা সেই পাট-খড়ি জ্বালাইয়া মজা করিয়া রান্নাবান্না করিয়া আমাদের বাড়িতে গল্প করিতে আসিত। মা তখন চুলার মধ্যে ঘসি পুরিয়া জ্বালাইবার জন্য ব্যর্থ ফুঁ পাড়িতেছেন। সেই ঘসিও কি মা বেশী করিয়া সংগ্রহ করিতে পারিতেন? আমাদের ঢেঁকী ঘরের চাল দিয়া প্রায়ই বৃষ্টির পানি পড়িত। সেই ঘরের অর্ধেকখানিতে অল্প পরিসর স্থানে ছিল মায়ের আখা জালানর অমূল্য সম্পদ। তাও কিছু কিছু বৃষ্টিতে ভিজিয়া যাইত। বৃষ্টির দিনে রান্না ঘরে আমিয়া মা কাঁদিয়া অস্থির হইতেন। মা চীৎকার করিয়া বলিতেন, আমার এই রাক্ষসগুলো যদি খাইতে না চাহিত তবে কোন্ বাপের বেটি আর রান্না ঘরে ঢুকিত। এই রাক্ষস ছেলেদের জন্য মা যে কত আত্মত্যাগ করিয়াছেন দুনিয়ার ইতিহাসে কোন মা-ই তাহা করে নাই। সেই রাক্ষস ছেলেরা মায়ের সেই আত্মত্যাগ তখন কেহই বুঝিতে পারিত না।

আমাদের অভাবের সংসারে ভাল কিছু রান্না করিয়া খাওয়াইবার ক্ষমতা মার ছিল না। প্রতিদিন বাজারে যাইয়া মাছ তরিতরকারি কিনিবার অর্থ আমার পিতার ছিল না। আমাদের গ্রামের কাহারও ছিল না। কিন্তু বাড়ীর ধারে এই পদ্মার খাল থাকায় গ্রামের লোকেরা অবসর সময়ে নদী হইতে মাছ ধরিয়া আনিত। আমার পিতার মাছ ধরিবার সখ কোন দিনও ছিল না। আর অবসরও ছিল না। শুধুমাত্র রবিবার আর বুধবারের হাটের দিনে বাজান হাট হইতে মাছ কিনিয়া আনিতেন। কোন কোন হাটে তিনি যাইতেও পারিতেন না। আমাদের প্রতিবেশীরা

যদি কখনো কখনো বেশী মাছ মারিত, তার কিছুটা আমাদের দিয়া যাইত সপ্তাহে পাঁচ ছয়দিন মা শুধু ডাল ভাতই করিতেন। যেদিন শাক রান্না করিতেন সেদিন আর ডাল হইত না। আমাদের অবস্থা যে খারাপ বুঝিবার ক্ষমতা আমার তখনও হয় নাই। প্রতিদিন ডাল খাইতে খাইতে পেটে আগুন জ্বলিত। দুপুর বেলা পর্যন্ত এখানে সেখানে খেলিয়া ক্ষুধায় যখন থাকিতে পারিতাম না, তখন বাড়ি আসিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিতাম, মা আজ কি রাঁধিয়াছ? মা বলিত, ডাল রাঁধিয়াছি। তখন রাগে আমি পাগল হইয়া যাইতাম। ভাতের হাঁড়ি ডালের হাঁড়ি ভাঙিয়া একাকার করিয়া দিতাম। আর গ্রাম্য চাষীছেলেদের কাছে শেখা ইতর গালি-গালাজে মাকে বকিয়া অস্থির করিতাম। মা মারিতে আসিলে ছুটিয়া পালাইতাম।

শীতের মৌসুমে কুম্ভকারেরা হাঁড়িপাতিল লইয়া আমাদের গ্রামে বেচিতে আসিত। চাষী-বধূরা চিটাধানেব সঙ্গে কিছু আসল ধান মিশাইয়া সেই হাঁড়িপাতিলের বিনিময় করিত। তাহারা ভাবিত ধানের সঙ্গে চিটা মিশাইয়া কুম্ভকারকে ঠকাইতেছি। কুম্ভকার কিন্তু ঠকিত না। সে ধানের ভাল মন্দ দেখিয়া তাহার হাঁড়িপাতিলের দাম কমাইত বাড়াইত। মা এই কুম্ভকারদের নিকট হইতে সারা বৎসরের ব্যবহারের যোগ্য হাঁড়ি পাতিল কিনিয়া রাখিতেন! তখনকার দিনে এই সব হাঁড়িপাতিলেই রান্নাবান্নার কাজ হইত। মা সেই হাঁড়িপাতিলগুলি আমাদের ঘরের মাচার উপর সুন্দর করিয়া সাজাইয়া রাখিতেন। কতবার আমি ডাল রান্নার জন্য মায়ের উপর রাগ করিয়া এই হাড়িপাতিল সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুর্ণ বিচুর্ণ করিয়া দিয়াছি। মা ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছেন। প্রতিবেশীরা ছুটিয়া আসিয়া মাকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা খুজিয়া পান নাই। তখন নদীর তীরে বসিয়া বসিয়া কাঁদিয়াছি। কেন মাকে গালাগালি দিলাম। কেন মায়ের হাড়িপাতিল ভাঙ্গিলাম! মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিতাম মাকে আর কষ্ট দিব না। মায়ের কোন জিনিস আর নষ্ট করিব না। কিন্তু মায়ের কাছে আসিয়া লজ্জায় এসব কথা বলিতে পারিতাম না। মা কি ছেলের অন্তত বুঝিতেন।

তারপর সারাদিন ওবাড়ি সেবাড়ি ঘুরিয়া গাছের কাঁচা পেয়ারা আর যেদিনের যে ফল চিবাইয়া সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরিয়াছি। মায়ের রাগ

তখন পড়িয়াছে। হাতমুখ ধোয়াইয়া আঁচল দিয়া মুছিয়া মা খাইতে দিয়াছেন। এসব অপরাধের জন্য বাজান আমাদের বকাঝকা করিলেও মারধর করিতেন না। আমাকে ভাল খাইতে দিতে পারেন না এই চিন্তায় তিনি হয়ত মনে মনে ক্ষতবিক্ষত হইতেন। হাট হইতে যেদিন বাজান ইলিশ মাছ কিনিয়া আনিতেন, সেদিন আমাদের বাড়িতে আনন্দের উৎসব পড়িয়া যাইত। এবাড়ির ওবাড়ির মেয়েরা মাছটি নাড়িয়া চাড়িয়া তাহার দাম জিজ্ঞাসা করিয়া যাইত। আমার তখন খুব গর্ব বোধ হইত। আমরা মাকে ঘিরিয়া বসিয়া মাছ কোটা হইতে রান্না শেষ পর্যন্ত দেখিতাম। রান্না যখন হয় হয় তখন সরার ঢাকনি হইতে যে সুবাস বাহির হইত, তাহাতে জিহ্বায় পানি আসিত। আমি আমার পিতা আর ভাইরা সকলে মিলিয়া খাইতে বসিতাম। মা সামনে ভাতের থালা দিয়া তরকারী বাড়িতে বসিতেন। সেই সময়টুকুকে যুগান্তর বলিয়া মনে হইত।

মাছের দাম আট আনার মত মাঙ্গা হইত তখন আমরা মাত্র আধ টুকরা করিয়া মাছ খাইতাম। আমাদের খাওয়া শেষ হইলে মা খাইতে বসিতেন। নিজের জন্য মা এক টুকরা মাছও রাখিতেন না। কাটা ভরা মাছের লেজটা, যা ছেলেদের খাইতে নিষেধ, তাই লইয়া মা খাইতেন। যেদিন তরকারির ঝোল থাকিত না, মা কাঁচা মরিচ ও লবন দিয়া ভাত খাইতেন। মা যে কি খায় তাহা আমরা অথবা বাজান কেহই লক্ষ্য করিতাম না।

মাঝে মাঝে ইলিশ মাছের হালি যখন দুই আনা তিন আনায় নামিত, তখন বাজান একসঙ্গে সাত আটটি মাছ কিনিয়া আনিতেন। সেগুলি মা ভাজিয়া দিতেন। আমরা সেদিন শাত আটখানা তাজা মাছ ভাতের সঙ্গে খাইতাম।

কোন কোনদিন বাজানের সঙ্গে হাট হইতে ইলিশ মাছ কিনিয়া বাড়ি ফিরিতাম। পথে ফিরিতে যার সঙ্গে দেখা হইত, সে-ই মাছের দাম জিজ্ঞাসা করিত। দাম শুনিয়া কেহ কেহ বলিত, মাছটি বেশ জিতিয়া কিনিয়াছেন। আমার খুব ভাল লাগিত। এখনও দেশে যাইয়া মাঝে মাঝে বাজার হইতে ইলিশ মাছ হাতে ঝুলাইয়া বাড়ি ফিরি। যে দেখে দাম জিজ্ঞাসা করে। উত্তর দিতে আমার তেমনই ভাল লাগে

কোন কোন পরিচিত লোক মাছের দাম জিজ্ঞাসা করিবার আগে দামটা বলিয়া ফেলি। সমস্ত পথ আনন্দমুখর হইয়া ওঠে। সামান্য একটা ইলিশ মাছ বাঙালীর জীবনে যে কত আনন্দ আনিয়া দিতে পারে ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়!

আমাদিগকে ভাল খাওয়াইতে মা কতই না যত্ন লইতেন। মাঝে মাঝে ডালের বড়া ভাজিতেন। তেল না থাকিলে কলাপাতার উপর ডালবাঁটা বসাইয়া কাঠখোলায় ভাজিয়া লইতেন। সেদিন এত ভাত খাইতাম যে পেটে ধরিত না। ডিমের তরকারি বা মুরগির গোস্ত যেদিন রান্না হইত সেদিন আমাদের আনন্দের অবধি থাকিত না।

বাড়িতে মা খই-মুড়ি বেশী তৈরী করিতে পারিতেন না। যখন তৈরী করিতেন, সারাদিন খই-মুড়ি চিবাইয়া মুখে ঘা করিয়া ফেলিতাম। আজও মুড়ি খাওয়ার লোভ আমার যায় নাই। গরম মুড়ি পাইলে আমি রাজভোগও ছাড়িতে পারি। সেইদিন আমাদের গ্রামের এক বাড়ির কাছ দিয়া যাইতেছি। দেখিলাম তাহারা গরম মুড়ি ভাজিতেছে। আমি যাইয়া আঁচল পাতিয়া বসিলাম। সম্পর্কে আমার দাদী। হামিজদ্দির মা আমাকে মুড়ি দিতে দিতে বলিল, "সেই আগেকার ছোঁচা জসীম তেমনি আছে।" বাড়ির বউরা ঘোমটার আড়ালে হাসিতে লাগিল।

আমাদের গ্রামে আলিমদ্দি মোল্লার বাড়িতে আর বাহাদুর খাঁর বাড়িতে খেজুরের রস জ্বাল দিয়া গুড় তৈরী হইত। সকাল হইলে তাহাদের বাড়ি যাইয়া কলাপাতা লইয়া বসিয়া থাকিতাম! চার-পাঁচটা চোকা একসঙ্গে জুড়িয়া দিয়া গুড়ের বাইন বানান হইত। তাহাদের প্রত্যেক চোকার উপর এক একটি করিয়া জালা। জালা একটি ডিমের অর্ধেকের মত প্রসর মুখ-বিশিষ্ট এক প্রকারের লম্বা হাঁড়ি। তাহার তলার দিকটা মুখ হইতে ক্রমেই সরু হইয়া গিয়াছে। সেই জালায় খেজুরের রস ভরিয়া বাইনের ভিতরে নাড়া বা খড়ের আগুনে জ্বাল দেওয়া হয়। বাহাদুর খাঁর স্ত্রী ছিলেন আমার গ্রাম সম্পর্কের বোন। তাঁর ছেলে রহিম ছিল আমার সমবয়সী। রস জ্বাল দেওয়ার মৌসুমে প্রায় সারা দুপুরই তাঁহাদের বাড়িতে কাটাইতাম। রহিমের মা বু আমাকে বড়ই ভালবাসিতেন। আমি রস জ্বাল দিতে সাহায্য করিতাম। তার বিনিময়ে জালা হইতে গুড় ঢালিবার

পর ঝিনুক দিয়া যে চাছি উঠাইতেন তাহার একটু আমার কলার পাতে ঢালিয়া দিতেন। তাহাই চাটিতে চাটিতে বাড়ি ফিরিতাম। মাঝে মাঝে বু গুড় দিয়া নৈটানা বানাইয়া দিতেন। গুড়কে বেশী জ্বাল দিয়া আঠার মত করা হইত। তাহা খাইতে দাঁতে আটকাইয়া যায়। চুষিয়া চুষিয়া অনেক্ষণ খাইতে পারা যায়। যেদিন বু এই নৈটানা বানাইতেন সে দিন আমি তাঁর অনেক কাজ করিয়া দিতাম। আমাদের বাড়িতে গুড় তৈরী হইত না। সব সময় বাজান গুড় কিনিয়া আনিতে পারিতেন না। খুব অল্প দামের ঝরা রসের (দিনের ভাগে খেজুর গাছে যে ঘোলা রস পড়ে) গুড় দুই এক হাঁড়ি বাজান কিনিয়া আনিতেন। সেই গুড় আসিলে আমার হাতখানা প্রায়ই সময়ই গুড়ের হাঁড়ির মধ্যে থাকিত! আমরা কয়েক ভাই মিলিয়া সাতআট দিনের মধ্যেই এক হাঁড়ি গুড় শেষ করিয়া ফেলিতাম। ছোট বেলায় ভাল জামা কাপড় পরিতে পারি নাই। শীতের বস্ত্রও সব সময় ছিল না। এজন্য বিশেষ যে কোন দুঃখ অনুভব করিতাম তা আজ মনে পড়িতেছে না। আর কোন কিছু লইয়া মা-বাপের প্রতি অভিযোগ করি নাই কিন্তু আমার সেই বাল্য বয়সের বাড়তির সময় যে মিষ্টি এবং পুষ্টিকর খাদ্যের জন্য আমার সমস্ত দেহকে তাড়না করিয়া ফিরিত, সেই ক্ষুধার পরিপুরণের জন্য বনে জঙ্গলে এ-ফল সে-ফল টুকাইয়া বেড়াইতাম। কারো বাড়িতে পিঠা বানাইলে যাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতাম। পিঠা বানাইয়া বাড়ির গৃহিনী তার ছেলেমেয়েদের দিত। আর আর সকলকে দিত। আমি মনে মনে ভাবিতাম এর পরে আর এক খোলা পিঠা হইলেই বুঝি আমাকে সাধিবে। সেই খোলা শেষ হইয়া আরও এক খোলা শেষ হইত। গৃহিণী আমার দিকে ফিরিয়াও চাহিত না। তারপর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিতাম। সেই বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েরা বলিত, ও আমাদের পিঠায় চোখ লাগাইয়া গেল। নিজের খাবার হইতে এক টুকরা পিঠা আমার গায়ে ছুঁড়িয়া মারিয়া ছড়া কাটিয়া বলিত—

"তুই খাস্ না তোর পাঁচ পরাণে খায়।"

বাড়ি আসিয়া মাকে বলিতাম, "মা! ওদের বাড়িতে কেমন পিঠা করিয়া খাইতেছে, আমাকে একখানাও দিল না। মা তুই আমাকে পিঠা

বানাইয়া দে।" আঁচলে চোখ মুছিয়া মা বলিতেন, "আজই তোকে পিঠা বানাইয়া দিব। আর ওদের বাড়ি যাইস না।"

কতদিন মনে মনে বলিতাম, আমার বাজান যদি মাষ্টার না হইয়া কৃষাণ হইতেন; আলিমদ্দি, বাহাদুর খাঁর মত খেজুরের গাছ কাটিয়া রস বাহির করিয়া আনিতেন, কত মজা করিয়া খাইতে পারিতাম! আমাদের মাচায় আর ঘরে গুড়ের হাঁড়ি বসান থাকিত! আমাদের ধানের বেড়িতে কত রকমের ফসল আসিত। মা পিঠা বানাইয়া কুল পাইতেন না। আর এই যে ডলনে বা মইতে চরিবার জন্য এর ওর হাতে পায়ে ধরি, আমার বাজান কৃষাণ হইলে তাঁরই পিছনে পিছনে যাইয়া মজা করিয়া মইতে চড়িতাম—ডলনে চড়িতাম। এই মন্দ-ভাগ্যের জন্য মাঝে মাঝে আমি কাঁদিয়া ফেলিতাম।

আমার সম বয়সি চাষীছেলেরা দুপুর হইতে তাদের বাপ চাচাদের জন্য হালের খেতে নাস্তা লইয়া যায়। সেখানে কলার পাতায় করিয়া কি মজা করিয়া ছোটরাও সেই নাস্তার অংশ খায়! মাঠে বসিয়া খাইতে কি মজা! আমায় বাজান যদি মাঠে লাঙল বাহিতেন, রোজ আমি আমার বন্ধুদের মতই নাস্তা লইয়া যাইতাম।

কেদারীর মা

আমার মায়ের সুখদুঃখের অন্তরঙ্গ দরদী ছিল কেদারীর মা। রহিমের মা বু, আর ছেলে কেদারিকে রাখিয়া কেদারীর বাপ মরিয়া যায়। অল্প বয়সে বিধবা হইয়া কেদারীর মা বাহাদুর খাঁকে ঘর-জামাই করিয়া মেয়েকে তার সঙ্গে বিবাহ দেয়। কয়েকমাস খাইতে দিয়া বাহাদুর খাঁ শ্বাশুড়ীকে আলাদা করিয়া দিল। প্রতিবেশীরা পরামর্শ দিল নিকা বসিতে। কিন্তু বাল্য বিধবা কেদারীর মা নিকা বসিল না। কেদারীকে বুকে লইয়া এবাড়ি ওবাড়ি কাজ করিরা কোন রকমে পেটের আহার জোগাইত। এই কেদারী মা শুধু আমার মায়েরই অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল না, সমস্ত গ্রামের বধূদের সে ছিল সবচাইতে আপনার জন। কারো কোন অসুখ-বিসুখ বিপদ-আপদ হইলে কেদারীর মা সেচ্ছায় যাইয়া সেখানে উপস্থিত হইত। তাহাকে ডাকিতেও হইত না। কারো প্রসব বেদনা উঠিলে কেদারীর মা শুধু বাচ্চার নাড়ি কাটিয়াই কর্তব্য শেষ করিতেন না, যে কয়দিন পোয়াতী আঁতুর ঘরে থাকিত সে কয়দিন রাত্র জাগিয়া তাকে দেখা শোনা করিত। দিনে রান্নাবান্না করিয়া খাওয়াইত। প্রতিদানে সে কিছুই পাইত না। বউরা গোপনে গোপনে তাকে দুই চার সের ধান বা চাউল দিত। কোন কোন নতুন ছেলের মা খুশী হইয়া তাকে এক আধখানা কাপড়ও কিনিয়া দিত। এই কেদারীর মা ছিল গাঁয়ের গেজেট। সমস্ত গ্রামখানা দিনমানে সে একবার টহল দিয়া আসিত। তারপর কার বাড়ি কি হইতেছে, কে বউকে ধরিয়া ঠেঙ্গাইয়াছে, কার বউকে কে নোলক কিনিয়া দিয়াছে, কোন বাড়িতে নতুন ফকির আসিয়া তেলেস্‌মাতী দেখাইতেছে, কোথায় বউ শ্বাশুড়ীতে যুদ্ধ লাগিয়াছে ইহার আনুপূর্বিক সকল খবর বাড়িতে বাড়িতে কহিয়া, ওর চুলাটা নিবিয়া গিয়াছিল, তাহাতে দু'একখানা লাকড়ি ঠেলিয়া দিয়া, ওর ছেলেটি নোংরা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, তাহাকে ধুইয়া মুছিয়া একটু কোলে করিয়া, ওবাড়ির বউ একা একা চুল বাঁধিতে পারিতে-

ছিল না, তার মাথায় একটি সুন্দর বিনুনি তৈরী করিয়া পরিপাটি করিয়া চুল বাঁধিয়া দিয়া, ওবাড়ি হইতে কলার মোচাটা আনিয়া সেবাড়ির বউকে দিয়া, সেবাড়ি হইতে একসের চাউল লইয়া, ওবাড়ি হইতে দুখানা ডাটা তুলিয়া, সেবাড়ির নতুন বউকে কানে কানে কি কহিয়া মুখে একটি ঠোকনা মারিয়া হাসিয়া গড়াইয়া সমস্ত গ্রামখানিকে সে আনন্দ-মুখর করিয়া তুলিত। এইরূপে বাড়ি বাড়ি চলিয়া কত বাড়িতে যে সে পান খাইত, কত বাড়িতে যে এটা ওটা চাহিয়া দেখিত, তাহার আর লেখা জোখা থাকিত না।

এই কেদারীর মা আমার মায়ের কত কাজ যে করিয়া দিয়াছে তাহার ইয়ত্বা নাই। আমার পরে আমার যত ভাই বোন হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেকের আঁতুরের সময় কেদারীর মা শুধু দাইয়ের কাজই করে নাই, যে সাতদিন মা আঁতুর ঘরে থাকিতেন সে সাত দিন আমাদের রান্নাবান্না ও ঘর সংসারের সমস্ত কাজ করিয়া আমাদিগকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া মায়ের আঁতুর ঘরে সমস্ত রাত জাগিয়া নবজাতকের দেখাশোনা করিয়াছে।

কেদারীর মা শুধু আমার মায়েরই বন্ধু ছিল না। আমাদেরও সে বড়ই ভালবাসিত।

কার্ত্তিক পূজার রাত্রে হিন্দু পাড়া হইতে মেয়েলী কণ্ঠের গান ভাসিয়া আসিত। বিলম্বিত লয়ের কি অপূর্ব সুর! সেই সুর আমার বালক মনটিকে পাগল করিয়া তুলিত। এখন হিন্দু পাড়ায় শুধু পূজা হয়। রাত জাগিয়া মেয়েদের গান গাওয়ার প্রচলন উঠিয়া গিয়াছে। ভোর না হইতেই কেদারীর মার সঙ্গে হিন্দু পাড়ায় যাইতাম ঘট কুড়াইতে। কার্ত্তিক পূজার ছোট ছোট ঘট চাহিয়া আনিয়া আমরা খেলা করিতাম। রেলের রাস্তা পার হইয়া ছোট গাঙের তীরে কাজেম মোল্লার বাড়ি। তারপর যাদব ঢুলির বাড়ি পার হইলেই নমঃশুদ্রদের পাড়া। সামনেই রামেরাজের আস্তানা। তার ছেলে রাজ মিস্ত্রির কাজ করিয়া বহু টাকা জমাইয়াছে। খুব ঘটা করিয়া তাহার বাড়িতে পূজা হয়। সেখান হইতে বাঁশ ঝাড়ে ঘেরা পথ বাহিয়া খানিক আওগাইলেই বাসুদের দালান। গা ভরা সোনার গয়না পরিয়া বসু বাড়ির বউরা এ কাজে ও কাজে যাইতেছে। বাড়ির বড় মেয়েটি ডালায় করিয়া খই মুড়ি নারকেলের লাড়ু আনিয়া আমাদের কোঁচরে ঢালিয়া দিল। তার সারা গায়ে যেন সোহাগ ঝরিয়া

পড়িতেছে। বসুদের বাড়ি ওধারে ঘোষেদের বাড়ি, তারপর বামুন বাড়ি পার হইলেই সুতোর পাড়া। ঘট চাহিতে ঘটের সঙ্গে মুড়ি নারকেল খইএর মওয়া আনিয়া দেয়।

ইহার পরে আরও বড় হইলে একাই আমি হিন্দু পাড়ায় পূজা দেখিতে যাইতাম। কেদারীর মা সঙ্গে থাকিত না বলিয়া কেহই মুড়ি মুড়কি দিত না। কিন্তু সুন্দর সুন্দর প্রতিমাগুলি দেখিতে আমার বড়ই ভাল লাগিত। বিশেষ করিয়া সরস্বতী পূজার প্রতিমাগুলি কতই না সুন্দর বলিয়া মনে হইত। আর সেই প্রতিমার চাইতেও সুন্দর হিন্দু মেয়েগুলি নতুন শাড়ী পরিয়া যখন এ কাজে ও কাজে ঘুরিত আমার মনে হইত পূজার প্রতিমাগুলিই যেন জীবন পাইয়া তাহাদের আঙিনায় ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে।

কেদারী যখন বড় হইয়া বিবাহ করিয়া সংসার পাতিল, তখন ত কেদারীর মার অভাব ছিল না। কিন্তু কোন কাজ কর্মে মা তাহাকে ডাকিলে সে হাসিমুখে আসিয়া মায়ের যে কোন কাজই করিয়া দিয়াছে। বাড়িতে পিঠা তৈরী করিয়া পাড়ার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমাগিকেও ডাকিয়া আনিয়া খাওয়াইছে। মুখে বলিয়াছে, "তোমাদের বাড়িতে কত খাইয়াছি, আমি আর তার কতটা পরিশোধ করিব।"

কেদারীর মা একবার খুব অসুখে পড়িল। সেই অসুখের মধ্যে বলিয়া পাঠাইল, জসীর মার হাতের রান্না একটু ডাল খাইলে আমি ভাল হইয়া উঠিব। আমি নিজে মাকে দিয়া ডাল রাঁধাইয়া কেদারীর মাকে আনিয়া দিলাম। সত্য সত্যই কেদারীর মা ভাল হইয়া উঠিল। পরবর্তিকালে বধূদের সামনে আমি মাকে খেপাইতাম, "মা, তোমার হাতের ডাল খাইয়া সেবার কেদারীর মার অসুখ সারিয়া গেল, আজ তুমি ডাল পাকাইবে।"

আমার মা অনেক কিছু রান্না করিতে জানিতেন না, কিন্তু যে কয়টি পদ তিনি রান্না করিতেন তেমন রান্না আর কোথাও খাই নাই। যখনই মায়ের হাতের রান্না খাইতে ইচ্ছা করে বোনদের বাড়ি যাইয়া খাইয়া আসি। আমার বোনেরা মায়ের হাতের রান্নার কিছুটা উত্তরাধীকারিনী হইয়াছে। এই উত্তরাধিকার বংশানুক্রমিক কিনা জানি না। আমার

ভাবী প্রায় সারাজীবন মায়ের সঙ্গে কাটাইলেন কিন্তু মায়ের রান্নার উত্তরাধিকারিনী হইতে পারেন নাই।

কেদারীর মা মৃত্যুকালে আমাকে দেখিতে চাহিয়াছিল। তখন তাহার শ্বাস উঠিয়াছে। আমার হাত দুইখানি বুকের মধ্যে লইয়া কি যেন বলিতে চেষ্টা করিল, বলিতে পারিল না। আমার চোখ দুইটা হইতে অশ্রুধারা মানিতে চাহিতেছিল না। কেদারীর মা মরিয়া যাইতেছে। তার সঙ্গে যখন যেখানে গিয়াছি, সব কথা ছবির মত মনে আসিতেছিল। দেশের কোন রকম রাজনৈতিক ইতিহাসেও কেহ তাহার নাম উল্লেখ করিবে না। এই স্নেহময়ী সেবার প্রতীমা, নিজের স্বল্পপরিসর গ্রামখানিতে সেবা দিয়া আত্মত্যাগ দিয়া যে ভালবাসার দীপটি জ্বালাইয়া দিয়া গেল, উহার উত্তরাধিকারী কি আর গ্রামে আসিবে?

তখন গ্রামও ছিল মহিয়ান। আত্মীয়-স্বজনহীনা বিধবারা নিজদিগকে তাই অসহায় মনে করিত না। গ্রামবাসীরা তাহাদিগকে আত্মীয়-স্বজনের মত লালন পালন করিত। বিধবারাও তাই সেবার প্রতিমা হইয়া তাহাদের এই দানের প্রতিদান দিয়াছে। তাহাদের গলগ্রহ হয় নাই। কেদারীর মার ছেলেও তাই গ্রামের অন্যান্য ছেলেরা যেমন মানুষ হয় তেমনি ভাবে মানুষ হইয়াছে। এ জন্য তাহাকে এতিমখানায় পাঠাইতে হয় নাই।

মায়ের সংসার

আমার কোন ভাই হওয়ার আগে মা গোপনে কিছু চিড়া কুটিয়া ঘরের মাচার মধ্যে লুকাইযা রাখিয়াছিলেন। মা যখন এদিক ওদিক কাজে থাকিতেন আমি তখন সেই মাচায উঠিযা এটা ওটা খাইবার জিনিষ খুঁজিতাম। আমার সেই খুঁজিবার ক্ষমতা এমনি নির্ভুল হইত যে মা যেখানে যাহা গোপন করিয়া রাখিতেন আমি অনায়াসে তাহার সন্ধান পাইতাম। বোধ করি সকল মায়ের ছেলেরাই ইহা পায়। সেদিনও আমার স্ত্রী ছেলেদের প্রতি অভিযোগ করিতেছিলেন, ফলটা মূলটা যেখানেই লুকাইযা রাখি কেমন করিয়া যেন বান্দরগুলি খুঁজিয়া পায়।" এইভাবে মাচা খুঁজিয়া কোনদিন কলাটা, আমটা বা পেয়ারাটা পাইতাম। সেদিন খুঁজিতে খুঁজিতে ধানের বেড়ির মধ্যে একটি নতুন পাতিল দেখিতে পাইলাম। সেই পাতিল খুলিয়া দেখি তুষ-কুঁড়াসহ এক পাতিল চিড়া। তখন আর আমাকে পায় কে? সেই চিড়া বাহির করিয়া আনিযা কুলায় ঝাড়িয়া কতক ভাইদের দিলাম, কতক নিজে খাইতে বসিলাম, এমন সময় মা কোথা হইতে আসিয়া তুষ কুঁড়াসহ সেই চিড়ার পাতিলটি ছোঁ দিয়া লইয়া গিয়া কাঁদিতে বসিলেন। তখনকার দিনে আঁতুড়ঘরে পোয়াতীরা শুধু একবেলা ভাত খাইতে পাইত। রাতে চিড়াভাজা ছাতু ঝালসহ খাইবার নিয়ম ছিল। আঁতুড়ঘরে বসিয়া ঝালের ছাতুও মা একা খাইতেন না। আমাদিগকে ভাগ দিতেন। মায়ের সেই দুর্দিনের অবলম্বন চিড়াগুলি খাইয়া মাকে যে কি অসুবিধায় ফেলিলাম তখনকার বালক বয়সে তাহা বুঝিতে শিখি নাই। হয়ত মায়ের শরীর এই সময় এত খারাপ ছিল যে পুনরায় চিড়া কুটিয়া রাখিবার সামর্থ তাঁহার ছিল না। আজ আমার সংসারে ছেলে-মেয়েরা এত ভাল ভাল খাবার ফেলিয়া ছড়াইয়া খায়। একথা ভাবিতে চোখ অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসে, সামান্য কয়টি চিড়ার জন্য আমার মা সেদিন এমন করিয়া চোখের পানি ফেলিয়াছিলেন।

একবার মায়ের কাছে আমি খুব মার খাইয়াছিলাম। আমাদের বাড়িতে গুড় মিষ্টি খুব কমই থাকিত। আমার ছোট ভাই সোয়েদ উদ্দীন তখন কয়েক মাসের। তার দুধ খাইবার জন্য মা কিছু মিছরি একটি বাঁশের চুঙ্গার মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমি সেই মিছরি খুঁজিয়া পাইয়া সমস্ত খাইয়া ফেলিযাছিলাম। মা টের পাইয়া আমাকে তাড়া করিলেন। আমি আমার পিতার চাচাত-ভাই বড় চাচার কাছে আশ্রয় লইতে দৌড় দিলাম। বড় চাচা মায়ের ভাসুর। তাঁর সামনে মা যাইবেন না। কিন্তু পথের মধ্যে আমাকে ধরিয়া আনিয়া মা বেশ উত্তম মধ্যম ত দিলেনই তারপর টানিযা লইযা চলিলেন, "আয তোকে পাটা পুতায় ছেঁচিযা ফেলি।" প্রতিবেশী কোন বাড়িব বধূ আসিযা আমাকে ছাড়াইয়া লইয়া গেল।

মা আঁতুড় ঘরে যাইযা মাত্র ছয়দিন কাটাইতেন। সেই ছয়দিনও আঁতুড় ঘরে বসিযাই মা আমাদের খাওযা দাওয়ার তদারক করিতেন। ছয়দিন পরে আঁতুড় ঘর লেপিয়া পুঁছিয়া মা বাহির হইতেন। নতুন ভাইকে পাইয়া আমরা নতুন খেলনার মত আদর করিতাম। এই ছযদিন আমাদের আঁতুড় ঘরে যাওয়া নিষেধ ছিল। যদি বা হঠাৎ কোনদিন সেখানে ঢুকিতাম বাহিরে আসিযা স্নান করিতে হইত। নতুবা পাড়াব কেহই আমাদিগকে ছুঁইত না। কেদারীর মা হাত পা ধুইযা ভালমত পরিষ্কার করিয়া সেই হাত পা আগুনে সেকিযা ঘরে ঢুকিত। সকাল হইলে আতুড় ঘর হইতে বাহির হইয়া স্নান করিয়া তবে আমাদের অন্যান্য কাজকর্ম করিত। আঁতুড় ঘর খানির দরজা প্রায়ই বন্ধ থাকিত ঘরের সামনে একটি মরা গরুর মাথার হাড়, একজোড়া ছেঁড়া জুতা ও পিছা রাখা হইত, যেন কোন অপদেবপতা আসিয়া শিশুর ক্ষতি না করে,—কোন আট কুড়ো মাযের বদদৃষ্টি যাতে শিশুর উপর না পড়িতে পারে। যদি বা পরে তাহাতে শিশুর কোন ক্ষতি হইবে না। কারণ তারপরই ঘরের সামনে লটকানো সেই হাড়, ছেঁড়া জুতা আর পিছার উপর চাহিলেই তাহার কু দৃষ্টি নষ্ট হইয়া যাইবে।

মাত্র কয়েকখানা ছেড়া নেকড়া, পুরাতন কাঁথা ছাড়া প্রসূতিরা আগে কিছুই সংগ্রহ করিয়া রাখিত না। সন্তান হইলে একজন দৌড়

পাড়িত, বাঁশের ঝাড় হইতে 'নেইল' (বাঁশের ধারাল ছাল) কাটিয়া আনিবার, অপরজন দৌড়াইয়া যাইত ওবাড়ি সেবাড়ি হইতে একটু মধু আনিয়া সেই মধু সন্থ-জাত শিশুর মুখে দিতে। প্রসুতি যদি বেদনায় অজ্ঞান হইয়া পড়িত তখন তাহার মাথায় তেলপানি দেওয়া হইত। সেই তেল যদি বাড়িতে না থাকিত অপর বাড়ি হইতে তৈলের বাটি লইয়া তৈল আনিবার জন্য কোন লোকের দৌড়াইতে হইত। আনাড়ি দাইয়ের অপরিস্কার হাতে নাড়ি কাটাইতে কত শিশু ধনুষ্টঙ্কার হইয়া মারা যাইত। লোকে বলিত, শিশুকে পেঁচোয় পাইয়াছে। এ জন্য ওঝা ও ফকির বৈষ্টমেরা সুর করিয়া মন্ত্র পরিয়া সরলপ্রাণ গ্রামবাসীদের নিকট হইতে বেশ কিছু আদায় করিয়া লইত। আমার ছোট ছোট দুইটি ভাই আঁতুড় ঘরেই মারা যায়। একটি ভাইকে কাফনে সাজাইয়া যখন কবর দিতে লইয়া যায় মা তখন কাঁদিয়া আমার চাচীকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিলেন, ''দেখ বু! আমার বাছা সাজিয়া গুজিয়া বিবাহ করিতে চলিয়াছে।'' সেই কথাটি আজও আমার মনে আছে।

আমার মায়ের সংসার ছিল একার। ছয়দিন আঁতুড় ঘরে থাকিয়া সাত দিনের দিন গোসল করিয়া মা বহির হইয়া আসিতেন। তখন হইতে আমাদিগকে রান্নাবান্না করিয়া খাওয়াইতেন। আমার এক দূর সম্পর্কের চাচী ছিলেন। তিনি সন্তান প্রসবের পরদিন হইতেই সংসারের কাজ কর্ম করিতেন। সাত দিন পরে ঢেঁকী ঘরে যাইয়া ধান ভানিতেন তাঁর একটি সন্তানও নষ্ট হয় নাই।

হিন্দু পাড়ায় পোয়াতীদের অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। তাহারা উঠানের মধ্যে একটি কুঁড়ে ঘর তুলিয়া দিত। সেখানে এক মাসের জন্য সন্থ-জাত শিশু ও পোয়াতীকে কাটাইতে হইত। বৃষ্টি বাদলে উঠানের পানি গড়াইয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিত। সেই কুঁড়ে ঘর পোক্ত না বলিয়া অনেক সময় ঝড়ে উড়াইয়া লইয়া যাইত। তখন অসহায়া মা ও শিশু নিউমোনিয়া হইয়া মারা যাইত। এক মাস এইভাবে সেই কুঁড়ে ঘরে থাকিয়া মা বাহির হইয়া আসিত। নবাগত শিশুর জন্মের জন্য সেই ঘর অশুচী হইয়াছে বলিয়া গৃহবাসীরা তাহা ভাঙ্গিয়া নদীর তীরে লইয়া গিয়া পোড়াইয়া আসিত। তারপর স্নান

করিয়া পবিত্র হইয়া ঘরে ফিরিত। আজও গ্রাম্য হিন্দু সমাজ হইতে এই পদ্ধতিটি উঠিয়া যায় নাই।

আমাদের মুসলমান পাড়ায় কিন্তু সব চাইতে ভাল ঘরখানিই পোয়াতী মায়েদের জন্য রাখা হইত! এখনও তাহাই হয়। শিশুর জন্মের ছয়দিন পরে ছয় হাটুরে হয। এইদিন আঁতুড় ঘর লেপিয়া পুঁছিয়া পরিষ্কার করা হয। সামান্য ঝাল মিশাইয়া গুড় দিয়া সেমাই পাক করিয়া ও মুরগী রান্না করিয়া পোয়াতীকে খাইতে দেওয়া হয়। এই উপলক্ষ্যে আত্মীয় স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীদের লইয়া একটি ছোটখাট ভোজ হয়। যাহারা গরীব মানুষ তাহারা অভ্যাগত প্রতিবেসীদের পান তামাক সাজিযা দিযা হাসিয়া গাহিয়া আঁতুড় ঘরখানিকে আনন্দমুখর করিযা যায। এই ধরনের একটি গান নিম্নে দেওয়া হইল,—

জন্মিল জন্মিত গোপাল
আমির অলীর ঘরেরে,
গোপাল জন্মিল কার ঘরে!
চাচীর কোলে যাযা গোপাল জামা জুতা চাহেবে
গোপাল জন্মিল কার ঘরে।
খালার কোলে যাযা গোপাল মোহন বাঁশী চাহেরে
গোপাল জন্মিল ক'র ঘরে।
বাপের কোলে যায়া গোপাল মাথায টুপী চাহেরে
গোপাল জন্মিল কার ঘরে।
বোনের কোলে যায়া গোপাল রাঙা সুতা চাহেরে
গোপাল জন্মিল কার ঘরে।

নবজাতক শিশুকে অবলম্বন করিয়া এই গানটিতে একটি গৃহের আনন্দ উৎসবে কি মধুর ছবিটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাবা, মা, চাচা, চাচী, খালা, বোন এবং অপরাপর আত্মীয় স্বজনেরা প্রত্যেকে গানের এক একটি চরিত্র হইয়া সেই আনন্দ উৎসবটিকে আরও জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। এই গানটি হয়ত প্রথমে কোন হিন্দু বাড়িতে গীত হইয়াছিল। কারণ গোপালের জন্ম হিন্দু বাড়িতেই হওয়া সম্ভবপর।

প্রথমে কোন মুসলমান বধূ হয়তো, গানটি যেখান হইতে শিখিয়া আসিয়া আমির আলীর নবজাতকের জন্ম উৎসবে ইহাকে সামান্য পরিবর্তন করিয়া গাহিয়াছিল। সেই হইতে এই গান মুসলমান সমাজে চালু হইয়াছে। এরূপ আদান প্রদানের ছাপ আমাদের পল্লী সঙ্গীত-গুলিতে বহু আছে। গানগুলি বহু রীতিনীতিসম্পন্ন দুই ধর্মের লোকদের মধ্যে একটি সুন্দর মিলন সেতু রচনা করিয়া দেয়।

আমার পিতা এদেশে ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রতিভু হাজী শরিয়া-তুল্লার জামাতের প্রতিনিধি ছিলেন। সেই জন্য আমাদের বাড়ির আঁতুড়ঘরে কোনরকমের গান হইবার যো ছিল না।

রাঙাছুটুর বাপের বাড়ি

আমার নানাবাড়ি ছিল আমাদের বাড়ি গোবিন্দপুর হইতে আট মাইল দূরে তাম্বুলখানা গ্রামে। এত দূরের গ্রাম হইতে নববধূটি হইয়া কি করিয়া মা আমাদের বাড়ি আসিয়াছিলেন, কে সেই নববধূটিকে প্রথম বরণ করিয়া ঘরে লইয়াছিলেন, কে সেই বনজঙ্গলে ঘেরা দেশের মেয়েটির খবর আমাদের এত দূরের দেশে প্রথম আনিয়াছিলেন এসব খবর এখন আর জানিবার উপায় নাই। আজ আবছা আবছা মনে পড়িতেছে, আমার এক দুর সম্পর্কের মামা সোয়ারী বেহারা সঙ্গে করিয়া মাকে নিতে আসিতেন। মায়ের বেতের ঝাঁপিতে একখানা মাত্র বেগুনী রঙের বেনারসী শাড়ী ছিল। সেই শাড়ীখানা পরিয়া মা সোয়ারীতে যাইয়া বসিতেন। সোয়ারীর চারিধারে কাপড় দিয়া ঘিরিয়া দেওয়া হইত। মায়ের আয়না, চিরুণী, তেলের শিশি প্রভৃতি টুকি-টাকি জিনিসগুলি সুন্দর একটি বেতের সাজিতে ভরিয়া সোয়ারীর বাঁশের সঙ্গে ঝুলাইযা রাখা হইত। মা রওয়ানা হইবার আগে এ-বাড়ি ও-বাড়ি হইতে গ্রাম্য বধূরা মা'র সঙ্গে দেখা করিতে আসিত। বাপের বাড়ি যাওয়ার আনন্দে মা যেন ছোট্ট খুকীটি হইয়া পড়িতেন। প্রতিবেশীদের সঙ্গে একথা সেকথায় দেরী হইলে সোয়ারী-বেহারারা তাড়া লাগাইত। সেই তাড়া মা'র হাসিখুশী মুখখানিতে আরও হাসিখুশী মাখাইত। সোয়ারীর বাঁশে সালাম করিয়া মা সোয়ারীতে উঠিতেন। তারপর বেহারা সোয়ারী কাঁধে লইয়া রওয়ানা হইত। আমি আর ওফাজদ্দী মামু সোয়ারীর পাছে পাছে যাইতাম। গোবিন্দপুরের গ্রাম ছাড়াইয়া সোভারামপুরের গ্রাম। মধ্যে ছোট গাঙ্। বাঁশের সাঁকোতে সেই গাঙ্ পার হইয়া নদীর তীর দিয়া পথ। গাঙ্ ত নয়, পল্লীবাসীদের খেলাইবার একটি ঝুমঝুমি। এর কোথাও সরু জলধারা এক হাঁটুর উপরে গভীর নয়। গ্রামের উলঙ্গ ছেলেমেয়েরা সেখানে কেহ মাছ ধরিতেছে, কেহ ঝুপুরি খেলিতেছে। গাঙের মাঝে মাঝে খানিক ছড়াইয়া গিয়া কুম হইয়াছে। সেখানে গভীর জল। আমাদের গ্রাম মুসলমান-প্রধান বলিয়া

নদীতে মেয়েরা স্নান করিতে আসে না। এ নদীর দুই পাশে হিন্দু পাড়া। সেখান হইতে দল বাঁধিয়া বধূরা নদীতে জল লইতে আসে। নদীর ঘাটে বসিয়া কেহ স্নান করে, কেহ কাপড় ধোয়, সখীতে সখীতে হাসাহাসি করিয়া এ ওর গায়ে কলসীশুদ্ধ পানি ঢালিয়া দেয়। কেহ ইচ্ছা করিয়া পথে আছাড় খাইয়া পড়ে। আর সব বধূরা হাসিয়া খুন হয়। নদীও যেন ওদেরই মত হাসি-মুখরা মেয়ে। তাই ওদের বুকে পাইয়া আপনার জলধারা নাচাইয়া কূলে কূলে ঢেউ তুলিয়া ওদের ক্ষণিকের ক্রিড়া কৌতুককে আরও সুন্দর করিয়া তোলে। কত রঙের শাড়ীই না পরিয়া আসে বউরা। সমস্ত নদীতটে যেন আকাশের খণ্ড খণ্ড মেঘেরা আসিয়া ভীড় করিয়াছে। আজকালের মেয়েরা পোষাক পরিচ্ছদে রঙের অত বাড়াবাড়ি পছন্দ করে না। পুরুষের অঙ্গাভরণ হইতে ত কবেই রঙের বৈচিত্র চলিয়া গিয়াছে। আগেকার দিনে গ্রামের পুরুষেরা বড় বেশী জামা কাপড় পরিত না ; কিন্তু কাঁধের গামছায়, গায়ের আলোয়ানে, পরনের কাপড়ে, কত রঙই না খেলা করিত। মেয়েদের শাড়ীর রঙের রকমারির ত কথাই ছিল না। সাত আকাশের যত রঙ তাহাদের শাড়ীতে সোয়াড় হইয়া সমস্ত গ্রামে ঘুরিত ফিরিত।

সেই ছোট গাঙের পথ পারাইয়া আসিতাম গোয়াল চামটের রাস্তায়। রাস্তার দু'ধারে সারি সারি বড় বড় ঝাউগাছ। দূর হইতে সেই ঝাউগাছে বাতাসের শোঁসানি শুনিয়া বুকের মধ্যে যেন কেমন করিয়া উঠিত। সেখানে সোয়ারী বেহারারা খানিকটা জিড়াইয়া লইত। তারপর ডোমরাকান্দির পথ। দু'ধারে কত জঙ্গল। মাঝে মাঝে চার পাঁচখানা বাড়ি। সেই বাড়ি-গুলি হইতে বধূরা আমার মায়ের সোয়ারীর দিকে চাহিয়া থাকে। কেহ কেহ বেহারাদিগকে বলে, একটু জিড়াইয়া তামুক খাইয়া যাও। এক দেশের মেয়ে আর এক দেশের মেয়ের সঙ্গে মিতালী করিতে চায়। হয়ত নিজেদের এক ঘেয়ে জীবনের মধ্যে একটু বৈচিত্র আনিতে প্রয়াস পায়। বেহারা কথা শোনে না। সামনের রাস্তা ধরিয়া মায়ের সোয়ারী নাচিয়া নাচিয়া যায়।

এ পথ গিয়াছে কোনখানে ! এখানে দুইধারে শুধু তেঁতুল গাছের সারি তারপর বহেড়া গাছের জঙ্গল। শীতল ছায়া ধরিয়া পথিকের প্রাণ জুড়াই-তেছে। শাখায় শাখায় পাখির গান ভরিয়া পথিকের মন জুড়াইতেছে। এ

পথ গিয়াছে কোনখানে ! সামনে উড়ি-আম গাছ, কানাই-লাঠির জঙ্গল। এ গাছ হইতে ও গাছে বেতের লতা আসিয়া একে অপরকে বাঁধিয়া সেই বনভূমিকে মানুষের অগম্য করিয়া রাখিয়াছে। তারই পাশ দিয়া পথ— গোয়াল চামট ছাড়িয়া ডোমরাকান্দি—সেখানে ত্রিমণির উপর সরকারী পাকা কুয়ো। এমন নিটল পানি ! পিপাসা না থাকিলেও লে কে এখান হইতে এক ঘটি পানি উঠাইয়া পান করে। এখানে আর এক জিড়ান দিয়া বাঁধা কুয়োর পানি খাইয়া বেহারারা রওয়ানা হয় বামে ঘুরিয়া তাম্বুল-খানার রাস্তায়। ডাইনের দিকে সামনে দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে পথ দিগনগরের হাটে, তারপর ধোপাঘাটা, মাগুদপুর, যশোর, তারপর দিল্লী লাহোর, বোধ হয় দুনিয়ার শেষ প্রান্তে।

আমরা চলিয়াছি নানাবাড়ির পথে, তাম্বুলখানা গ্রামে। এ পথের ধারে ধারে গাছগাছালি দাঁড়াইয়া ছায়া বিস্তার করে না। এক দৌড়ে চষামাঠ ছাড়াইয়া পথ যাইয়া ঢোকে গভীর জঙ্গলে। যেখানে বেত গাছের শিষা আসিয়া পথিকের গায়ের চাদর আটকাইতে চায়। শ্যামলতা তার লতা-গুলির ফাঁদ মেলিয়া পথিকের পায়ে জড়াইয়া পড়ে। তবু এ পথ ভাল। গাছের ডালে ডালে কত মাকাল ফল পাকিয়া লাল হইয়া আছে। কুঁচের লতা কত কুঁচ ফল পাকিয়া রাঙা হইয়া হাসিতেছে। এ যেন বনরাণীর সিঁদুরের ঝাঁপি। হিজল গাছের তলা দিয়া যখন পথ, তখন ত সেখান হইতে যাইতেই ইচ্ছা করে না। রাশি রাশি হিজল ফুল মাটিতে পড়িয়া সমস্ত বনভূমিকে যেন আলতা পরাইয়া দিয়াছে। কোন্ গোপন চিত্রকর যেন এই বনের মধ্যে বসিয়া পাকা তেলা কুঁচের রঙে মাকাল ফলের রঙে আর হিজল ফুলের রঙে মিলাইয়া তার সবচাইতে সুন্দর ছবিখানি আঁকিয়া বসিয়া বসিয়া দেখিতেছে।

তারপর আবার মাঠ। মাঠের পর আবার বন। মামাবাড়ি আর কত দূর—ওই ত সামনে দেখা যায় মুরাল দহ। আহা কি মিষ্টি এই গ্রামের নাম ! জাঙলা ভরিয়া লাউ-কুমড়ার জালি বাতাসে দোলা দিতেছে। কনে-সাজানী সীমলতার জাঙলার কি রঙ ! এ-বাড়ির বউ বুঝি তার নীলাম্বরী শাড়িখানি মেলিয়া ধরিয়াছে এই জাঙলার উপর। ও-বাড়ির গাছে আম পাকিয়া পাকিয়া রাঙা হইয়া আছে। সেই আমের মত রাঙা টুকটুকে

বউটি বাঁশের কোটা দিয়া আম পাড়িতেছে। সে-বাড়ির গাছে হাজার হাজার কাঁঠাল ধরিয়াছে। এ যেন ওদের ছেলেমেয়েগুলি গাছের ডালে ডালে ঝুলিতেছে। এ গাঁও ছাড়িয়া আসিলাম তাম্বুলখানা গ্রামে; এই ত মোকিমের বাড়ির বড় বড় তালগাছ দুইটি দেখাযায়। বরোইদের পানের বর ডাইনে ফেলিয়া মিঞাজানের বাড়ির সামনে দিয়া ফেলিদের বাড়ি—তারপর ওই ত নানা বাড়ির নারকেল গাছ। বাতাসে শোঁ শোঁ করিতেছে। নানী দাঁড়াইয়া আছেন পথের মধ্যে। কতক্ষণ যে এইভাবে দাঁড়াইয়া আছেন কে জানে! ডুলি যাইয়া নামিল উঠানের মধ্যে। নানী ডুলির কাপড় উঠাইয়া মাকে নামাইয়া আনিলেন। মা নামিয়া নানীর পায়ের ধূলা লইতে নানী মাকে ধরিয়া বারান্দার উপর আনিয়া বসাইলেন তারপর পাখার বাতাস করিতে করিতে কত কথা। মায়ের মাথার চুলগুলি আলগা করিয়া দেখে নানী। হাত দুইখানি মুঠি করিয়া বুকের মধ্যে ধরিয়া রাখেন।

কত রকম খাবার করিয়া রাখিয়াছেন নানী। তিলে-পাটালি - সেই কবে শীতকালে করিয়া রাখিয়াছিলেন। বাতাসে গলিয়া যায় তাই মুড়ির কোলার মধ্যে ভরিয়া রাখিযাছেন। ঢ্যাপের মোয়া, নারকেলের লাড়ু, ঘরের গরুর ঘন-আওটা দুধ, পাকা-সিঁদুরে গাছের আমের গোলা। নানী মার মুখে তুলিয়া দিতে যান। মা আমাকে দেখিয়া লজ্জা পান। নানীর হাতখানা আমার মুখের দিকে বাঁকাইয়া ধরেন। মা যেন আজ এতটুকু হইয়া গিয়াছেন। আমার চাইতেও ছোট। ছোট বলিয়াই কি এত আদর করিতে হয়? আমরাও ত ছোট—আমাদের কে এমন করিয়া আদর করে!

খাইতে খাইতে ও-বাড়ি হইতে তাহেরের মা আসিল, ফেলি আসিল, মোকিমের বউ আসিল। ও রাঙাছুটু! কেমন আছিস? এই আসিলি বুঝি? আমি ডুলি দেখিয়াই বুঝিয়াছি তুই আসিতেছিস। তারপর কত কথা—কত হাসি—কত তামাশা। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ও-বাড়ির তাহের আসিল - তাহেরের ভাই গেদা আসিল। এখনই যাইব বাঁশঝাড় হইতে ছিপ কাটিতে তল্লা-বাঁশের ফাঁপ দিয়া বাঁশী বানাইব। মামাবাড়ির সমস্ত রহস্য রাত আসিয়া তাহার অন্ধকারের পাখায় ঢাকিয়া ফেলিল। এখন আর বনে যাওয়া হইবে না। গেদা তুই খুব ভোরে উঠিস। গরীবুল্লা মাতবরের ছেলে নিহাকেও ডাক দিয়া আনিস।

সারাদিন হাটায় শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া দুই চোখে ঘুম জড়াইয়া আসে। নানী তাড়াতাড়ি খাওয়াইয়া বিছানায় শোওয়াইয়া দেন। মা'র সঙ্গে নানী কিন্তু গল্প করিতেই থাকেন। কি গল্পেই পাইয়াছে তাঁদের দুইজনকে। আমি ঘুমাইতে ঘুমাইতে শুনি। "হারে! সেখানে কি তোর খুব কাজ করিতে হয়? মা উত্তর করেন, "না, মা! একার সংসার, কতটুকুই বা কাজ! করিয়া ফেলিয়াই বসিয়া বসিয়া গল্প করি।" হারে! পেট ভরিয়া তো খাইতে পাস? এটা ওটা ভাল খাবার বাড়িতে হইলে নিজে খাস ত?" মা উত্তর করেন, "মা! তোমার হইয়াছে কি আজ? পেট ভরিয়া খাই না, তবে এত মোটা হইয়া আসিলাম কেমন করিয়া? সেখানে ধান চাউলের ছড়াছড়ি। শ্বাশুড়ী নাই—ননদী নাই। যা রান্দিবাড়ি ওদের খাওয়াইয়া নিজে খাই।" নানী বিশ্বাস করেন না। "কই মোটা হইযা আসিয়াছিস? তোর সমস্ত গা যে শুকনা কাঠের মত দেখিতে হইয়াছে।"

শুইয়া শুইয়া ভাবি, মা আমার কি মিথ্যাবাদী। একদিনও ত মাকে ভাল মাছখানা খাইতে দেখিলাম না। পিঠা বানাইলে আমরা খাইয়া থুইয়া ঠাণ্ডা দুই এক টুকরা অবশিষ্ট যা থাকে তা-ই ত মা খায়। মিথ্যা বলিলেও মাকে আজ বড় ভাল লাগিল। শত হইলেও সেটা আমাদের বাড়ি। আমাদের বাড়ির নিন্দার কথা কি এখানে বলা উচিত হইবে।

ভোর না হইতেই ঘুম ভাঙ্গিয়া যায। সামনের বনে কত রকমের পাখি ডাকিতেছে। আমরা নদীর দেশের লোক। আমাদের ওখানে ত এসব পাখি ডাকেনা। কত রকমের সুর করিয়া ডাহুক ডাকিতেছে, কোয়াক, কোয়াক, কোয়াক; কোড়া ডাকিতেছে, কুয়া-কুয়া-কুয়া। মাঝে মাঝে কাঠ ঠোকরা গাছের ডালে ঠোকর মারিতেছে। কোন পাখি ডাকিতেছে, কির—রর রি রি, কানাকুয়া ডাকিতেছে টুব টুব টুব। আমার যেন কেমন ভয় ভয় লাগে। ঘরের বেড়া দিয়া সুর্যের আলো আসিতেছে। নানা উঠিয়া ভোরের আজান দিলেন। কালকের কথামত গেদা আসিয়া উঠানে দাঁড়াইয়াছে, ও জসী।"

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া যাই। ও কোণের বারান্দা হইতে বাঁশের বড় কোটাটি লই। তারপর প্রথমেই যাই নাভীওয়ালা আমগাছ তলায়। সেখানে কত আম পড়িয়া আছে—একটা, দুইটা, তিনটা আরও—আরও

আরও। কুড়াইয়া কুড়াইয়া সাজি ভরি। তারপর বর্ণচোরা আমের গাছ তলায়। গাছে আম পাকিয়া আছে। কিন্তু চিনিবার যো নাই। পাকিয়া লালও হয় না, তলায়ও পড়ে না। গাছে উঠিয়া টিপিয়া টিপিয়া পাড়িতে হয়। গেদা ভাল গাছে উঠিতে পারে। আমি তলায় ঘুরিয়া ঘরিয়া আম কুড়াই। তারপর চিনিচম্পা গাছের আম। একেবারে চিনির মত মিষ্টি। আর এমন রঙ! সেখান হইতে ছুটিয়া যাই সিঁদুরে-আম গাছের তলায়। এত উপরে উঠিয়াছে গাছটি যেন আকাশ ছুঁইবে। চারিধার হইতে বেতের কাঁটা-লতায় জঙ্গল হইয়া আছে এর তলা।

বেতের গাছ সরাইয়া সরাইয়া গাছের নীচে যাই। পাখিতে আধেক খাওয়া দুই তিনটা আম কুড়াইয়া পাই। কিন্তু গাছে উঠিবে কে? আগডালে সুন্দর সুন্দর সিঁদুরে আম ঝুলিতেছে। গেদা এত বড় গাছেও উঠিতে পারে, কিন্তু গাছ ভরিয়া বাসা করিয়া আছে লাল পিপড়া। কে যাইবে এই গাছে! আমাদের হাতের ঢিল অতদুরে যায় না। নানীর লম্বা বাঁশের হম্বাটা লইয়া আসি। হম্বার আগায় কোটা বাঁধিয়া দুইজনে গাছের উপরে ডালে আটকাইয়া ঝাঁকি দেই। রাশি রাশি আম আসিয়া তলায় পড়ে—দুই একটা গায়ে আসিয়াও লাগে। কিন্তু কে তখন তাহা লক্ষ্য করে! ওই একটা—ওই একটা, কুড়াইয়া কুড়াইয়া সাধ মেটে না। ধামা ভরিয়া আম কুড়াইয়া বাড়ি ফিরি। নানী বলেন, "আমার ভাই আসিয়াছে বলিয়াই ত এত আম পাইলাম।"

কিন্তু এত আম কে খাইবে? সকলের বাড়িতেই গাছ-ভরা আম। হাটে বাজারে কেউ বড় আম কিনিতে আসে না। ফরিদপুরের হাট সেই কত দূরে! যাইতে এক দুপুর লাগে। দিন যাইয়া দিন ফিরিয়া আসা যায়। সেখানে বেশী দামে আম বিক্রি হয়। কিন্তু ভাল রাস্তাঘাট নাই বলিয়া কে লইয়া যাইবে মাথায় করিয়া অত দূরের পথে।

নানীকে আমরা বড়-বু বলিয়া ডাকিতাম। আমার ভাইদের মধ্যে কে তাঁহাকে বড়-বু বলিয়া প্রথম ডাকিয়াছিল জানি না। আমার বোনদের ছেলেমেয়ে হইলে মা তাহাদের শিখাইয়া দিতেন, আমাকে বড়-বু বলিয়া ডাকিস। কিন্তু তাহারা মাকে নানী বলিয়াই ডাকিত। মা হয়ত তাঁর মায়ের প্রতি আমাদের বড়-বু ডাকটির অধিকারিণী হইতে চাহিয়াছিলেন।

বড়-বু আমাদের কুড়ানো সমস্ত আমের গোলা করিয়া কুলার উপর, ডালার উপর শুখাইতে দিতেন। সমস্ত উঠানটা নক্‌সায় নক্‌সায় ভরিয়া যাইত, রঙ বেরঙের আমসত্ত্বে। সেই আমসত্ত্ব নানী আমাদের ত দিতেনই, বাকিটা যত্ন করিয়া হাঁড়িতে ভরিয়া রাখিতেন। আমরা আমাদের বাড়ি গোবিন্দপুরে আসিলে নানা আমাদিগকে দেখিতে আসিবার সময় সেই আমসত্ত্ব সঙ্গে লইয়া আসিতেন। আমরা যখন তাহা কাড়াকাড়ি করিয়া খাইতাম তখন তৃপ্তির খুশীতে বৃদ্ধের মুখখানি ভরিয়া উঠিত। বাড়ি ফিরিয়া হয়ত তিনি আরও জৌলুস করিয়া এই সব কথা নানীকে বলিতেন।

আম কুড়ানো শেষ করিয়া পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে বনে বনান্তরে ঘুরিয়া বেড়াই। বাঁশের কঞ্চির দুই ধারের দুই গিরা কাটিয়া লই। সেই নলের দুই মুখে দুইটি বুনো ফল গুজিয়া দিয়া কাঠি দিয়া এক মুখের ফল অপর মুখে ঠেলিয়া দেই। ফট করিয়া শব্দ হইয়া অপর মুখের ফলটি ছিটকাইয়া যায়। একি কম আনন্দের কথা! যখন তখন অজানিতে কারও কানের কাছে যাইয়া ফটকা বাজাই। সে চমকিয়া উঠে। সেকি কম মজা! তারপর তল্লা-বাঁশ কাটিয়া বাঁশী বানাইবার ব্যার্থ চেষ্টা। তীর ধনুক বানাইয়া পাখীদের পিছে পিছে ধাওয়া করা—ইহা তো বাহ্য। সব চাইতে রোমঞ্চকর কাজ সজারুর বাসা খুজিয়া সেখান হইতে সজারুর কাঁটা লইয়া আসা। সজারু টের পাইলে আর রক্ষা নাই। ঘন বেতের ঝাড়ে বেথুল ঝুলিতেছে। আমাদের চরের দেশে বেথুলের গাছ নাই। বেথুল খাইতে কি সুন্দর টক! খোসা ছাড়াইয়া ছাড়াইয়া চালমাপা সেরের মধ্যে পুরিয়া কিছু লবন ছাড়িয়া দাও। তারপর সেরের মুখ গামছা দিয়া ঢাকিয়া বেশ খানিকটা ঝাঁকাইয়া লইয়া খাইয়া দেখ। এমন সামগ্রী কোথাও খাইয়াছ কি কোনদিন? কিন্তু যা বেতের কাঁটা! গাছের আগায় বেতের শিষগুলি লক লক করিতেছে। সামনে গেলেই কাপড় চোপরে বিঁধিয়া যাইয়া তোমাকে বনের মধ্যে জড়াইয়া ধরিবে। আর বাড়ি ফিরিতে পারিবে না। ডাকিয়া যে লোকজন জড় করিবে, এই গভীর জঙ্গলে কে কার কথা শোনে? তবু সেই বেথুল আমাদের আনা চাই। ছালাদিয়া গা ঢাকিয়া চোরের মত মাটির কাছ দিয়া যাইতে হইবে। বেথুল খাওয়ার চাইতে বেথুল তোলার মধ্যেই তো সব চাইতে আনন্দ। আর এত উত্তেজনা আর কোন কিছুতেই নাই।

রাঙাছুটু বাড়ি আসিয়াছে। শহরের দেশে তার শ্বশুর বাড়ি। সেখানে রোজ তাহারা চিনির সন্দেশ খায়। সেখান হইতে কত কেচ্ছা-কাহিনী লইয়া আসিয়াছে। ফেলি কোথায় গেলি? গরীবুল্লা মাতবরের মেয়ে সাজু কই? আসমানীকে ডাক, খোসমানিকে ডাক। রাঙাছুটু বাপের বাড়ি আসিয়াছে। আজ দুপুরে গরিবুল্লা মাতবরের পুকুর ঘাটে ঘটা করিয়া নাওয়া হইবে। রাঙাছুটুর কাছে তারশ্বশুর বাড়ির সব কথা শুনিতে হইবে।

আমাদের বাড়িতে মা কোনদিন গাঙের ঘাটে নাইতে যায় না। এ বাড়ির ও-বাড়ির মেয়েরা আমাদের বাড়ি বেড়াইতে আসে। মা কারও বাড়ি যান না। মোল্লা বাড়ির বধূর বাড়ির বার হওয়া মানা। মা কিন্তু এখানে আসিয়া এ সব কিছুই মানেন না। কাউকে দেখিয়া মাথায় ঘোমটাটিও টানেন না। গাঁয়ের সবাই তার চেনা। দুপুর না হইতেই মায়ের সখীরা নানাবাড়ি ভরিয়া ফেলে। তারপর দল বাঁধিয়া যায় গরীবুল্লা মাতবরের পুকুরে। কাঠের উপর কাঠ ফেলিয়া ঘাটলা তৈরী হইয়াছে। তাহা কত কালের শাওলা জমিয়া পিছল হইয়া আছে। খুব সাবধানে নামিতে হইবে ও রাঙাছুটু! পড়িয়া যাইবি। আয়, তোকে ধরি। মাকে আজ সবাই খাতির করে,—সমীহ করে। আমাদের বাড়িতে মায়ের এত আদর নাই কেন? কত রকম কথাই না মেয়েরা বলে জোরে জোরে কিছু বলিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে—কেউ কারো কানে কানে কি বলিয়া তাকে ধাক্কা দিয়া পানির মধ্যে ফেলিয়া দেয়। আমি তাদের এত হাসি তামাশার কারণ বুঝিতে পারি না। মার আঁচল ধরিয়া বলি, মা! চল বাড়ি যাই। মা আরও অনেক্ষণ গল্প করিয়া তবে বাড়ি ফেরেন। প্রত্যেকের কাখে একটি করিয়া ভরা কলসী। চলিতে চলিতে কলসীর পানি ঝলকাইয়া ওঠে—পায়ে ঝুমুর ঝুমুর কাসার খাড়ু বাজে।

খাইয়া দাইয়া মাথায় তেল সিদুর লইয়া (আগেকার দিনে মুসলমান বধূরা মাথায় সিন্দুর দিত—ইদানিং সিন্দুরের প্রচলন কমিয়া গিয়াছে) মা পাড়া বেড়াইতে বাহির হইবেন। আমি মায়ের আঁচল ধরিয়া। প্রথমেই ফেলিদের বাড়ি। ফেলির মা এক গোছা পান বেতের ঝাঁপিতে সাজাইয়া কাচা সুপারী কাটিয়া মায়ের সামনে আনিয়া দেয়। "এর সবগুলি খাইয়া তবে আমার বাড়ি হইতে উঠিতে পারিবে। কতদিন পরে আসিলে মেয়ে!"

সে বাড়ি হইতে হালট পার হইলেই মিঞাজানের বাড়ি। ফেলি মার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে। মিঞাজানের ঘরের কি সুন্দর দুখানা চাল। প্রত্যেকটা রুয়ার মধ্যে রাঙ দিয়া চিত্র করা। আটনে ছাটনে প্রজাপতির বাধন, শুকতারা বাঁধন। কালো বার্নিশ দিয়াছে ফুস্থির আর আটনের গায়ে, তাহার উপরে চাছা বেতের বাঁধনগুলি ঝকমক করে—ঘরের কপাটের দুই পল্লার উপর কতই না সুন্দর কারুকার্য। মাটির মেঝে। বুড়ো মিঞাজান আর তার বউ লেপিয়া পুছিয়া তক তক করিয়া রাখিয়াছে। সিঁদুর পড়িলেও তোলা যায়। ঘরের মধ্যে শিকার উপরে দুলিতেছে কত রকমের হাঁড়ি কুড়ি। এত সব থাকিতেও মিঞাজানের কিছুই নাই। একটি বেটা পুত্র নাই। খেত খামারে ধান গড়াগড়ি খায়। দুইজনে কত আর খাইবে! মিঞাজান বিড়াল পোষে। প্রায় ৫০।৬০টা বিড়াল। রাধিয়া বাড়িয়া বুড়োবুড়ি খায় আর বিড়ালগুলিকে খাওয়ায়। মিঞাজানের বাড়িতে গেলে আমার আর উঠিতে ইচ্ছা করে না। বিড়ালগুলির মধ্যে নিজেই একটি বিড়াল হইয়া উঠি। সে বাড়ি হইতে পথ বাঁকিয়া গিয়াছে মোকিমের বাড়ি। মোকিমের বউ সাজি ভরা পান, সাজি ভরা সুপারী মেলিয়া ধরে বারান্দার মাদুরের উপর। মা আর কয়টা পান খান! মায়ের দুই মুঠি পানে ভরা। আঁচলে পান সুপারী বাঁধা। রাঙাছুটু আজ দেশে আসিয়াছে। বউ-ঝিরা তোরা আয়—ও-বাড়ির বউ, সে-বাড়ির বউ, এই তো সেদিন বিবাহ হইয়াছে, তারা আসিয়া মাকে ছালাম করে। মা তাদের খোঁপা খুলিয়া নতুন করিয়া খোঁপা বাঁধিয়া দেন। আদর করিয়া কাছে ডাকেন। বিদায়ের সময় বউরা বলে, "রাঙা-বুবু আবার আসিবেন।"

এ-বাড়ি ও-বাড়ি হইতে কত মেয়ে মায়ের সঙ্গি হইয়াছে। মোকিমের বাড়ি ছাড়াইয়া সামনে হালট দিয়া আগাইয়া যাও। ওই ত তেঁতুল তলা—তারপরে বাঁশ ঝাড় পারাইয়া গেলেই বরোজদের পাড়া। সাত আট ঘর বরোজ এক সঙ্গে বাস করে। বড় বড় খড়ের আট চালা ঘর। উচু উচু দাওয়া সেখানে। বারান্দার উপরে ঘসামাজা পিতলের কলসীগুলি ঝকমক করিতেছে। তারও চাইতে ঝকমক করিতেছে বরোজদের বউগুলি। গায়ে যেন পিতলগোলা মাখাইয়া লইয়াছে। মাকে আদর

করিয়া লইয়া গিয়া তাহাদের মাঝখানে বসায়। বাড়ির গিন্নি আসিয়া এক ডালা পান দিয়া যায়। "সবগুলি না খাইয়া যাইতে পারিবে না, রাঙাছুটু! আমার বেলা, সেই ত সেদিন গেল শ্বশুর বাড়ি; থাকিলে তোমাকে দেখিয়া কত খুশী হইত!" মা গল্প করেন বরোজ বউদের সঙ্গে। আমি ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাদের পানের বরজগুলি দেখি।

যে পান মা খায়, বাজান খায়, হাট হইতে বাজার হইতে কিনিয়া আনিয়া খায়, সেই পান একটা একটা করিয়া কঞ্চি বাহিয়া উপরে উঠিয়াছে। চারিধারে পাটখড়ির বেড়া মাথার উপরেও সরু পাটখড়ির চিকন আচ্ছাদন। সুর্যের আলো যেন সবটা আসিয়া পানে পড়িতে না পারে। পানের কচি পাতায় সূর্য্যের আলো সবটা পড়িলে পান খাইতে ঝাল হইবে। কত সাবধানে পানের বর লালন পালন করিতে হয়। মাঝে মাঝে পানের পাতায় খৈল-ভিজান পানি ছিটাইয়া দিতে হয়। তাও পরিমাণ মত। বেশী দিলে পান পুরু হইয়া যাইবে। এতসব কিছু কেরামতি জানে বরোজরা। নিজের হাতে কোন কাজ করে না। মুসলমান খেতি মেহনতি লোক লাগাইয়া কাজ করায়। তারা এমন বোকা! নিজেরাই ত পানের বর করিতে পারিত। কত পয়সা পাইত বারোইদের মত আটচালা ঘর করিতে পারিত। তারা পরের পানের বরে খাটিয়া মরে। একটা দুইটা তিনটা পাশাপাশি পানের বর। চারিদিকে পাটখড়ির বেড়া। তারই ফাঁকে ফাঁকে সবুজ পাতা মেলিয়া পান গাছগুলি দেখা যায় যেন কতগুলি শ্যামলা রঙের গ্রাম্য মেয়ে। সরু পাটখড়ির চিকের আড়াল হইতে উঁকি দিতেছে।

পান বড় হইলে বাড়ির বউরা যায়, মেয়েরা যায় নরম তুলতুলে হাতে একটা একটা করিয়া বোঁটা হইতে পান ছেঁড়ে। সাবধান হইবে। আশে পাশের কচি পাতাগুলির গায়ে যেন আঘাত লাগে না। অতি আদরের সঙ্গে মেয়েরা পান পাতা তুলিয়া আনে। তারপর উঠানে বসিয়া পানের আকার অনুসারে পান সাজায়। বড় বড় দুইটা পানের মধ্যে একটা ছোট পান চুকাইয়া দেয়। এমনি করিয়া আশিটি পানে এক পন। বরোই বউরা কি চালাক! এক পণ পানের মধ্যে চল্লিশটি ছোট পান চুকাইয়া দেয়। বারোইরা হাটে যাইয়া পানগুলি এমনি মুন্সিয়ানার সঙ্গে

উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখায় যাহাতে ক্রেতাদের চোখে শুধু বড় বড় পানগুলিই পড়ে। এই পানের জন্য আমার নানার দেশের নাম তাম্বুলখানা। কত দেশে যায় তাম্বুলখানার পান। পদ্মানদী পার হইয়া ঢাকা যায়-পাবনা যায়। রেলগাড়ী চড়িয়া যায় রংপুর-দিনাজপুর আরও কত দেশে। কলিকাতাও হয়ত যায়। এমন মিঠা পান কোনো দেশে হয় না। জানি পদ্মা পারের ঢাকার জেলায় আছে ঢাকাই-পান-খুব বড় বড় পান। হইলে কি হইবে? খাইতে ঝাল, তার পাতা পাতলা। এমন না-পুরু না-পাতলা তাম্বুলখানার মিঠা পান যে খাইয়াছে সে কোনদিন ভুলিবে না। বরোইদের বরে আছে সাঁচিপান। খাইতে এনম খোশবু বাহির হয় মুখ দিয়া। নতুন বউ বরের সঙ্গে প্রথম দেখা করিতে বাটা ভরিয়া সাঁচিপান লইয়া যায়। তাম্বুলখানার বারোইরা লেখা পড়া করিয়া বড় খেতাব পায় নাই। কিন্তু তাদের বংশানুক্রমিক মেহনতের ফলে তারা আজ দেশ বিখ্যাত। এমনি কত গ্রাম বিখ্যাত হইয়া আছে এই মেহনতি মানুষের কর্ম নৈপুণ্যে। চাঁদ-পুরের কামারেরা দা কাচি একবার গড়াইয়া দিলে জিন্দেগী কাটিয়া যাইবে। তিন দিনের পথ হইতে লোক আসে তাহাদের ঘরে দা কাঁচি মড়াইতে। কেশবনগরের দই যে খাইয়াছে আর ভুলিবে না। এমনি কত গ্রাম কত রকমের কাজের জন্য বিখ্যাত হইয়া আছে।

ও দিকে গল্প করা শেষ হইয়াছে। বেলা ডুবু ডুবু। রাঙাছুটু এবার বাড়ি ফিরিবে। বাড়ি হইতে বাহির হইবার পর মায়ের পাড়া বেড়ানীর দল ক্রমেই বাড়িতেছিল—ও-বাড়ির ফেলি, সে-বাড়ির সাজু, রাঙা-বড়ু, রূপবানী আরও কত মেয়ে আসিয়া মায়ের দলে মিশিয়াছিল। এখন মা বাড়ি ফিরিতেছেন। মায়ের সঙ্গিরা যার যার বাড়ির কাছে আসিয়া বিদায় লয়। মা যেন আসমানের চাঁদ। একটি একটি করিয়া তারাগুলি এখন মাকে ছাড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু মায়ের মন আজ ভরপুর আনন্দে। ও বাড়ি সে-বাড়ি ছাড়াইয়া মা নানাবাড়িতে ঢুকিলেন। নানী তখন ঘরে সন্ধ্যা প্রদীপ দিয়েছেন।

এমনি করিয়া কোথা দিয়া বার-তেরদিন কাটিয়া গেল টেরও পাইলাম না। প্রতিদিন সামনে গরীবুল্লা মাতব্বরের পুকুরে গোছল করা হইতেছে।

প্রতিদিন বিকালে মা পাড়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। আর নানী সারাদিন বসিবা মা যে পিঠা পছন্দ করে সেই সেই পিঠা বানাইয়া, মা যে যে খাবার পছন্দ করে সেই সেই খাবার তৈরী করিয়া মাকে সাধিয়া সাধিয়া খাওয়াইতেন।

এক একদিন প্রথম রাতে ফেউ ডাকিয়া ওঠে। ফেউ ডাকিলে গৃহস্থেরা বোঝে পাড়ায় বাঘ আসিতেছে। ফেউ এর ডাক শুনিয়া বুক দুরু দুরু করে। প্রবাদ আছে, বাঘ মাঠের দুই জমির সীমানার উপর বাচ্চা প্রসব করে। যে বাচ্চাটা জমির সীমানা হইতে বাহিরে পড়িয়া যায় সেটা হয় ফেউ। আর যেটা সীমানার উপর পড়ে সেটা হয় বাঘ। বাঘের আগে আগে ফেউ আসিয়া গ্রামবাসীকে জানাইয়া যায় যে পাড়ায় বাঘ আসিতেছে। প্রকৃতপক্ষে ফেউকে বাগডাসা বলে। এরা বাঘেরই স্বগোত্রীয় আর এক জাত। তবে বাঘের মত বড় হয় না। হাঁসটা, মুরগীটা আর ছোট ছোট জানোয়ার ধরিয়া খায়। সে রাত্রে বাগডাসার ডাক শুনিয়া নানা প্রমাদ গনিলেন। তিনি প্রত্যেক দরজা খুব আঁটিয়া বাঁধিলেন। আর উঠানের মাঝখানে খুব কুণ্ডলী করিয়া আগুণ জ্বালাইয়া রাখিলেন।

শেষরাত্রে বাঘ আসিয়া নানাবাড়ির পুরধারের জঙ্গলে তর্জন গর্জন করিতে লাগিল। সে কি যেমন তেমন শব্দ। ভয়ে আমি মায়ের আঁচল টানিয়া ধরি। নানা-নানী উঠিয়া প্রদীপ জ্বালাইয়া বসিয়া রহিলেন। বাঘ জঙ্গল ছাড়িয়া নানাবাড়ির উঠানে আসিয়া গর্জন করিতে লাগিল। সেই গর্জ্জনে নানাবাড়ির ঘরগুলি কাঁপিতে লাগিল। নানার একটি পোষা কুকুর ছিল। বাড়িতে চোর-ডাকাত আসিলে সে রাগিয়া যাইয়া তাহাদের ঘাড়ে পড়িত। আজ এই বিপদের সময় প্রভুভক্ত কুকুরটি চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। সে শব্দ করিয়া বাঘের উপর যাইয়া পড়িল। সে কি ভীষন গর্জ্জন! বাঘ একবার কুকুরটিকে ছাড়িয়া যায় আবার দ্বিগুণ গর্জ্জন করিয়া তাহাকে আসিয়া ধরে। প্রায় দশ মিনিট বাঘে-কুকুরে লড়াই চলিল। তারপর কুকুরটির শব্দ ধীরে ধীরে কমিয়া আসিতে লাগিল। বাঘের গর্জ্জন আরও বাড়িতে লাগিল। তারপর আর কুকুরের ডাক শোনা গেল না।

ভোর হইবার প্রায় এক ঘণ্টা পরে নানার সঙ্গে আমরা ঘরের দরজা

খুলিয়া বাহিরে আসিলাম। তখন রাঘের গায়ের চক্করের মত থাবা থাবা রৌদ্র গাছের ফাঁক দিয়া নানার উঠানে আসিয়া পড়িয়াছে। উঠানে আসিয়া নানী কাঁদিয়া উঠিলেন, তাঁর এত আদরের পোষা কুকুরটির জন্য সমস্ত উঠান ভরিয়া ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়িয়া আছে। নানীর পোষা কুকুরটি যেন রাঙা আখরে বিদায় পত্র লিখিয়া গিয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে বাজান আসিলেন। আমার পিতাকে কোনদিন শ্বশুর-বাড়ি রাত্র যাপন করিতে দেখি নাই। খুব ভোরে রাত্র থাকিতে তিনি বাড়ি হইতে রওয়ানা হইতেন আবার ফিরিয়া যাইয়া স্কুলের কাজে যোগ দিতেন। যা কিছু খাবার আছে খাইয়া বাজান চলিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন, আর তিনদিন পরে মাকে লইয়া যাইবার জন্য—আফাজদ্দীন আসিবে। নানী কত অনুনয় বিনয় করিলেন। নানা কত রকম বুঝাইলেন, "এই ত সেদিন মাত্র আসিয়াছে রাঙাছুটু। এখনও ভাল দুইটা কিছু তৈরী করিয়া মেয়েকে খাওয়াইতে পারিলাম না। আর দিনদশেক পরে রাঙাছুটুকে নিতে আসিবেন।" বাজান কোন কথাই শুনিলেন না। বাড়িতে রান্না করিয়া দিবার লোক নাই। তাহা ছাড়া ছেলেকে ফরিদ-পুরের স্কুলে ভর্তি করিয়া দিতে হইবে। এখানে থাকিলে পড়াশুনা হইবে না। নানা বেচারা আর কি করিবেন? বাজানের কথায়ই সম্মত হইলেন। মাটিতে বড় বড় জুতার পা ফেলিয়া বাজান চলিয়া গেলেন। মনে হইল এই আঘাত যেন মায়ের বুকে আসিয়াই লাগিল। বেচারা মা'র জন্য আমার মনে বড়ই কষ্ট হইল। আরও কয়টা দিন এখানে থাকিলে বাড়িতে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হইত! এখানে আসিয়া মা আমার কত ভাল হইয়াছেন। বাড়িতে থাকিতে নানা কাজে এতই ব্যস্ত থাকিতেন যে আমাদের কাছে ডাকিয়া আদর করিতে পারেন নাই। এখানে আসিয়া সবসময় মা'র আঁচলে আঁচলে ঘুরি, এটা ওটা ভাল জিনিষ নানী মাকে দিলে মা আমাকে আগে খাওয়াইয়া তবে নিজে খান। এখানে আসিলে মা যেন সত্যিকার মা হইয়া উঠেন।

বাজান চলিয়া গেলে কে যেন মায়ের সমস্ত মুখে কালি লেপিয়া দিয়া গেল। মায়ের মুখে সেই ছোট্ট মেয়েটির মত হাসিখুশী আর দেখিতে পাই না। নানীও একাজ ওকাজ ফেলিয়া মার কাছে আসিয়া বসেন।

মায়ের সন্ত-বাঁধা মাথার খোঁপাটি খুলিয়া আবার নূতন করিয়া বাঁধিয়া দেন। পরদিন মায়ের যত জামা, কাপড়, কাঁথা, বালিশের ওয়ার, সমস্ত সোডা দিয়া সিদ্ধ করিয়া নানী ধুইয়া দিলেন। নানা মায়ের জন্য হাট হইতে একখানা নুতন কাপড় কিনিয়া আনিলেন। আমার জন্যও নূতন ছিটেরজামা সেই নূতন শাড়ী পরিয়া মা আবার পাড়া বেড়াইতে বাহির হইলেন।

মায়ের পরনে সেই নূতন শাড়ীর গন্ধ আমার কাছে কেমন করুণ লাগে। আজ আর কোন বাড়িতেই হাসিখুশী জমিল না। সবাই মাকে যেন চির-জনমের মত বিদায় দিতেছে। বুঝিতে পারিতেছি মা বহু কষ্টে চোখের পানি বন্ধ করিতেছেন। সেই ফেলিদের বাড়ি, মিঞাজানের বাড়ি, বরোইদের বাড়ি তারপর মা চলিলেন গরীবুল্লা মাতবরের বাড়ি। মাতবরের বউ যেন হিন্দু পাড়ার একখানা প্রতীমা, এমন সুন্দর দেখিতে। মাকে তিনি কত আদর করিয়া বসাইলেন। মায়ের মাথার চুল খসাইয়া তেল মাখাইয়া দিয়া আবার পরিপাটি করিয়া বাধিতে বাধিতে বলিলেন, "এত তাড়াতাড়িই যদি যাইবি তবে আসিলি কেন? তোকে ভালমত করিয়া সামনে বসাইয়া দেখিলামও না। ও রাঙাছুটু! কাল তুই আমার এখানে খাইবি। বল্ কোন্ পিঠা তোর খাইতে ইচ্ছা করে:" মা বলিলেন, "আমি ত পরশুই যাইব। ওর নানী কি আমাকে এইখানে খাইতে দিবে? আজই ত পিঠা তৈরীর জন্য মা চাল কুটিতেছেন।"

মাতবরের মেয়েটি মায়ের সমবয়সী। এমন সুন্দর দেখিতে যেন হলদে পাখিটি। মার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলে, "না রাঙা বুবু! তুমি না করিও না। আমি যেমন করিয়াই হোক চাচীর কাছে বলিয়া তোমাকে আমাদের বাড়িতে কাল খাওয়াইব।"

কাল যাইব দেশে। নানাবাড়ি আসিয়া বাঁশের বাঁশী বানাইয়াছি। তীর ধনুক বানাইয়াছি। ফটকা বানাইয়াছি। আর গহন জঙ্গল হইতে সজারুর কাঁটা সংগ্রহ করিয়াছি। সে সব যত্ন করিয়া বাঁধিয়া, খাইয়া লইয়া শুইতে গেলাম। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম এ সব দেখিয়া আমার দেশের খেলার সাথীরা কি ভাবে লোলুপ দৃষ্টি মেলিয়া আমার দিকে তাকাইবে।

এখানে আসিয়া সুপারী গাছে ওঠা শিখিয়াছি। দুই পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের সঙ্গে এক গোছা ছোট্ট দড়ি আটকাইয়া সুপারী গাছে উঠিতে হয়। সুপারী গাছের ত ডাল নাই। যদি ছেঁচড়াইয়া পড়িয়া যাইতে চাহি তবে সেই দড়িগাছির সঙ্গে আটকাইয়া দুই হাতে গাছ ধরিয়া থাকা যায়। তারপর নামিবার সময় দুই পায়ের দড়িতে একটু ঢিল দিলেই ছড়াত করিয়া নামিয়া আসা যায়। কিন্তু দুই হাতে সুপারী গাছ ধরিয়া রাখিতে হইবে। নচেৎ পড়িয়া যাইবে। এসব কৌশল দেশের ছেলেরা জানে না। আমাদের দেশে ত সুপারী গাছ নাই। কিন্তু কি করিয়া এই সপ্তলাভ করা বিদ্যা দেশের ছেলেদের মধ্যে জাহির করিব। মনে মনে ভাবিতে থাকি। আচ্ছা বড় একটা বাঁশ বাঁধিয়া ত উপরে ওঠা যায়। ভাবিতে ভাবিতে ঘুম আসে না। মা আর নানীও আজ রাত্রে ঘুমাইতেছে না। কি যে গল্প পাইয়াছে তাঁহাদের। কথার যেন শেষ হইতে চাহে না। নানীর হাতের পাখাখানা আমার মাথার উপর আর মায়ের মাথার উপর কড়াৎ কড়াৎ করিয়া ঘুরিতেছে।

পরদিন মথুরার দূত সত্যই আসিল। দুইজন বেহারা লইয়া আফাজদ্দীন আসিয়া উপস্থিত হইল। আফাজদ্দীন আমাদের বড়ই আপনজন। তার পৈত্রিক সম্পত্তি সাতে পরে জোর করিয়া খাইতেছিল। আমার পিতা তাহাকে সমর্থন করিয়া মামলা মোকদ্দমা করাইয়া তাহার সম্পত্তির পুনর্দখল করাইযাছেন। সেই জন্য এ কাজে ও কাজে আফাজদ্দীন আমাদের সাহায্য করে। এত দূরের পথ। আমি হাঁটিয়া যাইতে পারিব না। মাঝে মাঝে আফাজদ্দীন আমাকে কোলে করিয়া লইয়া যাইবে। সেইজন্য বেহারাদের সঙ্গে আফাজদ্দীনও আসিয়াছে। সোয়ারী বেহারারা আমাদের পাশের গ্রামের লোক। বহু পুরুষ হইতে আমাদের বাড়ির মেয়েরা ওদের সোয়ারীতে যাওরা আশা করে। ওরা খুবই বিশ্বাসী সোয়ারী-বেহারাদের দেখিয়া মার বুকখানা যেন ছাৎ করিয়া উঠিল। অতটুকু বয়সেই আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম।

জামাই বাড়ির দেশের সোয়ারী বেহারা। ভালমত আদর যত্ন করিলে সে দেশে যাইয়া এ দেশের সুনাম গাহিবে। বাড়ির গাইয়ের সের দুই দুধ ৩০।৪০টি মিঠা গাছের আম, কলা গুড় আর চিড়ামুড়ি

দিয়া না। ন। তাহাদের নাস্তা করিতে দিলেন। নাস্তা শেষ হইলে পিতলের হাঁড়িতে চাল ডাল নুন মরিচ আর মাগুর মাছ দিলেন রান্না করিতে। নাস্তা খাইয়া লেহারারা বলে, আর পাক করিব না। এত খাইয়াছি যে এরপর আর ভাত খাইবার পেটে জায়গা নাই। কিন্তু কে শুনিবে সে কথা। কুটুম্ব বাড়ির দেশের লোক। খাতির কারলে খাতির রাখিতেই হইবে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বেহারারা পাক করার সমস্ত বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। বেহারাদের পাকের এই সময়টুকু নানীর কাছে বড়ই মূল্যবান। যতটা সময় মেয়েকে চোখের সামনে ধরিয়া রাখিতে পারেন। বেহারাদের আরও একটা পদ বানাইতে দাও। দুইটা কুমড়ার ফুল ছিঁড়িয়া আনিয়া নানী বলেন, তেল দিয়া ভাজিয়া লইও। বাড়ি জাঙলায় কনে সাজানী সিম। এই প্রথম তুলিলাম। একটা নিরামিষ তরকারি করিয়া লও।

দেখিতে দেখিতে নানাবাড়ী ভরিয়া গেল। গরীবুল্লা মাতবরের বউ তার মেয়েকে লইয়া আসিল। ফেলি আসিল, আছিরন আসিল। মিঞাজানের বউ, মোকিমের বউ, তাহারের মা, পাড়ার সমস্ত মেয়ে আসিয়া নানীর বাড়িতে ভাঙ্গিয়া পড়িল। আজ বাঙাছুটু বাপের বাড়ি হইতে শ্বশুর বাড়ি যাইবে। এ যে বাঙালী জীবনের যুগ-যুগান্তরের বিয়োগান্তক ঘটনা। এ-দেশের কবিরা কত কাল ধরিয়া এই করুণ কাহিনী নানা গাঁথায়, কবিতায়, গানে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়েছেন। এ বিয়োগ বেদনা যে এদের, ওদের, তাদের সকলের। তাই একের ঘরের বেদনার সঙ্গে নিজের বেদনাকে মিলাইয়া ক্ষণকে সান্তনা পাইবার ব্যর্থ প্রয়াস।

মাকে সামনে বসাইয়া নানী খাওয়াইতে বসিলেন। এটা ওটা কত কি নানী রাঁধিয়াছেন। মা খাইতে চাহেননা। নানী বলেন, 'মারে, কত দূরে যাইবি। পথে ক্ষুদা পাইবে। এই তরকারিটা আরও একটু খা। এই পিঠাটা ত তুই মুখেও দিলিনা। তুই ভালবাশিস কুশলী পিঠা। তাই বানাইয়াছি। নে, আর একটা মুখে দে।" মা বলেন, "মা! তুমি আর জোর করিও না। দেখিতেছনা আর খাইতে পারিতেছি না।"

মা যে আজ খাইতে পারিবে না নানী তা জানেন—ভাল মতই জানেন। নানীও ত একদিন এমনি করিয়া বাপের বাড়ি হইতে বিদায় হইতেন। তবু পিড়াপিড়ি না করিলে যে আজ মন ভরে না।

মাকে খাওয়াইয়া চোখের পানি মুছিতে মুছিতে নানী মায়ের চুল-গুলি লইয়া বিনুনি বাঁধিতে বসিলেন। কত কথা আজ তাঁর মনে পড়িতেছে। আরও দুইটি মেয়ে ছিল নানীর। একজনের বিবাহ হইয়াছিল বাখুণ্ডাগ্রামে আর একজনের মামরুগ্দা, সেই বোয়ালমারীর কাছে। তারা একে একে কবরের ঘরে যাইয়া আশ্রয় লইয়াছে। একটি ছেলে ছিল। সেও একদিন মরনের কোলে ঢলিয়া পড়িল। বুড়োবুড়ীর অন্ধের চক্ষু একমাত্র এই মেয়েটি। মেয়ের একার সংসার। শাশুড়ী নাই—ননদী নাই। নাইয়র আনিয়া কিছুদিন যে মেয়েকে বুকের কাছে রাখিবেন তারও উপায় নাই। মেয়ের সংসার দেখে কে?

কাঁদিতে কাঁদিতে মা নানার হাট হইতে আনিয়া দেওয়া নতুন কাপড়-খানা পরিলেন। কপালে সিঁদুর দিয়া, চোখে কাজল পরিয়া মা যখন দাঁড়াইলেন মাকে বিসর্জনের প্রতিমার মত দেখাইতেছিল।

পাড়ার বন্ধু ফেলি, আছিরন এদের একান্তে ডাকিয়া আনিয়া মা বলিলেন, "দেখ, বোন! আমি চলিয়া গেলে আমার মায়ের বড় কষ্ট হইবে। তোরা আসিয়া মার কাছে বসিবি।"

তারা কাঁদিয়া বলে, "রাঙাছুটুলো, তোমার মাকে যে আমরা প্রবোধ দিব সে কথা সত্য; কিন্তু তোমার জন্য আমরা যখন কাঁদিব আমাদের প্রবোধ দিবে কে?" মা তাহাদের জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদেন। তাহারাও কাঁদিয়া বুক ভাসায়।

সোয়ারী বেহারারা তাড়া দেয়। অনেক দূরে পথ যাইতে হইবে। বেলা পড়ন্ত। শিগ্গীর সোয়ারী ঘিরিবার কাপড় দেন। কাপড়ের ভাঁজ খুলিয়া সোয়ারী ঘিরিবার সঙ্গে সঙ্গে এই দুঃখময় ঘটনাটিকে যেন বেহারারা সোয়ারীর গায় চিত্রিত করিয়া দেয়। নানা ভাঙা-গলায় বলেন, 'রাঙাছুটু! আর দেরী করিও না। সোয়ারীতে যাইয়া ওঠ।' মা প্রথমে নানাকে সালাম করেন। নানা দোয়া করেন, "কোলভরা ছেলেমেয়ে লইয়া স্বামীর ঘর উজ্জল। করিও। মিষ্টি কথা দিয়া পাড়া প্রতিবেশীদের খুশী করিও। অতিথি-মোসাফির আসিলে যত্ন করিও। সব সময় স্বামীকে খুশী রাখিতে চেষ্টা করিও।"

মা চোখের পানিতে নানার পা ভিজাইতে ভিজাইতে বলেন,

"বাজান! আমাকে দেখিতে কিন্তু গোবিন্দপুর যাইবেন। আমি পথের দিকে চাহিয়া থাকিব। আমার একটা ভাই থাকিলেও মাঝে মাঝে দেখিতে যাইত। সেই ভাই এর কাজও আপনাকে করিতে হইবে।"

গামছায় চোখ মুছিতে মুছিতে নানা বলেন, "নিশ্চয়ই যাইব। অবসর পাইলেই তোমাকে দেখিতে যাইব।"

নানীর পায়ে দুই হাত রাখিয়া মা সালাম করেন। নানী আর দোয়া করিবার ভাষা পান না। কেবল কাঁদেন। মেয়ে নানীকে বলেন, "মা! বর্ষায় নতুন পানি আসিলে বা' জানকে পাঠাইও আমাকে আনিবার জন্য। আমি বলিয়া-কহিয়া বর্ষাকালে আবার আসিব।"

নানী মাকে ধরিয়া সোয়ারীতে উঠাইয়া দেন। আমি আর আফাজদ্দীন সোয়ারীর পাছে পাছে। পাড়ার মেয়েরা, নানা নানী, সবাই সঙ্গে সঙ্গে।

গ্রামের হালট ধরিয়া সোয়ারী চলিতেছে। সামনে ছদনের বাঁশ ঝাড়, মোমিন মোল্লার ছোনের ঘর—তারপর মোকিমের বাড়ি। পথের দুই পাশে দুইটি তালগাছে বাতাস শোঁ শোঁ করিয়া ডাকিতেছে। সেই শব্দ যেন করাত দিয়া সকলের বুকে আঘাত করিতেছে। এখানে আসিয়া নানা, ইঙ্গিত করিয়া সকলকে থামাইলেন। আস্তে আস্তে সোয়ারী চলিতে লাগিল। সোয়ারীর কাপড় তুলিয়া মা একদৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। তারপর যখন গাঁয়ের মোড় ঘুরিয়া সোয়ারী গাছের আড়ালে পড়িল, মা বাপের গ্রাম আর দেখা যায়না, মা সোয়ারীর আবরণ ছাড়িয়া দিলেন। একটি বিয়োগান্ত কাহিনীর যেন যবনিকা পাত হইল।

এরপরে বহুবার মায়ের সঙ্গে নানাবাড়ি আসিয়াছি। বর্ষাকালে আসিয়াছি নৌকা করিয়া। বউঘাটা পার হইয়া গাছবাইড়ার চক। এপার হইতে ওপার দেখা যায় না। শুধু ধান ক্ষেত। শুকনার দিন কোন পথিক এই চক পাড়ি দিতে ভয় পায়। যদি পিপাসা পায় বুকের ছাতি ফাটিয়া মারা যাইবে। পথে কোথাও একটি গাছ নাই। সেই গাছবাইড়ার চক পার হইলে ভাটপাড়া। তারপর একখানা চক পাড়ি দিলে তাম্বুলখানা, আমাদের বাড়ি হইতে দিনমানের পথ। সকালে রওয়ানা দিয়া সন্ধ্যায় আসিয়া পৌঁছা যায়।

নানাবাড়িতে আসিয়া তাল খাইয়াছি। সেই তালের আটি নানী ছাই-এর গাদায় পুতিয়া রাখিয়াছেন। তাহার মধ্যে শাঁস হইলে দা দিয়া কাটিয়া সেই শাঁস লইয়া নানা আমাদের বাড়ি আসিয়াছেন। নানাবাড়িতে আসিয়া ঢ্যাপ (শাপলা) কুড়াইয়াছি। সেই ঢ্যাপ নানী ছাই দিয়া ডলিয়া শুকাইয়া রাখিয়াছেন। নতুন ঢ্যাপের বীজ খই হয় না। বারবার নেহারে ভিজাইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া দুই তিনমাস পরে তাহা দিয়া খই ভাজা যায়। শীতকালে সেই ঢ্যাপের খই করিয়া নতুন গুড় দিয়া মোয়া বাধিয়া নানী নানাকে দিয়া আমাদের বাড়ি পাঠাইয়াছেন। একবার নানাবাড়িতে যাইয়া হাট হইতে আখ কিনিয়া আনিয়াছিলাম। আখের ডগা (মাথা) নানী বাড়ির পালানে পুতিয়া দিয়াছিলেন। বর্ষাকালে সেই গাছে বড বড আখ হইল। বুড়ো মানুষ নানা। তবু অত দূরের পথে দুই তিনখানা আখ কাঁধে করিয়া নানা আমাদের বাড়ি আসিয়াছিলেন। এসব ছোটখাটো জিনিসের মধ্যে কতখানি যে মমতা মাখন ছিল তখন বুঝিবার বয়স হয় নাই। এখন ভাবিয়া চোখে জল আসে। মানস নয়নে যেন দেখিতে পাই সেই সুদূর জঙ্গল-ঘেরা তাম্বুলখানা গ্রাম হইতে নানা দুই তিনখানা বড় বড় আখ কাঁধে করিয়া আমাদের গোবিন্দপুর গ্রামে আসিতেছেন। পথ-শ্রমে ক্লান্ত হইয়া হয়ত কোন গাছের তলায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, আর মনে মনে নিজের মেয়েটির কথা—ছোট ছোট নাতিদের কথা চিন্তা করিতেছেন। এখন আর তাঁর পথশ্রমকে পথশ্রম বলিয়া মনে হইতেছে না। যত তাড়াতাড়ি পারেন আবার পথে চলিয়াছেন। নানাকে আসিতে দেখিয়াই আমরা তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছি। "নানা! কি আনিয়াছেন? কি আনিয়াছেন?" নানা কাঁধ হইতে বড় বড় গেণ্ডারী আখগুলি আমাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। কত আনন্দ করিয়াই না সেই আখগুলি খাইয়াছি। সেই ঢ্যাপের খই এর মোয়া খাইতে খাইতে নানীর কত আদরের কথা মনে পড়িয়াছে।

সেবার নানীবাড়ি গেলাম। বোধ হয় জ্যৈষ্ঠমাসে। নানী কত আদর করিয়া আমাদের গ্রহণ করিলেন। মা নানীকে দেখিয়া বলিলেন, "মা! তোমার শরীর এবার বডড খারাপ হইয়াছে। আমাদের জন্য এটা

ওটা পিঠা বানাইয়া আর খাটিতে পারিবে না।" নানী কি তাই শোনেন! আজ বানান পাকান পিঠা, কাল বানান চিতই পিঠা। যে যে খাবার মায়ের পছন্দ, নানী কত যত্ন করিয়া সেই সেই খাবার তৈরী করেন। তারপর রাত ভরিয়া মেয়ে আর মায়ের কথা। সে কথা কি নানীর ফুরাইতে চাহে? সকালের মোরগ যখন ডাকে তখনও জাগিয়া উঠিয়া শুনি তাঁদের কথা শেষ নাই। সেই কবে আমাদের দেশ হইতে ভিখারী আসিয়াছিল। তার নিকটে নানা, শুনিল রাঙ্গাছুটুর শরীর ভাল নাই। দেশের জমিতে ধান জন্মে নাই। জামাইকে কিনিয়া খাইতে হয়। নানী নানীকে বলিয়া দুইটি ঘোড়া বোঝাই ধান গোবিন্দপুর পাঠাইয়া দিলেন। এ দেশ হইতে বুনো মেয়েরা ওদেশে ভিক্ষা করিতে যায়। তাহাদের তিন তিন সের চাউল দিয়া নানী বলিয়া দিয়াছেন, রাঙাছুটুকে যেন দেখিয়া আসে। মা বলিলেন, "সেই বুনো-মেয়েরা আমাকে একছড়া পুঁতিরমালা দিয়া আসিয়াছিল। মা! তুমি কি সুন্দর করিয়া পুঁতির মালা গাঁথিতে পার? গলায় পড়িলে যে দেখে সেই তারিফ করে।" শুনিয়া কত তৃপ্তিতে যেন নানীর মন ভরিয়া গেল! সেকালে চিঠি লেখার প্রচলন ছিল না। ভিখারিদের সামান্য কিছু ভিক্ষা বেশী দিয়া মায়ের সঙ্গে নানীর খবরা-খবরের আদান-প্রদান হইত। আমাদের গাঁয়ের পাশে শোভারামপুরে ছিল তিন চারজন ভিখারীণী। তাহাদের বলিয়া-কহিয়া মাঝে মাঝে মা নানাবাড়ির দেশে খবর পাঠাইতেন। তাহারা যখন ফিরিয়া আসিত কি আগ্রহে মা তাহাদের কাছে নানা প্রশ্ন করিয়া তাঁর মা-বাপের খবর শুনিতেন। শুধু কি নানা-নানীর কথা! নানাবাড়ির নারকেল গাছে কি রকম ডাব ধরিয়াছে। সিঁদুরে-আমের গাছে কিরূপ মুকুল ধরিয়াছে। ফেলিরা কেমন আছে, মাতবরের মেয়ে আমার কথা কিছু জিজ্ঞাসা করিল নাকি? এমনি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া মা তাঁর বাপের বাড়ির সব কিছুকে যেন পটে আঁকিয়া লইতেন।

সেদিন নানী যাইবেন পিঠার জন্য চাউল কুটিতে। মা কত বারণ করিলেন, "তোমার শরীর খারাপ। কিছুতেই তুমি এত চাউল কুটিতে পারিবে না।" নানী কি বারণ শোনেন? মা তখন বলিলেন, "মা!

তুমি তবে আলাও। আমি ঢেঁকীতে পার দেই। নইলে কিছুতেই তোমাকে ঢেঁকীর উপর যাইতে দিব না।" অনেক বাদ-প্রতিবাদের পরে নানী পিঠার গুঁড়া আলাইতে রাজী হইলেন। দুপুর বেলা চাউল কোটা আরম্ভ করিয়া প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল। আর সামান্য কয়টা চাউল আছে। কয়েক পার দিলেই গুঁড়া হইয়া যাইবে। এমন সময় অসাবধানে ঢেঁকীর একটি পার নানীর হাতের একটি আঙুলে লাগিয়া আঙুলটি ছেঁচিয়া গেল। পাছে মা দুঃখ পান, নানী সেই হাতের ব্যথায় একটুও আহা-উহু করিলেন না। সেই ছেচা হাত হইয়াই নানী মায়ের জন্য পিঠা তৈরী করিয়া আমাদের খাওয়াইলেন, মাকে খাওয়াইলেন নানী কিছুই খাইলেন না। পরদিন হাতের ব্যথায় নানীর ঘোর জ্বর হইল। সেই জ্বরে তিন চারদিন নানী কত কষ্ট পাইলেন কিন্তু সেজন্য একটুও আহা-উহু করিলেন না। আমরা কয়েকদিন পরে চলিয়া যাইব। আমাদিগকে যে নানী এটা-ওটা তৈরী করিয়া খাওয়াইতে পারিতেছেন না, ইহাই নানীর সব চাইতে দুঃখ। মা কেবল নানীর কাছটিতে বসিয়া থাকেন। নানী বলেন, 'নারে রাঙাছুটু! তুই আর কয়েকদিনই বা আছিস। যা, পাড়ায় বেড়াইয়া আয়—ফেলিদের বাড়ি যা—গরীবুল্লা মাতবরের মেযেকে দেখিয়া আয়।" মা কথা শুনেন না। নানীর কাছটিতেই বসিয়া থাকেন। মা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এই অসুখ হইতেই নানী আর সারিয়া উঠিবেন না। শেষ দিনে নানী আর কথা বলিতে পারিলেন না। কেবল চাহিয়া চাহিয়া মাকে দেখিতে লাগিলেন। আর দুইটি চোখ হইতে ফোটায় ফোঁটায় পানি ঝরিতে লাগিল। হয়ত বুঝিয়াছিলেন, নানী চলিয়া গেলে এই অভাগিনী মেয়েটিকে আদর করিবার আর কেহ থাকিবেনা।

তখন বনের মাথায় রৌদ্রে মাখাইয়া দিন-শেষের সূর্য অস্তপারের দিকে পা বাড়াইয়াছে। গাছের শাখায় পাখিগুলির গান নীরব হইয়া আসিতেছে। এমন সময় নানী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ঝিনুকে করিয়া মা পানি লইয়া নানীর মুখে দিতে গেলেন। পানি গড়াইয়া পড়িয়া গেল! চীৎকার করিয়া মা কাঁদিয়া উঠিলেনঃ "আমার এত আদরের মা আর ঘুম হইতে জাগিবে না। রাঙাছুটুর খবর লইতে

আর এ-গাঁও হইতে ভিখারিণীদের কেহ গোবিন্দপুর পাঠাইবে না। আর কোনদিন এ-গাঁও হইতে ঢ্যাপের মোয়া গোবিন্দপুরে যাইবে না। মা! তুমি একবার চাহিয়া দেখ, তোমার যত্নের বুনান সেই পুঁতির মালা এখনও আমি গলায় পরিয়া আছি। কেমন মানাইয়াছে আর একবার বলিয়া যাও।"

আমার মায়ের কান্দনে পাড়া-প্রতিবেসীরা মাকে বুঝাইতে আসিয়া নিজেরাই কাঁদিয়া বুক ভাসাইল। আজ ভাবিয়া বড়ই দুঃখ লাগে বিনা চিকিৎসায় আমার নানী মারা গেলেন। এখন সেপটিক হইলে কত রকমের ওষুধে তাহা নিরাময় করা যায়। তখনকার দিনে কি সামান্য অসুখে মানুষকে মৃত্যু বরণ করিতে হইত!

নানীর ফাতেহা শেষ হইলে আমরা দেশে ফিরিলাম। আজ আর সোয়ারীর সঙ্গে সঙ্গে মোকিমের বাড়ি পর্য্যন্ত নানী আসিলেন না। শুধু সেই তালগাছটা অবধি আসিয়া নানা চোখের পানি মুছিলেন।

নানী মরিয়া গেলেন নানার একার সংসার চলে না। কে তাঁকে রাঁধিয়া দেয়? কে তার বারোমাসের বারো ফসলের তদ্বির-তালাসী করে! নানা নিজে হাল কৃষাণী করিতেন না। যা জমিজমা ছিল তাই বর্গা দিয়া যে ফসল পাইতেন একা আর কত খাইবেন? নানার সংসার বড়ই আগুছাল হইয়া পড়িল। পাড়া পড়শীর কথামত একটি বিধবা মেয়েকে নানা নিকা করিয়া ঘরে আনিলেন।

প্রায় পাঁচ ছয় মাস এই বিধবাটি নানার সংসার করিয়াছিল। তারপর নানার জমান সমস্ত টাকা পয়সা লইয়া একদিন গভীর রাত্রিকালে ঘরে আগুন দিয়া মেয়েটি পালাইয়া যায়। নানা একেবারে সর্বস্বান্ত হইলেন। এই খবর ভিখারীদের মারফৎ পাইয়া মা কত কাঁদিলেন।

নানার এক বৃদ্ধ বোন ছিলেন ফজার মা বুড়ী। তাঁকে লইয়া নানা আবার নূতন করিয়া সংসার পাতিলেন। সেই বড় বড় ঘরগুলির মত ঘর আর উঠিল না। কার জন্যই বা নানা আর বড় ঘর করিবেন। বেটা নাই, পুত্র নাই। একমাত্র মেয়ে। সে ত আর বনগাঁয়ের দেশে কোনদিন ঘর করিতে আসিবেনা।

ফজার মাকে লইয়া নানার প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর কাটিয়া গেল। বুড়ো বুড়ির দিন কোন রকমে কাটে। হঠাৎ নানার পেটে পাথর হইয়া

প্রস্রাব বন্ধ হইয়া গেল। বাজান খবর পাইয়া আট বেহারার পাল্কীতে করিয়া নানাকে চিকিৎসা করাইবার জন্য আমাদের বাড়ি লইয়া আসিলেন নানা পাল্কী হইতে নামিয়া পাঁচশত টাকার একটি খুতি মায়ের হাতে দিলেন। তখনকার দিনে ফরিদপুরে তেমন বড় ডাক্তার ছিলনা। মেডিকেল স্কুলের পাশ শ্রীধর ডাক্তার ফরিদপুর হাসপাতালের সাব-এ্যাসিসটেন্ট সার্জন। তিনিই ছিলেন আমাদের অঞ্চলে সব চাইতে বড় ডাক্তার। আমাদের বাড়ি হইতে ফরিদপুর দুই মাইল পথ। তখনকার দিনে কোন গাড়ি ঘোড়া চলিবার তেমন রাস্তা তৈরী হয় নাই। ডাক্তার আসিতেন-যাইতেন পাল্কীতে করিয়া। তাহাতে চার টাকা করিয়া লাগিত। ডাক্তার ফি লইতেন আরও চার টাকা। প্রতিদিন ডাক্তার আসিয়া সলি দিয়া নানাকে প্রস্রাব করাইয়া যাইতেন। সেটা হয়ত ১৯০৮ সাল কিংবা তারও আগে। পেটে পাথর হইলে অপারেশন করিয়া সারাইতে পারেন সেরূপ ডাক্তার বোধ হয় আমাদের অঞ্চলে তখন ছিল না। ডাক্তার আসিলে নানা বড়ই সুস্থ বোধ করিতেন। ডাক্তার যাইতে চাহিলে নানা ডাক্তারকে বলিতেন, "ডাক্তার বাবু! আপনি আর একটু বসিয়া যান। আপনাকে দেখিলে আমার যন্ত্রনা কমিয়া যায়।" ডাক্তার আরও একটু অপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাইতেন।

স সারের কাজ করিয়া মা নানার কাছে বসিবার সুযোগ করিতেন। নানার পায়খানা, প্রস্রাব পরিস্কার করিতেন। বাজান নানার চিকিৎসার জন্য নিজের সাধ্যেরও অতীত করিয়াছেন। বেদামা, ডালিম, মিছরি যা যা ডাক্তার নানাকে খাইতে বলিয়াছেন, বাজান তাহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। প্রায় ১৫৷১৬ দিন চিকিৎসার পর নানার অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাইতে লাগিল।

শেষ দিনে নানা মাকে ডাকিয়া বলিলেন, "রাঙাছুটু! দেখ ত আমার নাকটা যেন হেলিয়া পড়িয়াছে। আমি চোখে যেন কি দেখিতেছি।" সকল বুঝিয়াও মা বলিলেন, "না বাজান! আপনার নাক ত ভালই আছে। কে বলে যে হেলিয়া পড়িয়াছে?"

নানা বলিল, "মা! তোর ঘর-সংসারের কাজ তাড়াতাড়ি সারিয়া আমার কাছে আসিয়া বস! আমার যেন কেমন ভয় ভয় করিতেছে।"

মা সমস্ত কাজ ফেলিয়া নানার কাছে আসিয়া বসিয়া রহিলেন! সন্ধ্যা হয় হয়, নানা বলিলেন, "মা! তুমি ভয় করিও না। আমার যেন চীৎকার করিয়া ডাক ছাড়িতে ইচ্ছা হইতেছে।" মা নানাকে জড়াইয়া ধরিলেন। নানা বলিলেন, "মারে! বাপের বড়ির সমস্ত মায়া মহব্বৎ সঙ্গে লইয়া আমি চলিয়া যাইতেছি। সে দেশে যাইয়া যে কিছুদিন বুক জুড়াইবি তার কোন ব্যবস্থাই আমি করিয়া যাইতে পারিলাম না।" আমার পিতা সামনে বসা ছিলেন। কাছে ডাকিয়া বলিলেন, "আমি মরিয়া গেলে আমার রাঙাছুট্‌র খবর লইতে আর কেহ তাম্বুলখানা হইতে আসিবে না। আমার বিশয সম্পত্তি সবই তোমরা পাইবে। তাই দিয়া আমার রাঙাছুট্‌কে যত্নে রাখিও। ও আমাদের বড় আদরের মেয়ে।"

আরও যেন কি বলিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু বলিতে পারিলেন না। কেমন একটা মুখভঙ্গী করিয়া নানা চির-নীরব হইলেন। আমার মায়ের বুকফাটা কান্নায় আকাশ-বাতাস ধ্বনিত মথিত হইয়া উঠিল। "আর ত বাজান রাঙাছুট্‌র খবর লইতে সেই তাম্বুলখানা হইতে গোবিন্দপুর আসিবেন না। আর ত চাদরের খোটে তিলের-পাটালী লইয়া আমার আদরের বাপ রাঙাছুট্‌র খোঁজ লইবেন না। ও বাজান! বলিয়া যান, একধামা ধান বেশী দিয়া কার খবর লইতে আবার আমি ভিখারীকে তাম্বুলখানা পাঠাইবে!"

আমাদের কুলগাছ তলায় যেখানে আমার বড়বোন বড়ুকে কবর দেওয়া হইয়াছিল তারই একপাশে নানাকে কবর দেওয়া হইল। বড়ুকে নানা বড়ই ভালবাসিতেন; মরিয়া তাঁর আরের নাতনীকে তিনি ফিরিয়া পাইবেন কি না কে জানে!

প্রতিদিন শেষরাত্রে উঠিয়া মা কাঁদিতে বসিতেন। মায়ের কান্নায় আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। আমার যেন কেমন অসোয়াস্তি বোধ হইত। বাজান মাকে বকিতেন। মা কিন্তু তা গ্রাহ্য করিতেন না।

সকল দুঃখেরই শেষ হয়। কিন্তু তাহার দাগ অন্তর হইতে মোছে না। সেই দাগ বুকে আঁকিয়া মাকে আবার ঘর-সংসারের কাজ দেখিতে হইল। পরবর্তীকালে মা তাঁর কোন অন্তরঙ্গ লোক পাইলে নানার মৃত্যু-কাহিনী অতি করুণ করিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতেন। মায়ের

বলার সে কি ভঙ্গী। মা যেন কথা বলিতে বলিতে ছবি আঁকিয়া যাইতেন। তারই কিছুটা এখানে লিখিয়া রাখিলাম।

নানার মৃত্যুর ১৫।১৬ দিন পরে নানার একমাত্র বোন ফজার মা আমাদের বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অসুস্থ ভাইকে পাল্কীতে করিয়া পাঠাইয়া এই বৃদ্ধা মহিলা দিনের পর দিন গণিয়াছেন আর পথের দিকে চাহিয়া থাকিয়াছেন। "কবে ভাই সুস্থ হইয়া ফিরিয়া আসিবে?" হয়ত ভিখারীদের মারফৎ ভাই-এর খবর লইতেও চেষ্টা করিয়াছেন। ভিখারীরা হয়ত জানিয়াও এই শোকের সংবাদ তাঁকে দেয় নাই। সেই সুদুর তাম্বুলখানা গ্রাম হইতে বৃদ্ধা মাত্র একখানা লাঠি হাতে করিয়া পথে পথে বহুবার জিড়ান দিয়া আমাদের বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

"রাঙাছুটু! আমার ভাই কোথায়?" মা কোন রকমে চোখের পানি গোপন করিয়া বলেন, "ফুপু! তোমার ভাই ভাল আছেন। ও-ঘরে ঘুমাইতেছেন। তুমি এখন শব্দ করিও না। হাত পা ধুইয়া কিছু খাও। পরে ভাই-এর কাছে যাইও।"

হাত পা ধুইয়া ফজার মা কিছু খাইলেন। তারপরই মাকে বলিলেন, "রাঙাছুটু! আমার ভাই কোন ঘরে আমাকে সেখানে লইয়া যাও।"

মা বলিলেন, 'ফুপু! তোমার ভাই ও-ঘরে খুবই অসুস্থ। আজকের রাত্রের মত তুমি এ-ঘরে ঘুমাও। কাল ভোর হইলেই তোমাকে তাঁর কাছে লইয়া যাইব।"

ফজার মা উত্তর করিলেন "রাঙাছুটু! আমাকে ভুলাইও না। তবে কি সত্য সত্যই আমার ভাই ফুরাইয়া গিয়াছে। আমি যে আজ রাতে খারাপ স্বপ্ন দেখিয়াছি। একখানা সাদা পথ ধবধব করিতেছে। সেই পথ দিয়া আমার ভাই কোথায় চলিয়া গেল। আজ ভোর না হইতেই ভাই-এর খোঁজে তাই বাড়ির বাহির হইয়াছি। রাঙাছুটু, জলদী করিয়া বল, আমার ভাই কি বাঁচিয়া আছে?"

মা তখন ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। বুড়ী সবই বুঝিতে পারিয়া মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সারারাত মা আর ফজার মা নানার জীবনের অতীত কাহিনী লইয়া আলোচনা করিয়া

কাটাইলেন। ভোর না হইতে নানার কবরে বসিয়া বুড়ি ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এরপর বুড়িকে কে দেখাশুনা করিবে? সেই জন্ত-শূন্ত ভিটার উপর বুড়ি একা কি করিয়া থাকিবেন? আজ তাঁর এত আদরের ফজা যদি বাঁচিয়া থাকিত!

মা, বাজান বুড়িকে বৃথা সান্তনা দিতে লাগিলেন। মা বলিলেন, "ফুপু! আর তোমার তাম্বুলখানা যাইযা কাজ নাই। তুমি এখানেই থাকিয়া যাও। আমার ছেলেদেব দেখাশুনা করিও। দু'মুঠা ভাত তোমাকে আমিই দিতে পারিব।"

এ কথায় কি বুড়ীর ভাই-এব শোকেব অবসান হয? সেই কতকাল আগে কোথায় বুড়ীর বিবাহ হইযাছিল তাহা আজ আবছার মত মনে ভাসে। তারপর জীবনের সুদীর্ঘ ৭০ বৎসর ভাই এর বাড়িতে আসিযা বুড়ী নূতন করিয়া সংসার পাতিয়াছেন। ভাই-এর সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজের জীবনকে মিলাইযা লইযাছেন। আজ সেই ভাইকে তিনি ভুলিবেন কেমন করিযা? কত কথা আজ বুড়ীব মনে পড়ে। একবার ভাই তালগাছের ডোঙায় চড়িয়া বর্ষাব দিনে কোথায বেড়াইতে গিয়াছিল, হঠাৎ তালগাছের ডোঙা উল্টাইয়া ভাই পড়িযা প্রায। যায সারাদিন একটা লগী ধরিয়া ভাই সেই সাঁতার পানিতে দাঁড়াইয়াছিল। কাহারা সেই পথে যাইতে বাঁশের লগীটা নড়িতে দেখিযা ভাইকে নৌকায় উঠাইয়া বাঁচাইয়া তোলে। সেদিন ত ভাই মরিল না। ফরিদপুর শহরের এত সুনাম। ডাক্তার-বৈদ্যেরা মরা মানুষ জ্যান্ত করিতে পারে। তবে বুড়ীর ভাইকে তাহারা রোগ হইতে সারাইতে পারিল না কেন? কবে বুড়ীর ছেলে ফজর মরিয়া গিয়াছে। তাহার কথা আজ নূতন করিয়া বুড়ীর মনে পড়ে। বুড়ীকে সান্তনা দেওয়ার ভাষা কেহ খুঁজিয়া পায় না।

তবুও কিছুদিন কাঁদিয়া-কাটিয়া বুড়ীর শোক কিছুটা প্রশমিত হইল। ঠিক হইল বুড়ী আর তাম্বুলখানা ফিরিয়া যাইবেন না। যে কয়দিন বাঁচিয়া থাকিবেন আমাদের বাড়িতেই থাকিবেন।

কিন্তু এক পরিবেশের ভিতর হইতে অপর পরিবেশে আসিয়া বুড়ী কিছুতেই নিজেকে মানাইয়া চলিতে পারিতেছিলেন না। সেই আম-

গাছগুলি, সেই নারকেল গাছ দুটি, এরা ত বুড়ীর সঙ্গে সঙ্গে আসে নাই। পাড়ার সেই বউ-ঝিরা, বুড়ীর সুখ-দুঃখের কত আপনার হইত। এ-দেশের বউ-ঝিরা ত তেমন করিয়া আপনজন হইযা উঠিল না! তাছাড়া আমরা কয়েক ভাই মিলিয়া বুড়িকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলাম। বুড়ী কোন জিনিস রান্না করিলে আমরা খাইয়া ভাল বলিতাম না। আর বৃদ্ধ বয়সে তিনি কি আগের মত রাঁধিতে পারিতেন? আমার বড় ভাই বুড়ীকে আরও জ্বালাতন করিতে লাগিলেন। বুড়ী থালা বাসন মাজিযা দিলে সেই থালা বাসনে তিনি খাইতেননা। তাম্বুলখানার নির্জন বাড়িতে বহুদিন কাটাইযা বুড়ী ছেলেপেলের গণ্ডগোল শছন্দ করিতেন না। আমাদের বিরুদ্ধে প্রায়ই মাযের কাছে নালিশ করিতেন। তাহাতে আমরা বুড়ীকে আরও অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতাম।

এরপরে একদিন বুড়ী মাকে ডাকিয়া বলিলেন, "রাঙাছুটু! তুমি কিছু মনে করিও না। আমি আবার তাম্বুলখানা ফিরিয়া যাইব।" মা আর কি মনে করিবেন! বিদাযের দিন বুড়ী সেই লাঠিখানা হাতে লইয়া সকাল বেলা তাম্বুলখানার পথে রওয়ানা হইলেন। যাইবার আগে ভাই-এর কবরের সেই কঠিন মাটি চোখের পানিতে ভিজাইয়া দিয়া গেলেন। কিন্তু আমাদের বালক কালের নিষ্ঠুর মন সেই চোখের পানিতে ভিজিলনা।

আজ ভাবিতে ধিক্কারে সমস্ত মন ক্ষত-বিক্ষত হইতেছে। তখন হয়ত বুঝিবার বয়স হয় নাই। কিন্তু মুরুব্বীরা যদি আমাদের ভালমত শাসন করিয়া এই বৃদ্ধ মহিলাটির প্রতি অনুকম্পাশীল হইবার শিক্ষা দিতেন, তবে আজ এই কাহিনী লইয়া এত অনুতাপ করিতে হইত না। আমার পরবর্তী জীবনে কত বয়ঃবৃদ্ধ লোকের সেবা করিয়া তাঁহাদের আশীর্বাদের পাত্র হইয়াছি। শিশুদের মত বৃদ্ধলোকদের দেহেও এক সুন্দর শোভা বিস্তার করে। কত বৃদ্ধের মধ্যে সেই শোভা দর্শন করিয়া মুগ্ধ হই। কিন্তু এই অসহায়া বৃদ্ধা মহিলার প্রতি শৈশবে যে অবিচার করিয়াছি তাহার স্মরণ এখনও আমাকে ক্ষত-বিক্ষত করে।

ফজার মা একখানা বাঁশের লাঠি হাতে লইয়া সেই সুদূর তাম্বুলখানা গ্রামে রওয়ানা হইলেন। আজ মানস-নয়নে দেখিতে পাইতেছি, আশা-

হীন, অবলম্বনহীন সেই বৃদ্ধা চলিয়াছেন সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া—সেই শোভারামপুর, গোয়ালচামট, বদরপুর, তারপর ভোমরাকান্দি। দুপুরের খর রৌদ্র মাথার উপরে অগ্নিবর্ষণ করিতেছে—পথের শ্রান্তিতে পা দুখানা হয়ত আর চলিতে চাহে না। এ গাছে তলায় ও-গাছের তলায় জিড়াইয়া বৃদ্ধা চলিয়াছেন সেই বাঘ-ডাকা, বিষাক্ত সাপের খোড়লে ভরা তাম্বুলখানা গ্রামের একপাশে আম-কাঁঠালের শাখায় ঘেরা একখানা কুঁড়েঘরের আশ্রযের আশায!

ইহার পরে একবার আমার বড ভাই তাম্বুলখানা গ্রামে গিয়াছিলেন বুড়ীকে দেখিতে। বুড়ী কত খুঁটিযা খুঁটিযা আমার মাযের কথা, আমাদের কথা বড় ভাইকে জিজ্ঞাসা করিযাছিলেন। নিজে যে পারেন না, তবু বহু কষ্টে পিঠা বানাইয়া, মুরগী রান্না করিযা বড় ভাইকে খাওয়াইয়াছিলেন। আমার পিতাও মাঝে মাঝ বুড়ীকে দেখিতে যাইতেন।

একবার মাযের সঙ্গে আবার তাম্বুলখানা গ্রামে গেলাম। বুড়ী তখন বাঁচিযা আছেন। কি আদরই না কনিলেন আমাদিগকে।

কিন্তু সেই আগের তাম্বুলখানা যেন কোথায কোন অন্ধকারে মিশিয়া গিয়াছে। দেশে পাটের নূতন চাহিদা হওযায চাষীরা জঙ্গল কাটিয়া সেখানে পাটের ক্ষেত করিযাছে। সেই নাভিওযালা আমের গাছ, সিদুরে-আমের গাছ আর রাশি রাশি আম ডালে ডালে সাজাইয়া পথিকের মন আকর্ষণ করে না। সমস্ত কাটিয়া, সাফ করিয়া চাষীরা সেখানে পাট বপন করিয়াছে। বনের মধ্যে যেখানে বাঘ থাকিত, দিনে যেখানে অতি সন্তর্পণে যাইয়া আমরা ঘন বেত-ঝাড় হইতে বেথুল তুলিতাম; আঁকসী দিয়া উঁচু ডাল হইতে কানাই-লাঠি পাড়িতাম, মাকাল ফল পাড়িতাম সেখানে এখন পাট খেত। আজ গ্রামে বাঘের নয় নাই—সাপের ভয়ও কতকটা অন্তর্হীত হইয়াছে। কিন্তু সাপের বাঘের চাইতেও সহস্র গুণে হিংস্র ম্যালেরিয়া জর আসিয়া গ্রামের প্রায় সবগুলি মানুষকে গ্রাস করিয়াছে। যাহারা বাঁচিযা আছে তাহারাও পেটভরা প্লিহা ও হাড়-কাঁপুনি জর লইয়া কোন রকমে মরণের অপেক্ষায় বসিয়া আছে। গরীবুল্লা মাতবর কবে মরিয়া গিয়াছে। সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন তাঁর স্ত্রীকে, আর তাঁর সেই ফুটফুটে রাঙা মেয়ে বড়ুকে। ছেলে নেহাজদ্দী

পেটভরা প্লীহা-লিভার লইয়া কোন রকমে বাড়ির ঘরখানায় সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালায়। মোকিমের বাড়িতে কেহই জীবিত নাই। তাহার বাড়ির সামনের তালগাছ দুইটি আগের মতই শূন্য আকাশে শাখা মেলিয়া বাতাসের সঙ্গে শোঁ। শোঁ। করিয়া কান্না করিতেছে। মিঞাজান কবে মরিয়া গিয়াছে। তার বউ কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তাহাদের আদরের বিড়ালগুলি কতক আহার অভাবে মরিয়া গিয়াছে। বাকীগুলি জীর্ণ শীর্ণ দেহ লইযা ম্যাও ম্যাও শব্দে আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করিতেছে।

বরোইদের সেই পানের বর অর্ধেক ভাঙিয়া পড়িয়াছে। বরোইবাড়ির সেই সুন্দর বউ ঝিরা কেহই আজ বাঁচিয়া নাই। বৃদ্ধ কেশব ভদ্র কবে শোক-কাহিনীর সাক্ষী হইযা প্রতি সন্ধ্যায গৃহকোণে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালাইয়া দিয়া এখনও নিজে যে বাঁচিয়া আছে তাহাই প্রমাণ করিতেছে।

আমার মায়ের আজ দুঃখের অন্ত নাই। এত আদরের বাপ-মা আজ কোথায় চলিয়া গিযাছেন। নানীর কবরে বসিয়া মা কত কাঁদিলেন। ফজার মা পাশে বসিয়া মায়ের চোখ আঁচল দিয়া মুছাইতে মুছাইতে নিজেও কাঁদিয়া সারা হইলেন। কয়েকদিন এ-ভিটায ও-ভিটায় ঘুরিয়া মা বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। ইহার কিছুদিন পর, খবর আসিল ফজার মা বুড়ী মারা গিযাছে। আগে হইতেই তাঁর কাপাইয়া জ্বর আসিত। তাই লইয়া কোন রকমে এক বেলা রান্না করিযা দুই বেলা খাইতেন। সেদিন অনেক বেলা হইলেও ফজার মা ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন না, তখন পাড়া-প্রতিবেশীরা ঘরের দরজা ভাঙিয়া দেখি ফজার মা মরিয়া আছে। আহা, মরিবার আগে হয়ত একটু পানি পানি করিয়া বুড়ী কত চিৎকার করিয়াছিলেন। হয়ত কাউকে দেখিবার জন্য কত ডাকাডাকি করিয়াছিলেন। যখন কেহই তাঁর ডাকে আসিয়া সাড়া দেয় নাই, মৃত্যু আসিয়া তাঁহাকে লইয়া গিয়াছে। সন্তান সন্ততি বিহীন ফজার মার জীবনের যবনিকাপাত এই ভাবে হইল।

খবর পাইয়া বাজান ফরিদপুর হইতে কাফনের কাপড়, আতর, গোলাব, লোভার প্রভৃতি লইয়া বুড়ীকে কবর দিয়া আসিলেন। ইহারও বহু বৎসর পরে আমি গিয়াছিলাম তাম্বুলখানায়। আমার নানাবাড়ির কোন চিহ্নই এখন নাই। শুধু সেই নারকেল গাছ দুইটি শখা বাহু

বাড়াইয়া অতীতকালের স্মৃতি নীরবে পাঠ করিতেছে। বরীবুল্লা মাতবরের সেই পুকুরের ধারে যাইয়া বসিলাম। রাশি রাশি কলমিলতায় সমস্ত পুকুরটি ছাইয়া ফেলিয়াছে। সেখানে বসিয়া পুরান-পুকুর নামে একটি কবিতা লিখিয়াছিলাম। কবিতাটি আমার 'ধানখেত' পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে। গত বৎসর আমার মায়ের নামে নানার ভিটায় একটি টিউবয়েল বসাইয়া দিয়া আসিলাম।

গ্রাম্য-মামলা

পূর্বেই বলিযাছি আমার পিতার অবস্থা ভাল ছিলনা। মাত্র সাত টাকা বেতনে তিনি ফরিদপুর হিতৈষী মাইনর স্কুলে মাষ্টারী করিতেন। সামান্য যা জমিজমা ছিল তাহার ফসল হইতে আমাদের ছয় মাসের মাত্র খোরাক হইত। বাকী ছয় মাসের খরচ তাঁহাকে মাষ্টারীর বেতন ও মোল্লাকীর আয় হইতে চালাইতে হইত। আমাদের গ্রমের কয়েকজন বর্ধীষ্ণু লোকের সঙ্গে বাজানের একটি বড় মামলা হওযায় (সেই মামলার কথা পরে বলিব) তাঁহার হাত হইতে গ্রানের মোল্লাকী ছুটিয়া গেল। ইহাতে বাজানের আয আরও কমিয়া গেল। এই সময় বাজানকে দেখিযাছি, ঘুমের ঘোরে আমাদের অভাব অনটনের কথা বলিতেছেন।

চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া কোন কোন দিন তিনি জোরে জোরে চিন্তা করিতেন, কোথায় যাইব? কার নিকট হইতে টাকা ধার করিব? আজ চাউল না কিনিলে ত চলিবে না।

জমিজমা লইয়া মাঝে মাঝে আমার পিতাকে মামলা করিতে কাছারী যাইতে হইত। খুব ভোরে উঠিয়া তিনি পান্তাভাত খাইয়া উকিলের বাড়ি যাইতেন। সেখান হইতে আর খাইবার জন্য বাড়ি ফিরিয়া আসিতেননা। সারাদিন কাছারীতে চলিয়া যাইতেন। সেকালে কাছারীতে মামলায় জিতিয়া কোন কোন লোক বন্ধুবান্ধদের মিষ্টি খাওয়াইতেন। বাজানকে এরূপ মিষ্টি দিলে তাহা তিনি না খাইয়া কলার পাতায় জড়াইয়া আমাদের জন্য লইয়া আসিতেন। আমরা কয়েক

ভাই মহা কলরবে সেই অল্প পরিমাণ মেঠাই খাইয়া শেষ করিয়া কলার পাতাটি পর্যন্ত চাটিয়া খাইতাম। আজ ভাবিতে দুই চক্ষু ভারাক্রান্ত হয়, সারাদিন অভুক্ত থাকিয়া দারুণ ক্ষুদার সময়ে পাওয়া সেই মিষ্টিটুকু তিনি নিজে না খাইয়া আমাদের জন্য লইয়া আসিতেন। সন্তানের জন্য এমন সর্বস্ব ত্যাগী পিতার দেখা কি আর জীবনে পাইব?

আজ ভাসা ভাসা মনে পড়িতেছে। মামলা-মোকদ্দমার সময় কত দিন বাজান রাত দশটা-এগারটার সময় বাড়ি ফিরিয়াছেন। নানার মৃত্যুর পর তাঁর গাভী দুইটি আমরা পাইয়াছিলাম। সেই গাভী দুইটিকে মাঠে বাঁধিয়া দিয়া বাজান স্কুলে যাইতেন। স্কুল হইতেফিরিয়া আসিয়া তাহাদিগকে মাঠ হইতে আনিয়া ঘাস পানি দিয়া ঘরে বাঁধিতেন। আমি এবং আমার বড় ভাই গাভী দুইটির কোনই তালাস লইতাম না। মামলা-মোমদ্দমার সময় বাজান রাত দশটা এগাটার সময় অভুক্ত অবস্থায় বাড়ি আসিয়া গাই দুইটি আনিবার জন্য মাঠে ছুটিতেন। কত দিনের কথা মনে পড়িতেছে। মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছে। ঘন ঘন বজ্রপাত হইতেছে। অনেক রাত্রে বাজান বাড়ি ফিরিয়া সেই ঝড় বৃষ্টির মধ্যেই গরু দুইটিকে আনিবার জন্য মাঠে ছুটিতেছেন। আমরা বাজানের এই সব কাজে কোন সাহায্যই করিতাম না। এজন্য আমাদের প্রতি বাজানেরও কোন অভিযোগ ছিল না। আমার চাচাত ভাই নেহাজদ্দীন সাংসারিক কাজে তার বাপ-চাচাদের সাহায্য করিত। কিন্তু বাজান আমাদিগকে দিয়া কোন সাংসারিক কাজই করাইতেন না। তাঁহার ধারনা ছিল সাংসারিক কাজ করাইলে আমাদের লেখাপড়া হইবেনা। একবার বাজান একটি বড় মামলায় জয়লাভ করেন। এই মামলায় আমাদের গ্রামে পাঁচ ছয় জন বর্ধিষ্ণু লোক আমাদের বিপক্ষে ছিল। বাজানের খুব অন্তরঙ্গ যে হানিফ মোল্লা আর কাজেম মোল্লা তাঁহারাও বাজানের বিপক্ষে গেলেন। সামান্য স্বার্থ কি করিয়া মানুষকে পর করিয়া দেয় এই ঘটনা তাহার একটি প্রমাণ। এই এতগুলি প্রভাবশালী লোক আমাদের বিপক্ষে যাওয়ায় গ্রামে আমাদের স্বপক্ষে কেহই রহিল না। তাই এই মামলায় সাক্ষী দেওয়ার জন্য নদীর ওপার হইতে লোক সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইল।

মামলার আগের দিন বাজান তাহাদিগকে ডাকাইয়া আনিয়া হাকিমের সামনে কে কোন্ কথা বলিবে ভালমত শুনিয়া লইতেন। তারপর জেরার সময় বিপক্ষে উকিল কি কি জিজ্ঞাসা করিবে তাহা অনুমান করিয়া সাক্ষীদিগকে প্রশ্ন করিতেন। তাহাদের উত্তর যদি আমাদের অনুকূলে না হইত তখন কি বলিতে হইবে তাহা তিন বার বার সাক্ষীদিগকে শিখাইয়া দিতেন।

এই ভাবে সাক্ষীদিগকে শিখাইতে শিখাইতে প্রায় রাত ভোর হইয়া আসিত। শেষরাতে উঠিয়া মা সাক্ষীদের জন্য রান্না করিয়া রাখিতেন তাহা সাক্ষীরাই ধামায় করিয়া লইয়া সকাল বেলা বাজানের সঙ্গে উকিলের বাড়ী যাইত। আমাদের উকিল আবার সাক্ষীদিগকে প্রশ্ন করিয়া সকলে ঠিক ঠিক উত্তর দিতে পারিবে কিনা পরীক্ষা করিয়া লইতেন। যাহারা ঠিক ঠিক উত্তর করিতে পারিত না তাহাদের সাক্ষী পরের দিনের জন্য নির্দিষ্ট হইত। ইতিমধ্যে বাজান তাহাদিগকে প্রশ্ন করিয়া তৈরী করিয়া লইতেন। পারত পক্ষে বাজান কোন মামলায় হাত দিতেন না। কিন্তু যে মামলা, তিনি করিতেন তাহাতেই জয়লাভ করিতেন। কারণ, তিনি মিথ্যা মোকর্দমা কারিতেন না, এবং হাকিমের সামনে যাইবার আগে তিনি সাক্ষীদিগকে নানা প্রশ্ন করিয়া তৈরী করিয়া লইতেন।

কাছারীতে আসিয়া আমাদের লোকেরা কোন বটগাছের তলায় বসিয়া বাড়ি হইতে আনা সেই ভাত-তরকারী খাইয়া সাক্ষী দেওয়ার জন্য তৈরী হইত। একঘেয়ে গ্রাম্য-জীবন হইতে ইহার মধ্যে কিছু বৈচিত্র আছে বৈকি!

মামলা-মোকর্মা করা খুবই খারাপ, কিন্তু সকল খারাপের মধ্যেই কিছুটা ভাল মিশিয়া আছে। এই মামলা-মোকর্দমা উপলক্ষ্য করিয়া গ্রামবাসীদের মধ্যে এক একটি দলের যে একতা গড়িয়া উঠে তাহার আনুগত্য অনুকরণীয়। এই দলীয় লোকেরাই পরে গ্রামে কাহারও কোন বিপদ ঘটিলে জান-প্রাণ দিয়া আসিয়া সাহায্য করে। বন্যা, নদীতে বাড়ি ভাঙা, ডাঙা হইতে নৌকা পানিতে নামান, নতুন ঘর তোলা প্রভৃতি ব্যাপারে যেখানে সমবেত কার্যের প্রয়োজন সেখানেই এই

দলবদ্ধ লোকগুলি অসীম সাহসীকতার পরিচয় দেয়। এই সাহায্যের কৃতজ্ঞতা বংশ-পরম্পরায় মানুষে মানুষে আত্মীয়তার যোগসূত্র রচনা করে। এই মামলায় যাহারা আমাদের হইয়া সাক্ষী দিয়াছিল তাহারা এখন আর কেহ জীবিত নাই; কিন্তু তাহাদের সন্তান-সন্ততি ও নাতি-নাতকুরদের সঙ্গে দেখা হইলে এই মামলার কাহিনী মনে করাইয়া দিয়া পূর্বকালে আমাদের প্রতি তাহাদের সাহায্য প্রবনতাকে বর্তমানে টানিয়া আনিতে প্রয়াল পাই।

মুন্সেফ কোর্টে এই মামলায় আমরা জিতিলাম। বিপক্ষের লোকেরা জজকোর্টে এই মামলার আপীল-দায়ের করিল। জজকোর্টের সওয়াল জওয়াবের সময় তাহারা ভুতপূর্ব কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট অম্বিকা চরণ মজুমদার মহাশয়কে উকিল নিযুক্ত করিল।

মামলার তারিখের দিন সমস্ত কোর্ট লোকে লোকারণ্য। বারের প্রায় অধিকাংশ উকিলই সেই অম্বিকা বাবুর সওয়াল জয়াব শুনিবার জন্য সেখানে আসিয়া একত্রিত হইয়াছিলেন।

জহের ছিল আমাদের ক্লাসের বন্ধু আমি তখন ক্লাস-টুর ছাত্র। আমি আর আমার বন্ধু জহের সেই মামলা দেখিবার জন্য কোর্টে আসিলাম। জহেরের বাবা এই মামায় আমাদের বিপক্ষীদের মধ্যে একজন।

অম্বিকা বাবুর কণ্ঠস্বর উচ্চ হইতে উচ্চে উঠিয়া উদারা-মুদারা ছাড়াইয়া যাইতেছিল। মাইলখানেক দূর হইতেই সেই কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছিল।

আমার বন্ধু জহের বার বার বলিতেছিল, আল্লা? এই মামলায় বাপজান যেন জয়লাভ করেন। আমিও তাহারই মত আমার পিতার জয়লাভের প্রার্থনা করিতেছিলাম। আমাদের দুইজনের এই বিপরিত প্রার্থনার জন্য আমাদের বন্ধুত্ব কোন সময়ই ক্ষুন্ন হয় নাই।

এইমামলায় বাজান জয়লাভ করিলেন। বিপক্ষের লোকেরা একেত মামলার জন্য যথেচ্ছ খরচ করিয়াছিল, এবার মামলায় হারিয়া আমাদের ক্ষতিপুরণ দিতে যাইয়া কেহ কেহ একেবারে সর্বশ্বান্ত হইয়া পড়িল।

বন্ধু মহলে অথবা কোন মসলিসে, সুযোগ পাইলেই বাজান এই মামলার আনুপূর্বক সকল ঘটনা বলিয়া বড়ই গৌরব বোধ করিতেন।

হানিফ মোল্লা

আমাদের গ্রামের হানিফ মোল্লার পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের বড়ই অন্তরঙ্গ ভাব ছিল। হানিফ মোল্লার এক ভাই কানু মোল্লা বাজানের সহপাঠি ছিলেন। কি অসুখ হইয়া কানু মোল্লা মারা যান। ছোট ভাই-এর মৃত্যুর পর আমার পিতাকে হানিফ মোল্লা আপন ভাই-এর মত স্নেহ করিতেন। তাঁহার কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী বড় চাচী আমাদের কয়েক ভাইকে আদর করিয়া আপনাদের বাৎসল্য ক্ষুধা নিবারণ করিতেন।

বড় বাচীর ঘরে কোলাভরা মুড়ী-মুড়কী থাকিত। তাহা ছাড়া তিলের-পাটালী, লাড়ু-বাতাসাও হাঁড়িতে ভরা থাকিত। আমরা গেলে অতি আদরের সঙ্গে তিনি সে সব আমাদিগকে খাওয়াইতেন। আমাদের বাড়িতে ফলবান কোন গাছ ছিল না। তাঁহাদের বাড়িতে বড় বড় আমগাছ জড়াইয়া আম ধরিত। সেই আমের অধিকাংশই আমরা খাইতাম। হানিফ মোল্লার বাড়িটি আরও নানা কারণে আমার নিকট রহস্যময় লাগিত। তাঁহার একখানা বড় নৌকা ছিল। সেই নৌকায় করিয়া গ্রামের বেপারীরা দেশ-দেশান্তরে ব্যবসা করিতে যাইত। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে যখন গাঙে নতুন পানি দেখা দিত তখন বচন মোল্লা বেপারী তাঁর ভাগীদের সঙ্গে করিয়া নদীর তলা হইতে সেই বড় নৌকাখানা তুলিতেন। ৭।৮ দিন ভাগীরা নানা গল্প ও গান করিতে করিতে সেই নৌকায় গাবপানি দিত, পুরাতন ছইখানা মেরামত করিত।

আমি সেখানে যাইয়া সেই সব গল্প ও গান শুনিতাম। কাজেম ফকির ছিল এই নৌকার ভাগীদের মধ্যে সব চাইতে বয়স্ক। বচন মোল্লা নৌকার মূল বেপারী। তাঁর কোমরে বাঁধা থাকিত মহাজনের টাকার খুতী। কাজেম ফকির ছিল বচন মোল্লার দক্ষিণ হস্ত। বচন মোল্লা হাল ধরিয়া পিছনে বসিতেন। কাজেম ফকির থাকিত আগা

নৌকায় একটা লগী হাতে করিয়া। পদ্মা-যমুনা-মেঘনা নদীর কোন্‌-খানে কত পানি তা তার নখদর্পণে। তাহা ছাড়া নদীর স্রোত ও ঢেউ দেখিয়া সে পানির গভীরতা বুঝিতে পারিত। যেখানে চাচুড়ের ধার সেইখানেই বালুয়ার চর। এইরূপ নদীর স্রোতের কত ছড়াই সে জানিত। নৌকায় তার আর ভাগীরা যখন ছই-এর সলা এবং বাখারী চাঁছিতে ব্যস্ত, সে তখন তার বিগত বানিজ্য-জীবনের কাহিনী বলিত। এক দেশে তাহারা যাইয়া দেখিল মেয়েলোকে খেত-খামারের কাজ করে—মেয়েলোকে হাটে-বাজারে যায়। পরণে সামান্য কয়েক আঙুল বস্ত্র। আর সমস্ত গা উদলা। কাজেম ভাগীদের বলিয়া দিল, "খবরদার! কেহ নৌকা ছাড়িয়া কেনারায যাইবি না!" একজন ভাগী কথা শুনিল না; সেই যে সে তীরে নামিয়া গেল, আর ফিরিল না।

এক দেশে যাইয়া দেখি নৌকায় চাউল ঝাড়ার কুলা নাই! এক জন ভাগীকে পাঠাইলাম, তীরের কোন বাড়ী হইতে একখানা কুলা লইয়া আয়। ভাগী যাইয়া কোন বাড়ির একটি মেয়েকে বলিল, ,'মা জননী! তোমাদের কুলাখানা দাও। আমরা চাউল ঝাড়িয়া আবার ফেরৎ দিব।" শুনিয়া মেয়েটি ঝাঁটা উঁচাইযা তাহাকে মারিতে আসিল। ''আরে গোলামের বেটা! তুই আমাকে তোর বাপের বউ বানাইলি কোন সাহসে?"

ভাগী ফিরিয়া আসিয়া কাজেমকে সকল বলিল। কাজেম নিজে তখন যাইয়া মেয়েটিকে বলিল, 'হাদে মাগি! তোর ধাপড়াখানা দে থাপড়ায়ে লই।' মেয়েটি খুশী হইয়া বলিল, "আয়! আয়! লইয়া যা।" এক দেশের বুলি অন্য দেশের গালি। এই সব গল্প শুনিতে শুনিতে ভাগীরা কাজেমের নানা অভিজ্ঞতার কথা জানিয়া তাহারা প্রতি আরও অনুরক্ত হইত।

কাজেম যখন গল্প করিত না তখন রহিম মল্লিক উচ্চ স্বরে বারো-মাসী গান ধরিতঃ

কৃষ্ণ দাঁড়ারে
আমি তোর দেখি চন্দ্র মুখরে।
কৃষ্ণ দাঁড়ারে।

ওপারকার পরাঙ্গী ধান টিকায় কাটিয়া নিল,
বন্ধুর আগে কইও খবর যৌবন বয়া গেলরে,
কৃষ্ণ দাঁড়ারে।

তাহার সুকণ্ঠের গান আকাশ-বাতাস ছাড়াইয়া আমার সেই বালক-মনকে কোন্ সুদূরে লইয়া যাইত।

এইভাবে ৭।৮ দিন গাবপানি দিয়া নৌকা পানি নামান হইত। তারপর আমার পিতাকে দিয়া নৌকার চালান লেখাইয়া সেই কাগজের উপর ভাগীদের টিপসই লওয়া হইত। একটি শুভদিনে ভাগীদের সঙ্গে লইয়া বচন মোল্লা নৌকায় উঠিতেন। বচন মোল্লার মা, কেদারীর মা, মুন্দিরার মা, আর জুলমতের মা নৌকার গলুইতে পান-সুপারী দিয়া সালাম করিত। আর বলিত, "নৌকা! আমাদের ছেলেদের ছহি ছালামেতে দেশে ফিরাইয়া আনিও।" গ্রামের ছেলে বুড়ো যুবক-যুবতী সকলেই নদীতীরে আসিয়া দাঁড়াইত। যতক্ষণ নৌকার পালের শেষ রেখাটি দেখা যাইত ততক্ষণ বচন মোল্লার মা, জুলমতের মা, মুন্দিরার মা আর কেদারীর মা নদীতীরে দাঁড়াইয়া থাকিত। তারপর চোখের পানি মুছিতে মুছিতে ঘরে ফিরিয়া যাইত।

মুন্দিরার মায়ের সাথে কেদারীর মার ভাল ভাব ছিল না। এটা ওটা লইয়া প্রায়ই তাহারের মধ্যে দারুণ কলহের উদয় হইত। কিন্তু আজ কেদারীর মা মুন্দিরার মার পরম বন্ধু। দুইজনের ছেলেই বিদেশে বানিজ্য করিতে গিয়াছে। ঘাটে বসিয়া দুই বিধবা নদীর দিকে চায় আর নিজ নিজ ছেলের বিষয়ে আলোচনা করে। পনর ষোলদিন পরে নদীর তীরে আবার লোকজনের ভর্তী হইয়া যায়। যাহাদের ছেলেরা বাণিজ্যে গিয়াছে তাহারা বার বার নদীর তীরে আসিয়া দূরের নৌকাগুলির দিকে চাহিয়া থাকে। ভাগীদার আর বেপারীর বউরা শাশুড়িদের মত নদী তীরে আসিয়া প্রকাশ্যে আহা-উহু করিতে পারে না। নানা অছিলায় নদীতে পানি আনিতে আসিয়া ঘোমটরে ফাঁক দিয়া দূরের নৌকাগুলি নিরিক্ষণ করিতে থাকে।

যে দিন ঝড়তুফান হয় সেদিন তাহাদের বাড়িতে হাহাকার পড়িয়া যায়। আল্লার নামে কত রকম মানত করিতে থাকে।

তারপর সত্য সত্য যেদিন সুদূর মালদা জেলা হইতে বচন মোল্লার তাঁর নাও ভর্তী আম লইয়া নদীর ঘাটে নোঙর গাড়ে, সেদিন সমস্ত গ্রাম উৎসব-মুখর হইয়া পড়ে। আজ বচন মোল্লা যেন কোন্ অসাধ্য সাধন করিয়া দেশে ফিরিয়াছে। সকলেই উৎসুক ভাবে ভাগীদারদের পিছে পিছে ঘোরে, এবারের সফরের নতুন নতুন কাহিনী শুনিতে, কিন্তু আম না বেচিয়া কাহারও মুহূর্তের অবসর নাই। পাঁচ ছয় দিনে আম বেচা শেষ হইলে গ্রামের সব লোক কাজেম ফকিরকে ঘিরিয়া বসে, এবারের সফরের নতুন কাহিনী শুনিতে। কাজেম ফকিরও এতদিন অপেক্ষা করিতেছিল এই দিনটির জন্য। এবারের সফরে তার মনে যে কাহিনী সঞ্চিত হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিতে না পারিলে কাজেমের নিজেরই মনে সোয়াস্তি ছিল না। কিছুটা সত্য, কিছুটা কল্পনা মিশাইয়া কাজেম তাহার নতুন গল্প আরম্ভ করে। সে যখন হয়রান হইয়া পড়ে তখন রহিম মল্লিকের গান।

সেই আমাদের মরা গাঙ দিয়া অনেক দূর যাইয়া তাহাদের নৌকা যখন পদ্মার গাঙে পড়িত, তখন পদ্মার ঢেউ দেখিয়া মাঝিরা আল্লার ধ্বনি করিয়া উঠিত। বচন মোল্লা হাল হইতে নামিয়া আসিয়া গাঙের পানিতে সোয়াসের চিনি ছাড়িয়া দিতেন। তারপর নৌকা ভাসিয়া যাইত গোয়া-লন্দের মোকামে। সেখানে যমুনা আর পদ্মা পাশাপাশি চলিয়াছে। সেখান দিয়া একদিন নৌকা বাহিলে সামনে নিরাইলার চর। সেখানে রান্না-বাড়ি করিয়া ভাগীরা রাত্র যাপন করিত। পরদিন পাবনা জেলা বামে ফেলিয়া গোড়াই নদীর ওপারে চিরিঙ্গি বাজার। সামনে গোদাগাড়ির বন্দর। তার পশ্চিমে নেতা-ধুপুনীর ঘাট। এখানে নেতা-ধুপুনীর সঙ্গে বেহুলার দেখা হইয়াছিল। এই ঘাট ছাড়িয়া নিকাড়ি বন্দর পার হইলেই ইংরেজ বাজার। সুমাই নদী দিয়া আরও একদিন গেলে কাজল কোঠার গ্রাম। সেখানে নৌকা বাঁধিতেই কয়ালদারেরা আসিয়া বচন মোল্লাকে সালাম জানাইত। পরদিন তাহারা বচন মোল্লাকে সঙ্গে করিয়া আমের বাগান-গুলি দেখাইত। এই সুদূর বিস্তৃত নৌকা পথখানি আজও আমার চোখে ভাসিয়া ওঠে।

ইহা ছাড়া প্রথম জোয়ারের পানি আসিলে ছোট গাঙের এপারে

ওপারে বানা বাঁধাল দিয়া গ্রামের লোকেরা মাছ ধরিত। বাঁধের দুইতীরের পানিতে বাঁশের চিকন সলা গড়িয়া দেওয়া হইত। তাহারই পাশে জুতী হাতে লইয়া দুই তীরের দুই বাঁশের মাচার উপর দুইজন বসিয়া থাকিত। বানার পথ বাহিয়া বড় বড় মাছ যখন এই বাঁশের সলার মধ্যে প্রবেশ করিত তখন বাঁশের সলা নড়িয়া উঠিত। অমনি জুতী দিযা কোপাইয়া মাছটিকে উপরে উঠান হইত। এই কাজে হানিফ মোল্লা সব চাইতে ওস্তাদ ছিলেন। যেদিন বেশী মাছ মারা পড়িত সেদিন তাহার কিছুটা অংশ আমাদের বাড়িতে পাঠাইযা দিতেন। কিন্তু তাব জন্য আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল না।

নদীতে এই বাঁধল বাঁধিতে আমাদের গ্রামের প্রায় সকলেই অংশ গ্রহন করিত। তাহারা একত্র হইয়া যে গল্প-গুজব ও গান করিত তাহাই ছিল আমার সব চাইতে আকর্ষণের বস্তু। হানিফ মোল্লাকে কেন্দ্র করিয়া নদীতে বাঁধ বাঁধা, মালদা হইতে আমের চালান আনা প্রভৃতি উপলক্ষ্য করিয়া আমাদের গ্রামবাসীদের মধ্যে যে সমবেত ভাবে কাজ করার একটি পদ্ধতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার মৃত্যুর পরে ইহা ভাঙ্গিয়া গেল। এই লোকটি তেমন শিক্ষিত ছিলেন না কিন্তু তাঁহার মধ্যে যে আকর্ষণকারী ব্যক্তিত্ব ছিল তাহারই বলে তিনি যাহাকে যাহা আদেশ করিতেন সে তাহা পালন করিযা নিজেকে ধন্য মনে করিত। বর্ষা শেষ মাছ ধরার সমস্ত সাজ সরঞ্জার হানিফ মোল্লার বাড়িতে অতি যত্নের সহিত সংরক্ষিত হইত।

সেবার পানির তলা হইতে নৌকা উঠাইবার সময় তাঁহাকে কাছিমে কামড় দেয়। সেই ঘা দূষিত হইয়া তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। সেই ছোট গাঙ, এখনও তেমনি আছে। গ্রামের লোকদের একত্রিত করিয়া কেহ আর সেখানে বাঁধাল দিয়া মাছ মারে না। তাঁহার মৃত্যুর পর ছোট ভাই কাঙালী মোল্লা মহাজনের তবিল ভাঙ্গিয়া খাইল। আমের বেপারীরা আর মালদার পথে যাইতে পারিল না। গ্রামের মধ্যে মাড়োয়ারীর পাট গুদাম বসিল। বচন মোল্লা সেখানে চাকরী পাইলেন। বেশ ভাল বেতন। পাটের ধূলা ও আঁশ নাকে লাগিয়া কয়েক বছরের মধ্যে তাঁর যক্ষা হইল। সেই রোগেই তিনি মারা গেলেন।

পূর্বে যে মোকদ্দ'মার কথা উল্লেখ করিয়াছি এই মোকদ্দ'মায় হানিফ মোল্লা আমাদের বিপক্ষে ছিলেন। যত দিন মামলা চলিয়াছিল আমরা তাঁহার বাড়ি যাইতাম না। মামলায় হারিয়া একদিন হানিফ মোল্লা আমাদের বাড়ি আসিয়া আমার পিতার হাত ধরিয়া কি কি বলিলেন। সেই হইতে আমরা আবার হানিফ মোল্লার বাড়ি যাওয়া-আসা করিতে লাগিলাম। তাঁহার প্রতি আমার পিতার মনে যে অন্তঃসলিলা স্নেহধারা ছিল তাহা এই মামলা নষ্ট করিতে পারে নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি আমাদের খড়ের ঘরের কেয়াড় বা দরজা বাঁশের তৈরী ছিল। মাটির ভিতবে বাঁশের চুঙ্গা গাড়িয়া সেই চুঙ্গার ভিতরে দরজার কাইটি আলগা করিয়া বসান থাকিত। দরজা মেলিতে বা আটকাইতে কড় কড় করিযা শব্দ হইত। সেবার বাজান হিন্দুপাড়া হইতে একজোড়া চৌকাঠ কপাট কিনিযা আনিলেন। আমাদের পশ্চিম ঘরে সেখানে আমি, বাজান ও আমার ভাইরা শুইতাম সেই কপাট সেখানে লাগান হইল। এই কপাট লাগাইযা আমাদের ঘরের শোভা কিরূপ হইল দেখিবার জন্য এ বাড়ি ও-বাড়ী হইতে কৌতুহলী গ্রাম্য বধূরা আমাদের বাড়ি আসিযা জড় হইল। সেই কপাট খুলিয়া বন্ধ করিয়া তাহাদিগকে দেখাইয়া আমরা বেশ গৌরব বোধ করিতাম ইহার পরে মেছের মোল্লার বাড়িসহ তাহার সমস্ত সম্পত্তি আমরা কিনিয়া ফেলিলাম। সেই বাড়ি হইতে একজোড়া কাঁঠাল কাঠের কপাট আনিয়া আমার মায়ের ঘরের দরজায় লাগান হইল। তারপর আমাদের একখানা কাছারী ঘরও হইল। বাজান একখানা চৌকি কিনিয়া আনিয়া সেখানে বসাইলেন। এইভাবে ধীরে ধীরে আমাদের ঘর-সংসারে বর্তমান সভ্যতা আসিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল।

মেছের মোল্লার সমস্ত সম্পত্তির দাম ছিল পাঁচশত টাকা। মামলা করিয়া আমার পিতার হাতে অত টাকা ছিল না। স্থানীয় মহাজনরা তাঁহাকেবড়ই বিশ্বাস করিত। মহাজনের নিকট হইতে সুদে টাকা ধার করিয়া তিনি এই সম্পত্তি কিনিয়া ফেলিলেন। এই সম্পত্তির অর্দ্ধেক বাজান তাঁর চাচাত ভাইদের নামে লেখাইলেন। সেই জমিজমা লইয়া যদি কাহার সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ বাধে, চাচাত ভাইরা তখন বাজানের হইয়া লড়িবেন।

যাদব ঢুলী

মেছের মোল্লার জমি কিনিয়া বাঁশগাড়ী দখল লইবার সময় যাদব ঢুলী ও তার ভাই ঢোল বাজাইতে আসিল। ধামায় করিয়া পান, বাতাসা লইয়া আমরা জমি দখল করিতে চলিলাম। প্রত্যেক খণ্ড জমিতে গর্ত করিয়া তাহার মধ্যে দুই-একটা তামার পয়শা দিয়া সেখানে বাঁশ গাড়িয়া দেওয়া হইল। বাঁশের আগায় আমাদের নিশান পতপত করিয়া উড়িতে লাগিল। ঢোলের বাজনা শুনিয়া যাহারা এখান হইতে ওখান হইতে আসিয়া জড় হইল, আমরা তাহাদের মধ্যে পন বাতাসা বিতরণ রিকলাম। যদি কেহ বাঁশগাড়ী করিতে আমাদিগকে বাধা দিত, তাহার জন্যও আমাদের লোকেরা প্রস্তুত ছিল। আমাদের পক্ষের দশ বারোজন লোক হাতে লাঠি লইয়া আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছিল।

এই বাঁশ গাড়ীর সময় যাদব ঢুলীর সঙ্গে আমার বেশ ভাব হইয়া গেল। বাঁশগাড়ীর কাজ শেষ হইলে সে যখন আমাদের বাড়ি খাইতে আসিল, তখন সে তাহার ঢোলটি আমাকে ইচ্ছামত বাজাইতে দিল। ইতিপূর্বে এত বড় সম্মান বোধহয় আমাকে আর কেহ দেয় নাই। ইহার আগে বহুবার আমি যাদব ঢুলীর বাজনা শুনিয়াছিলাম। নদীর ওপারে মদন ঢুলী ভাল ঢোল বাজাইত। সে ছিল জাতিতে বাউতি, চুন তৈরী করিত। যাদব জাতিতে মুসলমান। আমাদের গাঁয়েই তাহার বড়ি। সেইজন্য আমরা তাহাকে লইয়া বড়ই গৌরব বোধ করিতাম। কোথাও মদন ঢুলীর সঙ্গে তাহার ঢোলবাদ্যের তুলনা হইলে আমরা তর্ক করিয়া যাদব ঢুলিকে বড় করিতাম। হিন্দুদের বিবাহে যাদব যখন নাচিয়া নাচিয়া ঢোল বাজাইত, তখন মনে হইত তাহার ঢোলবাদ্যের সঙ্গে যেন ত্রিভুবন নাচিতেছে। এত বড় একজন ওস্তাদ লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হইল,

এ কি কম সৌভাগ্যের বিষয় ? যাদব আমাকে আরও বলিল, "আমার বাড়ি গেলে তোমাকে ঢোলবাগু শিখাইয়া দিব।"

একদিন সত্য সত্যই সকালে উঠিয়া যাদবের বাড়ি গেলাম। যাদব আমাকে আদর করিয়া তাহার বারান্দায় বসিতে দিল। যাদবের ঘর, উঠান, ঘরের মেঝে লেপা-পোছা পরিষ্কার। উঠানের পাশে দুই-একটি ফুলের গাছ সব মিলিয়া যেন পটে আঁকা একখানা ছবি। যাদবের বউটি এমন সুন্দরী তার মুখখানা যেন সিন্দুরের মত ডুগু ডুগু করে। সেই বয়সে চোখ দুইটিই বুঝি সত্যকার সৌন্দর্য্য দেখার উপযুক্ত ছিল। সেই ত কতকাল আগে যাদবের বউকে দেখিয়াছিলাম, কিন্তু আজও আমার মনে হয় রঙ-তুলি পাইলে তাকে আমি তেমনি করিয়া আঁকিয়া দেখাইতে পারি। ঘরের কপাট ধরিয়া বউটি দাঁড়াইল। যাদব বউকে বলিল, ' অমুকের ছেলে অমুক। আমার কাছে ঢোল বাজনা শিখিতে আসিয়াছে।" মোল্লাবাড়ির ছেলে হইয়াও যে আমি ঢোলবাগু শিখিতে আসিয়াছি ইহা শুনিয়া বউটি হাসিয়া কুটিকুটি যাদবের ছোট ভাইয়ের বউকে ডাকিয়া আনিযা বলিল, "আয়, দেখ আসিয়া, কে নতুন কুটুম ঢোল বাজনা শিখিতে আসিয়াছে।" যাদবের ছোট ভাইয়ের বউ দেখিতে শামলা রঙের। কিন্তু মুখের গঠন ছিল নিখুঁত। আর সেই মুখে কি যেন এক রকম বউ-বউ ছবি আঁকা।

যাদবের মা আমাকে ছাতু-মুড়ি আর গুড় দিয়া নাস্তা করাইল। আমার খাওয়া হইলে যাদব তাহার ঢোলটি লইয়া উঠানের মধ্যে কত কৌশল করিয়াই বাজাইতে লাগিল। তারপর নানান রকম ছড়া বলিয়া সেই ছড়ার তালে তালে ঢোল বাজাইল। ঢোলের তালে তালে বাড়ির বড় বউকে ডাকিল, "ও বড় বউ ! কি কর ?"

ঢোলের তালে তালে আবার উত্তর দিল, ' আমি ঢেকি পারাই ধাপ্পুর ধুপ্পুর।"

"আমার একটি কথা শুনিবে ?"

"কি কথা ?"

"একটু তামুক খাওয়াও।"

যাদবের বউ হাসিতে হাসিতে তামাক সাজিয়া আনিয়া যাদবের হাতে দিল।

তারপর যাদব ঢোলটি আমার হাতে দিল। আমি খানিকক্ষণ ইচ্ছামত বাজাইলাম। যাদব আমাকে ঢোলের একটি প্রাথমিক তাল দেখাইয়া দিল।

আরও দু'একদিন যাদবের বাড়ি গিয়াছিলাম। যাদব প্রায়ই বাড়ি থাকিত না। এ-গাঁয়ে ও-গাঁয়ে ঢোল বাজাইতে যাইত। ইহার পরে আর কবে কবে সেখানে গিয়াছিলাম মনে নাই। যাদব বহুদিন আগে মারা গিয়াছে। যাহারা তাহার ঢোলবাদ্য শুনিয়া মুগ্ধ হইত তাহারাও কেহ জীবিত আছে বলিয়া মনে পড়ে না। আজ যাদবের সঙ্গে তাহার সুমধুর ঢোলবাদ্যের কথাও এখানকার লোকেরা মনে করে না। সমস্ত শিল্প-সৃষ্টি একদিন এইভাবে মুছিয়া যাইবে। বৃথাই আমরা কাগজের উপরে কবিতার কয়েকটি আঁচড় টানিয়া অমর হইবার স্বপ্ন দেখি। যাদবের সেই সুন্দর বাড়িখানা এখন জঙ্গলে ভর্তী। কেহই যাদবের কথা মনে করেনা।

সরিতুল্লা হাজী

মেছের মোল্লার সম্পত্তি কিনিবার পর আমাদের অবস্থা খুব ভাল হইল। এখন জমিতে যে ফসল হয় তাহা দিয়া আমাদের সারা বছরের খোরাক চলিয়া যায়।

আমার পিতার জমিজমার মূল্যের পরিমাণ জ্ঞান ছিল অসাধারণ। এই সম্পতি হইতে চার পাঁচ বিঘা জমি বিক্রি করিয়া তিনি মহাজনের দেনা পরিশোধ করিয়া দিলেন। এত বড় সম্পত্তিটা প্রায় বিনা মূল্যে আমাদের হাতে আসিল।

মেছের মোল্লার বাড়ির পাশেই ছিল সরিতুল্লা হাজীর বাড়ি। দুইবার তিনি মক্কা শরীফ যাইয়া হজ করিয়া আসিয়াছেন। বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার সখ হইল সোনাভানের পুঁথি পড়িবেন। তাঁর অন্য কোন কাজ ছিলনা। সারাদিন পুঁথিখানা সামনে লইয়া পড়িতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু পড়িবেন কেমন করিয়া? অক্ষর পরিচয় ত হয় নাই। বাড়ির কাছ দিয়া গেলেই ডাক দিয়াছেন, "ও কে যায় জসী নাকি? এখানে আইস ভাই।" কাছে গেলে সোনাভানের পুঁথিখানা আওগাইয়া ধরেন। "বল ত ভাই।

এখানটিতে কি লেখা আছে?" কয়েক মাস পাঠশালায় যাইয়া আমি নতুন পড়ুয়া। এমন বয়স্ক ছাত্র পাইয়া বেশ গৌরবের সঙ্গে তাঁহাকে পড়া বলিয়া দিতাম। একখানা পুরাতন কাঁথার উপরে বসিয়া তিনি পড়াশুনা করিতেন। মক্কা শরীফ হইতে কিনিয়া আনা আলখেল্লাটি তাঁহার ঘরের বেড়ায় টাঙান থাকিত।

আমি ছাড়া পাড়ার যত স্কুলে-পাঠশালায পড়া ছেলে, তাঁর বাড়ির কাছ দিয়া গেলেই তিনি তাহাদিগকে ধরিয়াছেন পাঠ বলিয়া দিতে। তাঁহাদের কাছে আবার নতুন পড়া লইযা দিনের পর দিন চলিত তাঁহার পুঁথি পড়ার সাধনা। যেদিন আমাদের কাজ থাকিত তাঁহার বাড়ির কাছ দিয়া চুপে চুপে যাইতাম। তখন শুনিতাম বৃদ্ধ তাঁহার ভাঙা গলায় সুর করিয়া শোনাভানের পুঁথি পড়িতেছেন। বৃদ্ধের একটি নাতনী ছিল। আমার চাইতে দু'এক বৎসরের বড়। সেই রান্না-বান্না করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইত। একমাত্র পুঁথি পড়া অভ্যাস করা ছাড়া তাঁহার আর কোন কাজ ছিল না। গ্রামের কারো বাড়ি নিমন্ত্রণের দিনে মক্কা শরীফের খিলকাটি পরিযা পাথরের একটি তসবিহ গলায় দিযা তিনি যেখানে যাইতেন। সমবেত লোকেরা তাঁহার সঙ্গে হাত মিলাইযা বিশেষ গৌরব বোধ করিত।

দুই তিন বৎসরের অশ্রান্ত চেষ্টায হেদাতুল্লা মোল্লা পুঁথি পড়া শিখিয়া ফেলিলেন। ইহাতে তাঁহার কি লাভ হইয়াছিল জানিনা। সোনাভানের পুঁথি শেষ করিয়া তিনি আরও কোন পুঁথি পড়িয়াছিলেন কিনা তাহারও খোঁজ রাখি নাই। কিন্তু আমার মুরব্বীরা প্রায়ই আমাকে বলিতেন, দেখ, আশী বৎসরের বৃদ্ধ হেদাতুল্লা মোল্লা নিজের চেষ্টায় কেমন পুঁথি পড়া শিখিয়া ফেলিলেন। আর এত সুযোগ-সুবিধা থাকিতে তোমরা তেমন পড়াশুনা করিতেছ না।

প্রথম পাঠ

আগেই বলিয়াছি আমি এবং আমার চাচত ভাই নেহাজদ্দীত শোভা-রামপুর অম্বিকা মষ্টোরের পাঠশালায় যাইয়া ভর্তী হইলাম। পাঠশালাটি ছিল ছোট গাঙের ওপারে। বাঁশের সাঁকো পার হইয়া সেখানে যাইতে

হইত। গ্রীষ্মের ছুটির পর এই ছোটগাঙ ফুলিয়া ফাঁপিয়া বড় হইয়া উঠিল। তখন সেখানে যাইয়া প্রতিদিন লেখা পড়া করা আমাদের বয়সের ছোটদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। আমার পিতা একদিন আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার নিজের স্কুলে আনিয়া ভর্তি করিয়া দিলেন। এই স্কুলের কথা আগেও কিছুটা বলিয়াছি।

হিতৈষী স্কুলে

প্রতিদিন আমি আমার পিতার সঙ্গে স্কুলে যাইতাম। আমার পিতাকে আমার তখন এত ভাল লাগিত যে সর্বদা তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে চাহিতাম। তিনি যেমন করিয়া খাইতেন আমি তাহা অনুকরণ করিতাম। তাঁহার মত বড় বড় পা ফেলিয়া হাঁটিতে চেষ্টা করিতাম।

এই স্কুলের প্রথম দিনের ঘটনা আমার বিশেষ মনে নাই। আমাদের উপর-ক্লাসের একটি ছেলে বেশ সুন্দর করিয়া কবিতা আবৃত্তি করিত। তার গলার সুরটি ছিল ভারি চমৎকার। তার আবৃত্তি করা একটি লাইন মনে পড়ে।

সাদা সাদা বকের ছানা
জল খাচ্ছে ঘাটে।

কত কালের কথা। কিন্তু এই লাইনটি ভুলিয়া যাই নাই। বোধ হয় এই লাইনটির চিত্র ধর্মের জন্যই উহা আমার মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। সেকালে আমাদিগকে কিণ্ডারগার্ডেন পড়ান হইত। নানা রঙ চিনাইবার জন্য সেই বই-এ সুন্দর সুন্দর কবিতা থাকিত। উহাদের দুই এক লাইন এখনো মনে আছে:

লম্বা লম্বা খেজুর গাছে খেজুর হয়েছে,
কতক কাঁচা কতক ডাঁসা কতক পেকেছে।

অথবা

পেচ দেয় না বামের ঘুড়ি উড়ে পুকুর পাড়ে,
ওদিক থেকে হরির ঘুড়ি পড়ল তাহার ঘাড়ে।

কেন জানি না, এই কবিতাগুলি পড়িতে আমার বড়ই ভাল লাগিত।

বাল্যকালে আমার স্মরণশক্তি খুব ভাল ছিল। স্কুলে বসিয়া পড়িয়াই আমি ক্লাসে প্রথম হইতাম। বাড়ী আসিয়া পড়িতে হইত না। আমাদের উপর-ক্লাসের ধীরেন্দ্র আর সতীশ নামে দু'টি ছেলে আমাকে পড়া তৈরী করিতে সাহায্য করিতেন। ধীরেনদা মারা গিয়াছেন। সতীশদা কোথায় আছেন জানি না।

আমাদের স্কুলে সাধারণতঃ গরিব লোকদের ছেলেরাই আসিয়া ভর্তি হইত। আমার পিতা বলিয়া-কহিয়া আমাদের গ্রামের অনেকগুলি চাষী ছেলেকে এই স্কুলে আনিয়া ভর্তি করাইয়া দেন। তাহারা বাড়ীতে পড়াশুনা করিবার কোন সাহায্য পাইত না। তাই বছরের পর বছর ফেল করিত।

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

আমি যখন ক্লাস টুতে উঠিলাম তখন এস, ডি, ও, বাবু বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাসা হইতে দুইটি ছাত্র আসিয়া আমাদের স্কুলে ভর্তি হইল। বিশ্বেশ্বর বাবুর ছেলে মনু ভর্তি হইল প্রথম শ্রেণীতে, আর তাহার ভাইপো জ্ঞানেন্দ্র ভর্তি হইল ক্লাস ফোরে। আমি তৃতীয় শ্রেণীতে উঠিলে মনোরঞ্জন ডবল প্রমোশন পাইয়া আমাদের শ্রেণীর সামিল হইল। অল্প দিনের মধ্যে মনু আমার বিশেষ বন্ধু হইয়া পড়িল। ক্লাসের পড়ায় কোনবার আমি প্রথম হইতাম, কোনবার মনু প্রথম হইত। অঙ্কে আমার সঙ্গে মনু পারিত না।

গ্রীষ্মের ছুটির আগের দিনে একবার মনু টুলের উপর দাঁড়াইয়া একটি স্তোত্র আবৃত্তি করিয়াছিল। তাহার বালক-কণ্ঠের আবৃত্তি শুনিয়া শিক্ষক-ছাত্র সকলেই খুব প্রশংসা করিয়াছিলেন। সেই স্তোত্রটির দু'এক শব্দ মনে আছে।

অঞ্জন গঞ্জন ইত্যাদি।

আমিও একটি কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলাম। মনুর বাল-কালের চেহারা কতকটা আমার ছোট ভাই সৈয়দ উদ্দীনের মত ছিল। একদিন

আমার পিতা আমার মাকে এই কথা বলিতেছিলেন। তিনি মনুকে বড়ই স্নেহ করিতেন। মনু যতদিন জীবিত ছিল আমার সঙ্গে দেখা হইলেই সে আমার পিতার কথা জিজ্ঞাসা করিত।

ছুটির দিনে দুপুর বেলা আমি প্রায়ই মনুদের বাসায় যাইতাম। মনুর বাবা উদল গায়ে সবজি বাগানে কাজ করিতেন ভয়ে কোনদিনই তাঁহার সঙ্গে কথা বলি নাই। মাঝে মাঝে মনুর মাকে দেখিতাম। তাঁহার গায়ের বর্ণ সাদা ধব ধব করিত। মায়ের আঁচল ধরিয়া মনু এটা ওটা বায়না ধরিত।

আমাদের বাড়ীতে কয়খানা বটতলার দোভাষী পুঁথি আর আমার পিতার পাঠ্য-বইগুলি মাত্র ছিল। দোভাষী পুঁথি পড়া আমাদের বারণ ছিল। লুকাইয়া ছাপাইয়া পড়িতে হইত। পিতার পাঠ্য-বইগুলি পড়িয়া বুঝিবার ক্ষমতা তখনও হয় নাই। মনুদের বাড়ীতে ছোটদের পড়িবার মত অনেক বই ছিল। খুব সম্ভব "সন্দেশ" কাগজ খানাও তখন ছাপা হইত। মনুদের বৈঠকখানায় বসিযা আমরা দুই বন্ধুতে সেই বইগুলি পড়িতাম। মাঝে মাঝে জল্পনা কল্পনা করিতাম, বড় হইয়া আমরা এমনি সুন্দর সুন্দর বই লিখিব। বই ছাপা হইলে আমাদের কেমন নাম ডাক হইবে, নানা যায়গা হইতে আমাদের বয়সের ছেলেরা-মেযেরা কত তারিফ করিয়া পত্র লিখিবে। বই বেচিয়া আমরা যে টাকা পাইব তাহা দিয়া আমরা একটি বড় স্কুল খুলিব।

এমনি করিয়া সেই বালক-বয়সে কল্পনার জালকে যতদূর সম্ভব প্রসারিত করিয়া আমরা দুই বন্ধুতে মিলিয়া আমাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বর্ণনা করিয়া সারা দুপুর কাটাইতাম।

তৃতীয় শ্রেণী হইতে চতুর্থ শ্রেণীতে উঠিয়া মনু অপর স্কুলে চলিয়া গেল। তাহাতে মনে বড়ই ব্যথা পাইলাম। তবে ছুটির দিনে মনুর বাসায় যাইয়া দুই বন্ধুতে ছোটদের বই লইয়া আগের মতই পড়াশুনা করিতাম।

ইহার বহু বৎসর পরে মনুর সঙ্গে দেখা হইল কলিকাতায়। আমি বোধহয় তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ, পড়ি। আমার 'নক্সী কাঁথার মাঠ' ও রাখালী পুস্তক ছাপা হওয়ায় কতকটা সাহিত্যিক

সুনামের অধিকারী হইয়াছি। আশ্চর্য হইয়া দেখিলাম মনুও আমারই মতন সাহিত্যিক হইয়া উঠিয়াছে। 'রামধনু' নামে ছোটদের একখানা মাসিক সে তখন প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তা ছাড়া ছোটদের উপযোগী দুই তিনখানা পুস্তকও তাহার বাহির হইয়াছে। মনুকে বলিলাম, "দেখ ভাই, আমাদের বালক বয়সের সেই সাহিত্যিক হইবার কল্পনা আজ তোমার আমার মধ্যে কতকটা সার্থক হইয়াছে।" শুনিয়া মনু একটু হাসিল। তারপর দুই বন্ধুতে মিলিয়া আমাদের বাল্যকালের কত ঘটনা লইয়া আলোচনা। যে ঘটনা আমার মনে নাই মনু তাহা বলিয়া যাইতেছে, যে ঘটনা মনু ভুলিয়া গিযাছে আমি তাহার সূত্র ধরাইয়া দিতেছি। কথা বলিতে বলিতে কথা আর শেষ হইতে চাহে না। আরও কত কথা আসিয়া পড়ে।

সেদিন প্রথম জানিলাম, ময়নামতির গানের সম্পাদক এবং নানা পত্রিকায় বহু ঐতিহাসিক প্রবন্ধের লেখক বাবু বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য মহাশয় মনুর পিতা। ইহার পর 'ময়মনসিংহ-গীতিকা' লইযা মনুর পিতার সঙ্গে বহুবার আলাপ হয়। মনুর মতই তিনি আমাকে স্নেহ করিতেন। তাঁর সম্পাদিত ময়নামতির গান, গোপীচন্দ্রের গান দুইখণ্ড পুস্তক আমাকে উপহার দিলেন। বিশ্বেশ্বর বাবু আমাদের ফরিদপুর জেলার অধিবাসী ছিলেন। তিনি ফরিদপুর জেলার একটি বড় ইতিহাস পুস্তকে রচনা করিবার জন্য মাল-মসলা সংগ্রহ করিতেছিলেন। এই পুস্তকের কয়েক অধ্যায় লিখিয়া তিনি মাসিক পত্রে প্রকাশও করিয়াছিলেন। কিন্তু এই কাজ তিনি সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই।

কলিকাতার রাস্তা ঘাটে সভা-সমিতিতে বহুবার মনুর সঙ্গে দেখা হইয়াছে। তাহার রামধনু পত্রিকায়ও কয়েকবার আমি লেখা দিয়াছি। সেবার শুনিয়া মর্মাহত হইলাম, মাত্র কয়েকদিনের অসুখে মনু চিরকালের মত আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে! তাহার বৃদ্ধ পিতা-মাতা এই নিদারুণ পুত্র শোক কি করিয়া ভুলিয়াছেন কল্পনা করিতে পারি না। কি স্কুল-জীবনে কি পরবর্তী জীবনে মনুর মত নিরহঙ্কারী লোক খুব কমই দেখিয়াছি। তখনকার দিনে ডেপুটি বা এস, ডি, ও, দের ছেলেরা বড়ই অহঙ্কারী ছিল। গরীব ছেলেদের সঙ্গে মিশিত না।

মনু কিন্তু সকলের সঙ্গেই সমান মিশিত। আজও মনে পড়িতেছে মনুর সেই শ্যামল লাবণ্য-ভরা বালক মুখখানি। আমারি ক্লাসের বন্ধু। আর তাহাকে খুঁজিয়া পাইব না।

স্কুলে পড়িতে দুইটি ঘটনা আমার মনে খুব দাগ কাটিয়াছিল। একদিন পরীক্ষার আগে শিক্ষকের নিকট হইতে প্রশ্নপত্র লিখিয়া লইতেছি। পাতলা কাগজে লেখা যায় না। তাই পাঠ্য-বইখানা কাগজের তলায় লইয়া লিখিতেছি। প্রশ্ন হইয়াছে খুব সহজ। তাই মনের আনন্দে কাগজের তলায় বইখানাসহ আমার নির্দিষ্ট স্থানে যাইয়া প্রশ্নগুলির উত্তর লিখিতে আরম্ভ করিলাম। আমার খাতার তলায় যে বইখানা রহিয়াছে তাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছি।

হঠাৎ হেডমাষ্টার আসিয়া খাতার তলা হইতে বইখানা বাহির করিয়া আমাকে টানিতে টানিতে তাঁহার ডেস্কের সামনে লইয়া গিয়া আমাকে বেদম বেত্রাঘাত করিলেন। আমি কতবার বলিলাম, ভুল বশতঃ বইখানা আমার খাতার তলায় ছিল। দেখুন স্যার! আমি একটি লাইনও বই দেখিয়া নকল করি নাই। কিন্তু কে আমার কথা বিশ্বাস করে? হেড্-মাষ্টারের মার যে খাইলাম, সেজন্য আমার ত দুঃখ ছিল না। কিন্তু সমস্ত স্কুলের ছাত্র-শিক্ষক জানিল আমি নকলকারী! আজ এই কথা লিখিতে সেই অপমানের আঘাত এখনও আমার মনে অনুভব করিতেছি। আমার পিছনে ফেলিয়া-আসা জীবনের অতীতের দিকে যতদুর চাই সেখানে এরূপ মিথ্যা অপরাধে বহু লাঞ্ছনার কাহিনী লিখিত হইয়া আছে।

আমার আত্মজীবনীর পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলীতে পাঠক এরূপ আরও কয়েকটি ঘটনার সঙ্গে পরিচিত হইবেন।

বাবু হেরম্বলাল দাস নামে একজন ভদ্রলোক আমাদের স্কুলে নতুন শিক্ষক হইয়া আসিলেন। তাঁহার শিক্ষা প্রণালী ছিল অভিনব। ছোটদের শিক্ষকতা করিতে তাঁহার মত এমন শিক্ষক খুব কমই পাওয়া যায়। তাঁহার মুখের কথা ছিল এমনি মধুময় যে তিনি ছাত্রদের কখনও মারধর করিতেন না। তাঁহার হাতের লেখাটি ছিল ছাপার অক্ষরের মত। পরবর্তীকালে আমি যখন কবি হইয়া উঠিয়াছি; তিনি

আমার 'বনফুল' নামে একখানা কবিতা-সংগ্রহের বই নকল করিয়া দিয়াছিলেন। সেই পুস্তকখানা বন্ধু মহলে এবং কোন কোন বন্ধুব পিতা-মাতাকে দেখাইয়া যে কত তারিফ পাইয়াছি তাহা ভাবিলে আজও গৌরবে আমার বুক ভরিয়া যায়। এরপর কোথায় সেই খাতাখানা যে হারাইয়া গেল আর খুঁজিয়া পাইলাম না।

হেরম্ব বাবুর ক্লাসে আমাদের আব্দারের অন্ত ছিল না। একবার কি একটা বিষয় লইয়া আমরা তাঁহাকে ঘিরিয়া গণ্ডগোল করিতেছি। এমন সময় হেড্ মাষ্টার আসিয়া আমাকে ধরিয়া বেদম বেত্রাঘাত করিলেন। বেতের আঘাতে আমার পিঠে দড়ির মত সাত-আটটি দাগ পড়িয়া গেল। ইহার পরবর্তী ক্লাস ছিল আমার পিতার। আমি একপাশে বসিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছি দেখিয়া তিনি আমার কাছে কাঁদিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি কিছুই বলিতে পারিলাম না। শুধু আমার পিঠের জামা তুলিয়া তাঁহাকে দেখাইলাম। কেবল মাত্র গোল-মাল করার জন্য আমার বয়সের এতটুকু ছাত্রকে এরূপ শাস্তি দেওয়ায় আমার পিতা বড়ই মনঃক্ষুন্ন হইলেন। তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া স্কুলের সেক্রেটারীকে আমার পিঠ দেখাইলেন। সেক্রেটারী মহাশয় আমার পিঠে স্নেহের হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "তাইতো শাস্তিটি একটু কঠোরই হইয়াছে।" আমার পিতার ইঙ্গিতে আমি বাড়ি চলিয়া আসিলাম ইহার পর আমার পিতার সঙ্গে সেক্রেটারী মহাশয়ের কি কি আলাপ হইয়াছিল জানি না। কিন্তু পরদিন হইতে সেই হেড্মাষ্টারকে আর স্কুলে আসিতে দেখিলাম না। শুনিয়াছিলাম, আমার পিতার সঙ্গে হেডমাষ্টারের মনোমালিন্য ছিল। তাঁহার কিছু না করিতে পারিয়া নিরপরাধ আমার উপরেই তিনি তাঁহার সকল রাগ ঝাড়িয়াছিলেন।

স্কুলে পড়িবার সময় আমার গায়ের জামাটি যখন ছিঁড়িয়া শতখণ্ড হইত তখনও আমার পিতা আমাকে নতুন জামা কিনিয়া দিতেন না। সেই ছেঁড়া জামায় মায়ের হাতের বহু তালি সত্ত্বেও আমার গায়ের আবরু রক্ষা করিতে পারিতাম না। কতবার বাজানকে বলিয়াছি, "আমার জামা কিনিয়া দেন।" আমার কথা বাজান কানেও তুলিতেন

না। আর জামা কিনিয়াই বা দিবেন কোথা হইতে? স্কুলে যে সামান্য বেতন তিনি পান তাহা দিয়া পরিবারের তেল-লবণ কেনার খরচই পোষাইত না। কিন্তু একথা আমি বুঝিতাম না। গায়ের জামাটি যখন মায়ের শততালি অগ্রাহ্য করিয়া বন্ধুদের ঠাট্টা-তামাশার উপকরণ হইয়াছে তখন কোন কোন দিন স্কুলে যাইবার সময় বাজানকে বেড় দিয়া ধরিতাম আজ আমার জামা না কিনিয়া দিলে স্কুলে যাইতে দিব না। কোন দিন বা একটা ঢিলা উঠাইয়া দেখাইতাম জামা না কিনিয়া দিলে এই ঢিল মারিব। বাজান তখন হাসিতে হাসিতে আমাকে লইয়া খলিফা-পট্টিতে যাইতেন। আমার সহপাঠিরা মনোহারি দোকান হইতে কত সুন্দর সুন্দর ছাঁটের রঙ-বেরঙের জামা পরিত। কিন্তু খলিফা-পট্টিতে সেরূপ জামা পাওয়া যাইত না। সেই বয়সে জামার মধ্যে সব চাইতে যে বড় আকর্ষণের বস্তু পকেট, যাহার মধ্যে কুল, কাঁচা পেয়ারা, আমের কুশী প্রভৃতি বালক বয়সের কত মহার্ঘ সম্পত্তিগুলি রক্ষিত করা যাইত, সেই পকেট খলিফা পট্টির তৈরী জামাগুলিতে থাকিত না। যদি বা কোন কোন জামায় থাকিত, তাহা এত ছোট যে দুই চারিটি পাকা কুল ভরিতেই পূর্ণ হইয়া যাইত। কিন্তু আমাদের জামা-কাপড় বাজান বরাবরই খলিফা-পট্টি হইতে কিনিতেন। সেখানে যাইয়া বাজান আমাকে ইচ্ছামত রঙের জামা নির্বাচন করিতে দিতেন। কিন্তু কিছুতেই আমি মনমতের রঙের জামা ঠিক করিতে পারিতাম না। এ রঙ যদি পছন্দ হয় অপর রঙ আমাকে আকর্ষণ করে। খলিফা-পট্টির সবগুলি দোকান ঘুরিয়া ঘুরিয়া জামার ছিট পছন্দ করি কিন্তু আমার অবস্থা হয় যেন বাঁশ বনে যাইয়া ডোম কানা। লাল, নীল, হলুদ কত রঙের জামা খলিফারা বাণ্ডিল খুলিয়া দেখায়। শুধু কি রঙ? এক এক রঙের উপর আবার নানা রকমের ছিঁট। তাহার ভিতরে মনের মতনটি খুঁজিয়া পাওয়া কি সহজ? আমার এই রঙ নির্বাচনে দেরী দেখিয়া বাজান বিরক্ত হইতেন না। তিনি নিজের পছন্দ মত কোন রঙ নির্বাচন করিয়াও আমার ঘাড়ে চাপাইয়া দিতেন না, যাহা আমি আমার ছেলেদের বেলায় প্রয়াই করিয়া থাকি। স্কুলে যাইবার আগে জামা নির্বাচন করিতে পারিলাম না বলিয়া স্কুলের ছুটির পরে আবার তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া খলিফা-পট্টিতে যাইতেন। তখন আবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমার

ছিঁট ও রঙ পছন্দ করিতাম। কোনটি পছন্দ হইলে তাহা গায়ে দিয়া এদিক ওদিক চাহিতাম। মনের ভাব এই—সকলে দেখুক, নতুন জামা গায়ে দিয়া আমাকে কেমন দেখাইতেছে। বাজান তাঁহার পকেট হইতে সিকি আধুলিগুলি বাহির করিয়া দুই তিন বার গণিয়া গণিয়া খলিফার হাতে জামার দাম তুলিয়া দিতেন, তখন নতুন জামা পরার সমস্ত আনন্দ আমার মন হইতে উবিয়া যাইত। বাজানকে বলিতাম, "এ জামাটার দাম যখন বেশী, ঐ অল্প দামের জামাটাই না লই।" বাজান বলিতেন, "নারে, ওটা যখন তোর পছন্দ হইয়াছে ওটাই তুই পর।"

নতুন জামা পরিয়া পুরাতন ছেঁড়া জামাটা বগলে করিয়া নাচিতে নাচিতে বাড়ি ফিরিতাম। সামান্য কিছু খাইয়াই পাড়ায় বাহির হইতাম সকলকে নতুন জামা দেখাইতে। পাড়ার কেহ কেহ আমার জামার কাপড় ধরিয়া পরীক্ষা করিত, তার দাম জিজ্ঞাসা করিত, তখন আমার বড়ই আনন্দ হইত। নতুন কাপড়ের সোঁদা সোঁদা গন্ধটি আমার বড় ভাল লাগিত। রাত্রে শুইবার সময় জামাটি বুকের মধ্যে লইয়া সেই গন্ধ শুঁকিতে শুঁকিতে ঘুমাইয়া পড়িতাম। আজও নতুন জামা পরিতে আমার বেশ ভাল লাগে। নতুন কাপড়ের গন্ধটি আমাকে সেই বালক-কালে লইয়া যায়।

কবিগান

একবার আমি আমার চাচার বিবাহের বরযাত্রি হইয়া শামসুন্দর পুর যাই। এই গ্রাম আমাদের বাড়ি হইতে প্রায় সাত মাইল দূরে। পরদিন ভোরে উঠিয়া দূরের কোন গ্রামে ঢোলের বাদ্য শুনিতে পাইলাম। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম পাঁচচর জমিদারের কাছারীতে কবি-গান হইতেছে। সেখান হইতে ঢোলের বাদ্য আসিতেছে। আমি সেই

ঢোলের বাদ্য অনুসর করিয়া ধীরে ধীরে জমিদারের কাছারীর দিকে আগাইয়া যাইতে লাগিলাম। খানিক যাইতেই ঢোলের বাদ্যের সঙ্গে গানের অস্পষ্ট সুরও কানে আসিতে লাগিল। সেই সুর যেন আমাকে স্বপ্নাবিষ্টের মত কবিগানের আসরের দিকে টানিয়া লইয়া চলিল।

সেখানে দুইদল কবি-গায়কের মধ্যে পাল্লা হইতেছিল। একজন যমের পাঠ লইয়া বলিতেছিল, "আমি যম। আমার প্রতাপ বিশ্বব্যপি। আমার হাত হইতে কেহ রক্ষা পাইতে পারে না।" তাহার প্রতিপক্ষ কবিয়াল সতীর পাঠ লইয়া বলিতেছিল, "আমার যদি সত্যকার প্রতিভক্তি থাকে তবে তুমি যম কিছুতেই আমাব পতিকে লইযা যাইতে পারিবে না।" নানা সুরের ধূযার সাহায্যে উপস্থিত বোল রচনা করিযা তাহারা এ-পক্ষে জবাজবি করিতেছিল। কবিযালেরা যখন তাল ছন্দ ঠিক রাখিয়া একটি পদের সঙ্গে অপর পদেব মিল দিযা উপস্থিত পদের বোল তৈরী করিতেছিল সেই মিলের আনন্দে আমার সর্ব দেহ-মন আলোড়িত হইতেছিল। গান শেষ হইল বেলা একটাব সময। গানের একটি ধূযা বার বার আবৃত্তি করিতে করিতে আমি বিবাহ বাড়িতে ফিরিযা আসিলাম। তখন দুপুরে খাওযা শেষ করিযা বর-কনেকে সঙ্গে লইযা বরযাত্রীরা দেশে রওযানা হইতেছে।

আমি খাইলাম কি না খাইলাম মনে নাই। বরযাত্রীর দলের কিছুটা পিছে পিছে চলিতে লাগিলাম, আর কবিগানের আশর হইতে শিখিয়া আসা সেই গানের কলিটি জোর গাহিতে লাগিলাম ঃ

ওহে যম রাজা! তুমি আমারে মন্দ বলোনা।
তারে নারে নাইরে নাবে, নারে নারে নারে নারে,
নাইরে নারে নারে নারে নাইরে নারে নারে না,
তুমি আমারে মন্দ বলোনা।

আঁকা-বাঁকা গ্রাম্য পথ দিয়া বর-কনেকে পাল্কীতে লইয়া বরযাত্রীর আগে আগে দল চলিয়াছে। এ-বাড়ি ও-বাড়ি হইতে বউঝিরা বাহির হইয়া মাথাভরা ঘোমটার ফাঁকে পাল্কীর ভিতরের বর-কনেকে এক নজর দেখিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছিল। তাহাদের একঘেয়ে গ্রাম্য-জীবনে এই ঘটনা কি কম বৈচিত্রময়? গাছের ডালে দু'একটি পাখি সুমিষ্ট স্বরে

গান গাহিতেছিল। সেদিকে আমার কোনই খেয়াল নাই। আমি শুধু গাহিয়া চলিয়াছি।

ওহে যমরাজা! তুমি আমারে মন্দ বলোনা।

এ কি সুর! একি মাদকতা!

ওহে যমরাজা! তুমি আমারে মন্দ বলোনা।
নারে নারে নাইরে নারে নারে না,
নাইরে নারে নারে নারে নাইরে নারে নারে না'
তুমি আমারে মন্দ বলোনা।

বরযাত্রীরা অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। এখন আমার আরও স্বাধীনতা। নাচিয়া নাচিয়া কেবল এই সুর গাহিতেছি। এইরূপ গাহিতে গাহিতে সুরের ভিতরে যেখানে নারে নারে করিতেছিলাম সেখানে যা তা ইচ্ছামত কথা জুড়িয়া দিয়া ছন্দের পরিমাপ বিষয়ে আমার মনে একটা ধারণা আসিল। তারপর হঠাৎ কথার সঙ্গে কথা আসিয়া কেমন করিয়া যেন একের সঙ্গে অপরের মিল হইয়া গেল। তখন আর আমাকে পায় কে; সারা পথ ইচ্ছামত উপস্থিত বোল রচনা করিয়া গান গাহিতে লাগিলাম। সে কি আনন্দ! কথার সঙ্গে কথা আসিয়া যখন মিলের বন্ধন পড়িতেছে, তাহার তালে তালে আমার বুক নাচিয়া উঠিতেছে।

বাড়ি ফিরিয়া কবিগান গাহিয়া বাড়ির সকলকে বিরক্ত করিয়া তুলিলাম। পরদিন সকালে নদীর তীরে যাইয়া নাচিয়া নাচিয়া আবার কবিগান অভ্যাস করিতে লাগিলাম। এইভাবে সাত আট দিন সমানে আমার কবিগানের রিহার্শাল চলিল।

তাঁতীপাড়ার রহিম মল্লিকের কথা আগে কিছু বলিয়াছি। গ্রাম সম্পর্কে তাহাকে চাচা বলিয়া ডাকি। সে কিছুটা মনোক্তি করিয়া কবিগান গাহিতে পারিত। একদিন সকালে যাইয়া চাচাকে ধরিলাম, "চাচা! তোমার সঙ্গে আমি কবিগানের পাল্লা করিব।" চাচা তাঁত চালাইতে-ছিল। চাচী নানা রঙের সূতা চরকায় ভরিয়া উঠানে গাড়া কাঠিগুলিতে তেনা কাড়াইতেছিল। চাচীর সৌন্দর্যের কথা গ্রামগুলিতে প্রবাদের মত ছিল। চাচা চাচীকে ডাকিয়া বলিল, "আমাগো বাড়ির উনি শুনিবে

নাকি? আজ চাচা-ভাজতের কবির লড়াই হইবে।"

চাচী একপাশে দাঁড়াইয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কিন্তু চাচার তাঁত চালান কি সহজে থামে? প্রায় ঘণ্টা দুই বসিয়া রহিলাম। তাঁতের মধ্যে মাকুটি যেমন এদিক-ওদিক ঘুরিতেছিল তেমনি আমার মনের মধ্যে করিতেছিল। অনেকক্ষণ পর চাচা তাঁত ছাড়িয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়া আমাকে প্রথম পালা গাহিতে বলিল। আমি যম-রাজা হইয়া চাচাকে সতীর পক্ষ বানাইয়া কিছুটা ছড়া গাহিয়া তাহাকে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে আহ্বান করিলাম। চাচা উঠিয়া সতীর পক্ষ না লইয়া আমার অনাগত শাশুড়ীকে লইয়া নানা রকম ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়া তাহার পালা শেষ করিল। তখন আমি কোমর বাঁধিয়া আমার সেই না-আসা শাশুড়ীকে সমর্থন করিয়া পদ রচনা করিতে লাগিলাম। তারপর চাচার শাশুড়ীর রূপের বর্ণনা আরম্ভ করিলাম। তার নাক ছিল মহিষ কাটার খাঁড়ার মত। মশায় লাথি দিয়া বোঁচা করিযা দিয়াছে। কান দুইটি ভাঙ্গা কুলার মত। সেই কানে ভাঙ্গা কোদালের নোলক পরিয়া গজারী খামের মত পা ফেলিয়া সেই সুন্দরী যখন ধাপুর ধুপুর করিয়া হাঁটে তখন উঠানের মাটি কাঁপিয়া উঠে। ইত্যাকার বর্ণনা শুনিয়া চাচী হাসিয়া বুটি কুটি হইতেছিল। আমাদের উপস্থিত বর্ণনা মাঝে মাঝে শ্লীল-অশ্লীলের মাত্রা ছাড়াইয়া যাইতেছিল। কিন্তু গ্রাম দেশে কে অতটা গণ্য করে। দুই-এক পালা গাহিয়াই চাচা স্নান করিতে চলিল। আমার কিন্তু গান গাহিয়া তৃপ্তি হইল না। সারাদিনও যদি এরূপ পাল্লা করিয়া গান গাহিতাম তবুও হয়তো আমার মনের সাধ মিটিত না। ইহার পরে ছোট গাঙের পুলের এপারে নদীর ঘাটে বহু জায়গায় চাচার সঙ্গে পাল্লা করিয়াছি। সমস্ত পাল্লারই বিষয়-বস্তু ছিল যার যার শাশুড়ী।

শোভারামপুরে সুতোর পাড়ায় একজন বৃদ্ধ লোক ছিল। আমার মত তারও কবি গান গাওয়ার সখ। একদিন সুতোর পাড়ায় যাইয়া তাহাকে ধরিলাম কবিগানের পাল্লা করিতে। আমাদের পাল্লা শুনিবার জন্য গাঁয়ের বহুলোক আসিয়া জড় হইল। গান শেষ হইলে একজন বৃদ্ধলোক বলিল, "এই ছেলেটি বাঁচিয়া থাকিলে একজন বড় কবিয়াল হইবে।"

তখন আমার কি-ই বা বয়স। বোধহয় সাত আট বৎসর। কিন্তু বৃদ্ধের এই ভবিষ্যত-বাণী স্বার্থক করিবার জন্য প্রাণপনে কবিগান আয়ত্ব করিতে লাগিলাম। পার্শ্ববতী হিন্দুপাড়ায় যখন যেখানেই কবিগান হয়, খবর পাইলেই আমি সেখানে যাইয়া উপস্থিত হই। কবিগান আরম্ভ হইত রাত এগারটা বারোটায়। তার পরদিন বেলা দেড়টা দুইটা পর্যন্ত গান চলিত। আজকাল আগের মত সেইরূপ কবিগান শুনি না। আগে প্রত্যেক কবির দলে আট দশ জন করিয়া দোহার থাকিত। তাহারা কখনও দাঁড়াইয়া কখনও নিলডাউন হইয়া কানে আঙ্গুল দিয়া প্রতিপক্ষের উত্তর প্রতি-উত্তর অবলম্বন করিয়া যে গান গাহিত তাহাকেই সত্যিকার কবিগান বলে। এই গানের সুরের মধ্যে কীর্তনের সঙ্গে বাউল, ভাটিয়ালী ইত্যাদি সুরের মিশ্রন ছিল বলিয়া উহা জনগনের হৃদয়গ্রাহী হইত। প্রত্যেকটি গানে আবার চিতান পরচিতান প্রভৃতি নানা পর্যায় ছিল। এই সব গান যাহারা রচনা করিত বা গাহিত, কবির দলে তাহদেরই সম্মান ছিল বেশী। উপস্থিত বোল বলিয়া যাহারা ছড়া রচনা করিত তাহাদের সম্মান তত ছিল না। তাহারা ছড়াদান নামে পরিচিত ছিল। আজকাল কবির দলের গানগুলি একমাত্র ছড়া-সর্বস্ব হইয়া উঠিয়াছে।

আগেকার দিনে কোন কোন গানের দলে তিন চারজন স্ত্রীলোক গাহিয়া থাকিত। রাত্রি ভোর হইলে তাহারা যখন কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া বিলম্বিত লয়ের ভোর গানগুলি গাহিত তখন শ্রোতাদের সকলেরই চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইত।

> "কালো কোকিল তুই ডাকিস নারে আর।
> নিশি প্রভাত কালেতে প্রাণনাথ নাই যার ঘরেতে
> কি করিয়া বলরে কোকিল জীবন রহিবে রাধার।"

আমার বালক-কালে যাদব সরকার আর পরিক্ষিত সরকারের গান শুনিয়াছি। যাদবের ছড়া রচনায় নানা রকমের সুর ও ছন্দ থাকিত। পরিক্ষিত পাল্লা করিয়া যাদবের সঙ্গে পারিত না। কিন্তু আমার মনের সমস্ত সমর্থন ছিল পরিক্ষিতের প্রতি। যেখানেই কবিগান হইত সেখানেই আমার মন দুর্বল পক্ষের প্রতি আকৃষ্ট হইত। পদ্মা-পার হইতে আসিত

হরিচরণ পাটনী। সে যাদবের সঙ্গে পাল্লায় পারিত না। কিন্তু আমার কেবলই মনে হইত, হরিচরণ যেন পাল্লায় জয়লাভ করে। শুধু এই কবিগানই নয়, আজীবন সাহিত্য করিতেও আমি দুর্বল পক্ষ চাষী-মজদুর-দিগকে সমর্থন করিয়া আসিতেছি। যাহাদের লইয়া বলিবার কেহ নাই তাহাদের সবচাইতে বড় সমর্থক হইবার চেষ্টা করিয়াছি।

সেকালে আমাদের ফরিদপুর জেলার রাজবাড়ী অঞ্চলে ইসমাইল নামে একজন কবিয়ালের উদয় হয। আসরে ছড়া রচনা করিতে সে পয়ার, ত্রিপদী, তোটক প্রভৃতি বহু রকমের ছন্দ ইচ্ছামত তাহার শ্রোতাদের মধ্যে ছুড়িয়া মারিত। ছন্দে আর মিলে এত যে পারদর্শী ছিল যাদব সে-ও ইসমাইলের তুলনায় এতটুকু হইয়া যাইত। হিন্দু পৌরাণিক শাস্ত্র ছিল তাহার নখদর্পণে। তাহারই সাহার্য্যে সে তাহার প্রতিপক্ষকে আঘাতের পর আঘাত করিয়া একেবারে তুলা-ধুনা করিয়া ছাড়িত। হিন্দু সমাজের যেসব গোপন তত্ব, যাহা শুধু গুরু পরম্পরায় শিক্ষা করিতে হয়, ইসমাইল তাহা আসরের শ্রোতাদের মধ্যে ভাঙ্গিয়া বলিত। অনিয়মিত রাত্র জাগরণ ও অসময়ে আহারের জন্য অল্প বয়সেই তাহার মৃত্যু হইল। তাহার সমসাময়িক কবিয়ালেরা ইহার ব্যাখ্যা করিত, হিন্দু সমাজের সাধন পথের গোপন তত্বগুলি যেখানে সেখানে বলার জন্য তাহার এরূপ অকাল মৃত্যু হয়।

আমাদের বাড়ি হইতে তিন মাইল দূরে লক্ষ্মীপুর গ্রামে একবার প্রসিদ্ধ কবিয়াল হরি আচার্যের কবিগানের ব্যবস্থা হয। আমাদের দেশের যাদব, পরিক্ষিত, গুরুচরণ প্রভৃতি কবিয়ালেরা সকলে মিলিয়া তাহার প্রতিপক্ষ রচনা করে ; কিন্তু স্রোত-ভাসা শুকনো পাতার মত তাহার হরি আচার্যের সরস ও তীক্ষ্ণ বাক্যচ্ছটায় ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। তখন আমার বয়স খুব অল্প। হরি আচার্য আসরে গান করিতে শ্রোতাদের মধ্যে যে অপূর্ব ভাববন্যা আনয়ন করিতেন তাহা অনুভব করিবার মন তৈরী হয় নাই। লোকমুখে শুনিয়াছি আসরে গান গাহিয়া তিনি এরূপ ভাববন্যা আনিতেন যে শ্রোতারা তাহাতে বিভোর হইয়া উঠিত। পরিণত বয়সে আমি একবার হরি আচার্য মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিয়াছিলাম। তখন তিনি কবিগান ছাড়িয়া দিয়া সন্যাসী হইয়া

ঢাকা জেলার নরসিংহদিতে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কত আদর করিয়া তিনি আমাকে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার রচিত 'কবির ঝংকার' ও 'বঙ্গে কবিগান' নামে দুইখানি পুস্তক আমাকে উপহার দিলেন। কবির ঝংকার দুই খণ্ড পুস্তকে আচার্য মহাশয়ের কবিগানগুলি প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গে কবিগান' পুস্তকে তিনি সারাজীবন যে সব কবিয়ালের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাহাদের কথা লিখিয়াছেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আপনার রচিত নিমাই সন্ন্যাস গানটি যদি আমি আগে শুনিতাম তবে হয়ত আমার 'কবর কবিতা রচনা করিতাম না। আপনার নিমাই সন্ন্যাস গান যে আসরে গীত হয়, শ্রোতারা কাঁদিয়া বুক ভাসায়। এমন মধুর গান আপনি ছাড়িয়া দিলেন কেন?'

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "তখন যৌবনের জোর ছিল, প্রতিপক্ষকে ঠকাইয়া আনন্দ পাইতাম। আজ আমার দেবতার কাছে গান গাহিয়া নিজেকে ঠকাইয়া আনন্দ পাই।"

আচার্য মহাশয়ের পুস্তকগুলি দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। এগুলি সংগ্রহ করিয়া কোন বড় পুস্তকাগারে রক্ষিত হইলে যাঁহারা কবিগানের ইতিবৃত্ত খুঁজিবেন তাঁহারা অনেকখানি উপকৃত হইবেন।

ইহার পরে আমি আরও বহু কবিয়ালের গান শুনিয়াছি। সুযোগ পাইলেই কবিগান গাওয়ার সখ আমাকে পাইয়া বসিত। আমাদের ফরিদপুর শহরে কালিপদ দাস নামে আমার একজন বন্ধু আছে। আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করি তখনও ফরিদপুর গেলে সুযোগ মত তাহার সঙ্গে কবির লড়াই করিয়াছি। কালিপদ হিন্দু-পৌরানিক কাহিনী আমার চাইতে বেশী জানে। সে তাই পুরান হইতে কোন কাহিনী লইয়া আমাকে প্রশ্ন করিতে ভালবাসিত। আমি তাহাকে উপস্থিত বুদ্ধি আর রচনা শক্তি দিয়া হারাইতে চেষ্টা করিতাম। ফরিদপুর শহরে নানা স্থান হইতে কবি-গান গাওয়ার জন্য আমাদের নিমন্ত্রণ আসিত।

একবার আমিও কালিপদ রাত দুপুরে রাজকুমার চৌধুরীর বাড়ির সামনে মাঠে কবি গান গাহিতেছি। কালিপদ মুরারীগুপ্তে পাঠ লইয়া আমাকে গৌরাঙ্গ করিয়া প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল। ইতিপূর্বে আমি যত

কবির পাল্লা শুনিয়াছি ইত্যকার পাঠ লইয়া কোথাও কবি গান হইতে দেখি নাই। তাই কালিপদ আমাকে নানা প্রশ্ন করিয়া একেবারে ঘায়েল করিয়া তুলিল।

শ্রোতাদের মধ্যে যে প্রসিদ্ধ কবিয়াল মনোহর বিশ্বাসও একজন ছিলেন তাহা আমি জানিতাম না। আমার বিপদ দেখিয়া মনোহর বাবু আসিয়া আমার হইয়া কালিপদকে তার প্রশ্নের উত্তর দিতে নানা রকম চাপান দিয়া তাহাকে একেবারেই ঘায়েল করিয়া তুলিলেন। মুরারী গুপ্ত ত্রেতা-যুগে হনুমান ছিল। কালিপদ গান গাহিতে মাজা নাচাইতেছিল। মনোহর বাবু তাহাকে চাপান দিয়া বলিলেন, "কলি যুগে তোমার লেজ নাই, তবু লেঙুর নাড়ার অভ্যাসটা ছাড়িতে পার নাই।" প্র য় ঘণ্টা খানেক তিনি ছড়া বলিয়া উপস্থিত শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে মন্ত্রদুগ্ধ করিয়া তুলিলেন।

তাঁহার গানের পর কালিপদ আর পাল্টা আসরে গান গাহিতে সাহস করিল না।

পরে পরিচয় লইয়া জানিলাম, মনোহর বাবু আমার বিশেষ বন্ধু ব্যারিষ্টার কবি শুরেশ বিশ্বাসের পিতা। গোপালগঞ্জ অঞ্চলের ওড়াকান্দি গ্রামে হরিহর আর মনোহর দুই ভাই কবি গান করিতেন। তাঁহারা কবি-গানকে বর্তমান যুগের চাহিদা অনুসারে ঢালিয়া সাজাইয়া লইয়াছিলেন। আগেকার দিনে বড় বড় গায়কেরা গ্রাম অঞ্চলেই বাস করিতেন। স্থানীয় কোন যাত্রা বা কবি গানের দলে গান করিয়া যৎসামান্য যাহা পাইতেন, তাহাই সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিতেন। প্রচুর অর্থ না পাইলেও জনসাধারণকে আনন্দ দিয়াই তাঁহারা খুশী থাকিতেন।

কালক্রমে শহর তার সর্বগ্রাসী আকর্ষণ বিস্তার করিয়া গ্রাম-অঞ্চল হইতে গুণী লোকদিগকে নিজের অঙ্কে টানিয়া লইল। গ্রামোফোন, থিয়েটার-বায়স্কোপ, বেতার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে প্রচুর অর্থ উপার্জনের সুবিধা পাইয়া দেশের গুণী গায়কেরা শহরে চলিয়া গেল। যাহারা রহিল তাহাদের গান শুনিয়া আর আসরের লোকেরা খুশী হয় না। এই সব গায়কেরা কবি গানের দোহার হইয়া কানে আঙ্গুল দিয়া

বিলম্বিত লয়ের সে সব ভোর বা ডাক গান গাহিত তাহা শুধু শ্রোতা সাধারণের উপহাসই আনয়ন করিত। সেইজন্য হরিবর আর মনোহর দোহারের বিলম্বিত লয়ের গানগুলি বর্জন করিয়া কবি গানকে ছড়া-সর্বস্ব করিয়া তোলেন। পূর্বকালে কবি-গানে সতীর সঙ্গে যম রাজার অথবা কৃষ্ণের সঙ্গে মহাদেবের পাণ্টা বর্জন করিয়া তাহারা বিবেকানন্দের সহিত রবীন্দ্র নাথের, বিজয় গোস্বামীর সঙ্গে কেশব সেনের পাণ্টা প্রবর্তন করেন। হরিবর আর মনোহর দুই ভাই বিরাট প্রতিভাপন্ন লোক ছিলেন। যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তাঁহারা জনসাধারণের তারিফই পাইয়াছিলেন। তাঁদেরই অনুকরণে দেশের অন্যান্য কবি গানের দলও জুড়ির গান বর্জন করিয়া কবি গানকে ছড়া সর্বস্ব করিয়া সাজাইলেন। কিন্তু যে শিক্ষিত সমাজের জন্য তাঁহারা কবি-গানকে ঢালিয়া সাজাইলেন নিজেদের গান দিয়া তাহাদের মনোরঞ্জন করিতে পারিলেন না। তাহারা শহরের থিয়েটার, রেডিও, বায়স্কোপ প্রভৃতি লইয়া মশগুল রহিলেন।

কবির লড়াই স্থান শহরের বিতর্কসভাগুলি দখল করিল। পক্ষান্তরে গ্রাম জীবনে যে একটি বিরাট অংশ কবি-গানের রস পিপাসু ছিলেন, তাহারাও হরিবর-মনোহরের এই রূপান্তরিত কবি গান হইতে সরিয়া গেলেন। হরিবর মনোহরের পরে যাহারা তাহাদের অনুকরণে কবি গান প্রচারে নামিলেন, তাহারা আর ওই পথে বিশেষ কিছু করিয়া যাইতে পারিলেন না।

সেটা বোধ হয় ১৯৩২ সন। ওড়াকান্দির রাজেন সরকার তার দুই শিষ্য বিজয় আর নিশিকান্তকে লইয়া আমার কলিকাতার মেসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া জানিলাম তাহারা সদলবলে আসিয়াছেন কলিকাতায় কবিগান প্রচারের জন্য। দলের অন্যান্য গায়কেরা নৌকায় অবস্থান করিতেছে।

কলিকাতার এলবার্ট হল ভাড়া লইয়া নির্দিষ্ট তিন দিন তাহাদের কবি গানের ব্যবস্থা করিলাম। টিকেটের মূল্য তিনটাকা, একটাকা আর চার আনা। তারপর আমার মেসে সারাদিন চলিল তাহাদের গানের মহড়া। যে সব ধূয়ার সুর চটকদার এবং বিলম্বিত লয়ের

করুণ সুর, সে গুলিকে দিয়া নূতন করিয়া পালটি রচনা করিয়া দিলাম। শহরের লোকেরা বহুক্ষণ গান শোনে না। তাই প্রত্যেক পাল্‌টিতে একঘণ্টা সময় নির্দেশ করিলাম। বন্দনা গাহিয়া আর এক গান বার বার গাহিয়া সময় নষ্ট না করার নির্দেশও দিলাম। কলিকাতার কাগজ-গুলিতে কবি গানের উপর নানা খবর ও প্রবন্ধ ছাপাইবার ব্যবস্থা করিলাম। তখনকার এসোসিয়েট প্রেসের মিঃ নিয়োগী এই ব্যাপারে আন্তরিকতাপূর্ণ সহায্য করিযাছিলেন।

নির্দিষ্ট দিনে এলবার্ট হলে কবিগান হইল। তেমন আশানুরূপ জনসমাগম হইল না। পূর্ণ ভট্টাচার্য নামে এক ব্যক্তি "আনন্দ বাজার পত্রিকায়" এক বিবৃতি দিলেন। তার বক্তব্য ছিল, কবি গানকে এই দলের লোকেরা আধুনিক রূপ দিযা ইহার রসাত্মক দিকটিকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। সখি-সংবাদ, ভোরগান প্রভৃতি যাহা কবি গানের অলঙ্কার স্বরূপ ছিল, তাহা বর্জন করিয়া ইহারা কবি গানকে ছড়া-সর্বস্ব বানাইযা কবিগানের আসল রূপটিই নষ্ট করিযাছেন। ইত্যাকার সমালোচনার পরদিন আর কবি গানে তেমন জনসমাগম হইল না। রাজেন সরকার আশা-ভঙ্গ হইয়া পাগলের মত হইয়া পড়িলেন। সঙ্গী সাথী-দিগকে দেশে পাঠাইতে রাজেন সরকারকে তার বহুকালের সঙ্গী নৌকাখানিকে বিক্রয় করিয়া দিতে হইল। কত আশা লইয়াই তিনি কলিকাতা আসিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রাম-দেশের মানুষ যে এখানে আসিয়া তাহার রুচী বদলাইয়াছে, আর যে তাহারা গ্রাম-বাঙলার সেই রস-ধারায় ফিরিয়া যাইবে না একথা হতভাগ্য রাজেন সরকার জানিতেন না।

তিনি যথাসর্বস্ব খোয়াইয়াও কলিকাতা ছাড়িয়া গেলেন না। পাগলের মত কেবল বলিতেন, "কলিকাতায় কবি গান প্রচার না করিয়া আর আমি দেশে ফিরিয়া যাইব না।" শুনিতে পাই এখনও তিনি নাকি কলিকাতায়ই আছেন। বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। আগের মত কণ্ঠস্বর নাই। কলিকাতার আশে পাশে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের বসতি প্রধান স্থানে কবি গান গাহিয়া বেড়ান। আধুনিক সমাজে লোক-সংগীত প্রচারের ইতিহাস যদি কেহ লেখেন রাজেন সরকারের এই প্রচেষ্টা সেখানে একটি বড় স্থান অধিকার করিবে।

কবি গান উপলক্ষে বিজয় আর নিশিকান্তের সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব হইয়া পড়ে। আমার ঘরে বহুবার তাহাদের সঙ্গে কবি গানের পাল্লা দিয়াছি। একবার কলিকাতা বেতারে রাজেন সরকারের সঙ্গেও পাল্লা দিয়াছিলাম। আমাদের পাল্টার বিষয়বস্তু ছিল হুঁকো আর কলকে।

রাজেন সরকারের সঙ্গে তাহার গুরু সেকালের প্রসিদ্ধ কবিয়াল হরিবরও আসিয়াছিলেন। তিনি তখন বৃদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু আসরে নামাইয়া দিলে তখনও ছড়া রচনায় তাহার উৎসাহের অন্ত ছিল না। করুণ রসের কোন কাহিনী বর্ণনায় তিনি নিজে কাঁদিয়া শ্রোতাদিগকেও কাঁদাইতেন।

রাজেন সরকারের দুই শিষ্য বিজয় আর নিশিকান্ত এখন নামকরা কবিয়াল। উভয় বঙ্গে তাহারা কবি গানের বায়না পাইয়া থাকেন। বহুদিন উহাদের সঙ্গে দেখা হয় না। মাঝে মাঝে দেশীয় গ্রাম্য গায়ক-দের মুখে বিজয়ের রচিত বিচ্ছেদ গান শুনিয়া পাগল হই। এমন সুন্দর সুর বুঝি কেহই রচনা করিতে পারে না। ছাপাখানা বা রেডিও গ্রামোফোনের সাহায্য ব্যতিরিকে বিজয়ের নতুন সুরের গানগুলি গ্রাম-বাংলার সর্বস্তরে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

আগেকার দিনে কবির আসরে দোহারদের মুখে যে সব সখী সংবাদ, ভোর, মান, বিরহ, ডাক প্রভৃতি গান শুনিয়াছি এখনকার কবিয়ালেরা তাহা জানে না। সেই পরিক্ষিত, যাদব, ইসমাইল হরি আচার্যের তিরোধানের পর তাঁহাদের শ্রোতারাও আজ ধীরে ধীরে নাট্য-মঞ্চ হইতে প্রস্থান করিতেছে।

এই ভাবে নানা কবিগানের আসরে যাইয়া আমি নানা ছন্দে ছড়া তৈরী করিবার শিক্ষালাভ করিলাম। নানা সুরের ধুয়ার সঙ্গে পদ যোজনা করিতে করিতে আমার নানা ছন্দের ছড়া রচনার অভ্যাস হইল। কয়েকটি ধূয়া এখনও মনে আছে, প্রতিপক্ষকে চাপান দিতে নিম্নলিখিত ধূয়াগুলি আগেকার কবিয়ালেরা ব্যবহার করিত :

১। মরি হায়রে হায় এই ছিল কপালে,
লক্ষ টাকার বাগান খাইল পাঁচ সিকের ছাগলে!

২। ও তুই যাইস নারে, যাইস না কবির দলে,
রাত পোহালে মঙ্গলবার ধুতুম ডাকে চালে।

৩। তেনে তেনে তনে নেনে নাচেরে চান্দের কণা
মামা শ্বশুর হও গোবিন্দ ভাবে গেল জানা।

৪। গোঁসাই লেজ নাড়ে আর খাজুর খায়,
গোঁসাইরে নি দেখছ গাছ তলায়।

কতগুলি গীতি-ধর্মী ধূয়াও গাহিতাম ঃ

১। রে অবোধ মন! অবোধ মন!
পূর্বের কথা নাইরে তোর মনে?

২। পরের জন্য কান্দেরে আমার মন,
আমি পর পর করে পরকাল খোয়াইলামরে;
আমার সেই পরে দেয় জ্বালাতন।

৩। আমার কৃষ্ণ ভক্তের পাগলা নাও,
শুকনা দিয়ে বায়া নাও,
কাঁটা গোঁজা মানে না।

৪। বড় ভাব লাগায়ে দিলি মনেরে,
বড় ভাল লাগায়ে দিলি মনে।

এই সব ধূয়ার সঙ্গে পদ রচনা করিতে করিতে আপনা হইতেই নানা ছন্দে কবিতা রচনা করিবার অভ্যাস লাভ করিলাম। কিন্তু তখনও আমি জানিতাম না, আমার এই উপস্থিত-রচিত বোলগুলি আমারই অগোচরে কবিতা হইয়া যাইতেছে? তখনও আমার বিশ্বাস ছিল পাঠ্য-বই-এর কবিতাগুলি আকাশ-মাটি-পৃথিবীর মত চিরকাল হইতেই আছে অথবা খোদা স্বয়ং রচনা করিয়া দিয়াছেন। মানুষ এগুলি রচনা করিতে পারেনা।

কবিতা রচনা

আমার যতদূর মনে পড়ে, আমাদের শহরের ইশান স্কুলে খিরোদ বাবু নামে একজন পণ্ডিত মহাশয় আসিলেন। শুনিতে পাইলাম তিনি একজন কবি এবং আমাদের পাঠ্য বইতে যে সব কবিতা আছে তেমনি কবিতা তিনি রচনা করিতে পারেন। আরও খবর পাইলাম, তিনি আমাদের স্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রদ্ধেয় বাবু যোগেন্দ্র নাথ সেনের বাড়িতে থাকেন। শুনিয়া বড়ই আশ্চর্য হইলাম। যে লোক কবিতা লিখিতে পারেন, কেমন তিনি দেখিতে, কেমন তাঁহার চাল-চলন, জানিবার কৌতুহল আমার বালক-মনকে বার বার দোলা দিতে লাগিল। একদিন সত্য সত্যই তাঁহার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে খুবই স্নেহের সঙ্গে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার রচিত কয়েকটি কবিতাও পড়িয়া শুনাইলেন। তাঁহার সুন্দর ব্যবহারে আমার মন তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল বটে কিন্তু কবি বলিতে আমি যে একজন কিম্ভুত কিমাকার লোককে মনে মনে কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিলাম তাহা যখন ভাঙ্গিয়া চুরমার হইল তখন বেশ নিরাশ হইয়া পড়িলাম।

ইহার পরে বাড়ি আসিয়া আমার পিতার ছোটবেলার একখানা পাঠ্য বই খুঁজিয়া পাইলাম। সেই বই-এর অর্দ্ধেক উঁইএ কাটিয়া ফেলিয়াছে। সেখান হইতে ঈশর-বিষয়ক একটি কবিতার সামান্য কিছু অদলবদল করিয়া নিচের লাইন উপরে দিয়া উপরের লাইন নিচে দিয়া আমার খাতায় টুকিয়া লইলাম। সেটি বন্ধুদের দেখাইলে তাহারা পড়িয়া অবাক হইল। তাহাদের সম-বয়সী আমি যে সত্য সত্য একটি কবিতা লিখিতে পারিয়াছি জানিয়া তাহারা আমার শত শত প্রশংসা করিতে লাগিল। সেই কবিতার দু'টি লাইন এখনও আমার মনে আছে।

তুমি ভীম-ভবার্ণবে ভাসিবার ভেলা,
তোমাকে প্রণাম কালে করি অবহেলা।

ইহার পর আমার পিতার সেই পুরাতন পাঠ্য পুস্তক হইতে আর কবিতা টুকিয়া লওয়া যায় না। আর সব কবিতার ভাষা কঠিন। কেহ অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা! মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম কি করিয়া নতুন কবিতা রচনা করা যায়? প্রথম বারের রচিত কবিতাটি বন্ধুদের নিকট পড়িয়া পড়িয়া পুড়ান করিয়া ফেলিয়াছি। নতুন কবিতা না হইলে আর তাহাদিগকে আশ্চর্য করা যায় না।

শুনিয়াছিলাম, কবিতার প্রত্যেক লাইনে চৌদ্দটি অক্ষর থাকিবে আর প্রত্যেক লাইনের শেষ অক্ষরের সঙ্গে দ্বিতীয় লাইনের শেষ অক্ষরের মিল থাকিবে। কাগজ-কলম লইয়া ভাবিতে ভাবিতে থামিয়া যাই, নদীর ধারে বসিয়া ওপারের চরের দিকে চাহিয়া থাকি কিন্তু কিছুতেই চৌদ্দ অক্ষরের লাইন মিলাইতে পারিনা। মাঝে মাঝে রাগ করিয়া মাথার চুল ছিঁড়ি।

একদিন হঠাৎ আমার মনে হইল, আমি যে উপস্থিত ভাবে কবি-গানের বোল রচনা করিতে পারি তাহা খাতায় লিখিলে কেমন হয়? তিন চার জোড়া বোল খাতায় লিখিয়া আশ্চর্য হইলাম। তাহার প্রত্যেক লাইনে চৌদ্দ অক্ষর, আর প্রত্যেক লাইনের শেষ অক্ষরের সঙ্গে দ্বিতীয় লাইনের শেষ অক্ষরের মিল আছে। এই আবিষ্কারে আমার মনে যে আনন্দে হইল কলম্বাস আমেরিকা আবিস্কার করিয়াও সেই আনন্দ পাইয়াছিলেন কিনা মনে সন্দেহ জাগে। এত দিন আমি সুরের সঙ্গে পদ রচনা করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলাম। সুর না করিয়া শুধু কথার ছন্দে পদ রচনা করিতে পারিতাম না। আজ যখন সুরের সঙ্গে রচিত পদ, কথার ছন্দে রচিত পদের সঙ্গে এক বলিয়া আবিস্কার করিলাম তখন আর আমাকে পায় কে! খাতার পর খাতা লিখিয়া চলিলাম। প্রায় অধিকাংশ কবিতার বিষয়-বস্তু ছিল সংসারের অনিত্যতা বিষয়ক। তখনকার বয়সে বড়দের আলাপ-আলোচনায় যাহা যাহা শুনিতাম, তাহাই আমার কবিতার বিষয়-বস্তুতে পরিণত করিতাম। খিরোদ বাবু আমার কবিতাগুলি পড়িয়া খুব তারিফ করিতেন। কিন্তু যাহাদের তারিফের জন্য এত সাধ্য-সাধনা করিয়া কবিতা লিখিতাম সেই বন্ধু-মহলের অনেকেই মন্তব্য করিত, "এ কবিতা কিছুতেই তোমার রচনা নয়। তুমি হয়ত কোথা হইতে

টুকিয়া আনিয়াছ।" কিন্তু কি করিয়া আমি প্রমাণ করিব এই কবিতা আমি টুকিয়া আনি নাই, নিজের রচনা করিয়াছি। একান্তে বসিলে আমার চোখ অশ্রুশিক্ত হইত।

বন্ধুদের এই সন্দেহের কথা খিরোদ বাবুকে বলিলে তিনি সস্নেহে আমাকে বলিলেন, "তোমার বন্ধুরা যে বলে তুমি অপরের রচনা নকল করিয়া তাহাদের দেখাইতেছ, ইহাতেই ত তাহারা তোমাকে কবি বলিয়া স্বীকৃতি দিয়াছে। পরোক্ষে তাহারা বলিয়াছে তুমি অপর কবিদের মত লিখিতে পার।" কিন্তু ইহাতে কি আমার মন সান্তনা মানে?

তখনকার দিনের একটি কবিতার কথা মনে আছে। ইহার সাত লাইনের স্তবকের পরে এই লাইনটি যুক্ত থিল।

মাকাল উহার নাম ভিতয়ে গরল।

ইহার পর ক্লাসের সাময়িক ঘটনা অবলম্বন করিয়া কবিতা লিখিয়া বন্ধুদের মধে আমি সত্যকার কবি বলিয়া স্বীকৃতি আদায় করিয়াছিলাম।

আমার কবি-জীবনে খিরোদ বাবুই আমার দ্বিতীয় কবি-গুরু। প্রথম কবি-গুরুর কথা পরে বলিব। খিরোদ বাবুর সঙ্গে প্রায়ই সন্ধা বেলায় আমি নদীর ধারে বেড়াইতে যাইতাম। দুইজনে আসন করিয়া বসিয়া ডুবন্ত বেলার দিকে চাহিয়া থাকিতাম। তিনি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের ধরনে কবিতা লিখিতেন। তাঁহার কবিতাগুলি অধিকাংশই স সারের অনিত্যতা বিষয়ক ছিল। ফিরিবার পথে কবিতা রচনার বিষয়ে তিনি আমাকে নানা উপদেশ দিতেন।

আলপনার নকশা আঁকার মত উপস্থিত ছড়া কাটিয়া বোল রচনায় একটি অপূর্ব আনন্দ আছে। এই রচনা কাগজের পৃষ্ঠায় লেখা থাকে না বটে কিন্তু রচকের মনে আর শ্রোতাদের মনে উপস্থিত বোল যে আনন্দ ধারা বহিয়া আনে তাহা ভাবিয়া চিন্তিয়া লেখা কাগজের রচনার চাইতে কোন অংশেই কম বলিয়া আমার মনে হয় না। বরঞ্চ উপস্থিত চরনার কোন কোন অংশ কাগজের রচনার চাইতেও ভাল হয়। কারণ উহার মধ্যে কোন কৃত্তিমতা থাকে না। রচক যেমনটি অনুভব করিলেন তাহাই তৎক্ষণাৎ শ্রোতাদের মধ্যে বিলাইয়া দিলেন। তাঁহার অনুভুতির উষ্ণতা শ্রোতারা সহজেই অন্তরে ধারণ করিতে পারে। কাগজে-কলমে লিখিতে

গেলে ভাবের উষ্ণতা অনেকখানি জুড়াইয়া যায়।

আলপনার মত কবিগান রচনা বাঙলা কবিতার প্রকাশ ভঙ্গীর একটি দিক। এই পথে কিছুটা তপস্যা করিলে আমাদের তরুণ কবিরা উপকৃত হইবেন বলিয়াই আমি মনে করি। আমার নিজের রচনায় তেমন চাতুর্য-ভরা মিল বা অনুপ্রাসের বর্ণচ্ছটা নাই কিন্তু রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া আরও অনেক সমালোচক বলিয়াছেন, "আমার ছন্দের গতি খুব সহজ।" ইহা যদি আমার গুণ হইয়া থাকে তবে এই শিক্ষা আমি পাইয়াছি আমার দেশের অশিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত কবিয়ালদের কাছে। তাহারাই আমার কাব্য-জীবনে প্রথম গুরু। সেই যাদব, পরিক্ষিত, ইসমাইল, হরি পাটনী হরি আচার্য এদের কথা আমি যখন ভাবি আমার অন্তর কৃতজ্ঞতায় অশ্রু-সিক্ত হইয়া ওঠে। পল্লী-বাঙলার ঘরে ঘরে তাঁহারা যে অমৃতধারা বিতরণ করিতেন তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া আজ বাঙালীর অন্তর শুষ্ক মরুভূমি হইয়া পড়িতেছে।

মধু পণ্ডিত

আমাদের গ্রামে হিন্দুপাড়ায় মধু পণ্ডিতের বাড়ি ছিল। ইনি ন্যায, কাব্য দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রে অগাধ পণ্ডিত ছিলেন। সেকালে বড়-লোক হিন্দুদের বাড়িতে শ্রাদ্ধে বিবাহে পণ্ডিতদের সভা বসিত। সেখানে পণ্ডিতেরা বসিয়া নানা বিষয়ে আলোচনা করিতেন। উপস্থিত নিমন্ত্রিতেরা তাহা শুনিয়া অজস্র জ্ঞান লাভ করিত। এই সব পণ্ডিত-সভায় মধু পণ্ডিতের স্থান ছিল সকলের অগ্রে। শ্রাদ্ধ-শান্তি, অন্ন-প্রাসন প্রভৃতি অনুষ্ঠান হইতে পণ্ডিত মহাশয় যে সব দান সামগ্রী পাইতেন তাহা দিয়া তিনি নিজের বাড়িতে একটি টোল চালাইতেন। দশ বারোজন ছাত্র পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়িতে আহার এবং বাসস্থান পাইয়া তাঁহার নিকটে সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। এতবড় পণ্ডিত হইয়াও তিনি ছিলেন বালকের মত সরল, একেবারে নিরহঙ্কারী। দেশের হিন্দু-মুসলমান সকলেই তাঁহাকে ভাল-বাসিত। তাঁহার গৃহের যে দেবতাকে তিনি প্রতিদিন ফুল-বেলপাতা

দিয়া পূজা করিতেন সেই দেবতার মতই তিনি গ্রামদেশের লোকদের পূজা-শ্রদ্ধা পাইতেন। স্থানীয় ঈশান স্কুলে তিনি হেড্‌ পণ্ডিতের চাকরী করিতেন তিনি যখন স্কুলে যাইতেন সুযোগ পাইলে আমি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাই-তাম। আমার মনে হইত তাঁহার সঙ্গে গেলে তাঁহার বিদ্যার কিছুটা আমি আয়ত্ব করিতে পারিব। আমি ছোট বলিয়া তিনি আমাকে অবহেলা করিতেন না। যে যে বিষয়ে আমার বালক-মনে কৌতুহল জাগিত তিনি সেই বিষয় লইয়া আমার সঙ্গে আলাপ করিতেন। তাঁর সঙ্গে কোন দিন কি কি আলাপ হইত আজ এতদিন পরে মনে করিতে পারিতেছি না। শুধু একদিনের কথা মনে আছে। পণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি বাঙলায় বই লিখিতে চাই। আপনি আমাকে কিছু উপদেশ দেন। এজন্য আমাকে কি করিতে হইবে ?"

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "তুমি বাঙালীর ছেলে। যাহা লিখিবে তাহাই বাঙলা হইবে। এজন্য তোমাকে কোন কিছু করিতে হইবে না। তোমার যাহা বলিবার আছে, যেনন আমার সঙ্গে কথা বলিতেছ তেমন করিয়াই লিখিবে। তাহাই হইবে তোমার সবচাইতে উৎকৃষ্ট রচনা।" পরবর্তী জীবনে পণ্ডিত মহাশয়ের এই উপদেশ আমি আমার গদ্য রচনায় প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

পণ্ডিত মহাশয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার টোলটি উঠিয়া গেল। টোলের ছাত্রেরা যাঁর যাঁর বাড়ি চলিয়া গেলেন। পণ্ডিত মহাশয়ের শূন্য বাড়ি হইতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হস্ত-রেখাঙ্কিত-তালপত্রগুলি কুড়াইয়া আনিয়া পাড়ার বালকেরা ইচ্ছামত খেলাঘর সাজইল। তাঁহার গৃহে সে-কালের লিখিত কত পুঁথিপত্রই না ছিল। সেগুলি উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর অভাবে বালকদের খেলার সামগ্রী হইয়া চিরকালের মত মানব সমাজের উপকারে না আসিয়া অনন্ত বিস্মৃতিগর্ভে বিলিন হইল।

চৈত্র-পূজা

আমাদের বাড়ির পাশের ছোট গাঙের ওপারে শোভারামপুর গ্রামে হিন্দুরা চৈত্র-পূজা করিত। এই পূজা উপলক্ষ করিয়া চৈত্রমাসের পনর দিন যাইতেই ভাঙরা নাচের দল লইয়া হিন্দুরা গ্রামে গ্রামে গান গাহিয়া বেড়াইত। তারপর চৈত্র সংক্রান্তির দিন শোভারামপুরের মেলা বা আড়ং বসিত। এই মেলা আমার শিশু বয়সে বড়ই আকর্ষণের বস্তু ছিল। সেখানে যাইয়া মাটির পুতুল, ঘোড়া, লাল বাতাসা, চিনির সাজ প্রভৃতিই শুধু কিনিয়া আনিতাম না, সেই মেলায় যে ভাঙরা নাচের অভিনয় হইত তাহা দেখিয়া আমার বড়ই ভাল লাগিত।

ব্রাহ্মণ, মোল্লা, বেদে বেদেনী, জেলে-জেলেনী, বৈরাগী-বৈরাগিনী প্রভৃতি পাঠ অবলম্বন করিয়া গ্রাম্য-অভিনেতারা আপন আপন চরিত্র-গুলিকে সমালোচনায় উপহাসের পাত্র করিয়া সমবেত লোকদিগকে হাসাইয়া পাগল করিত। মোল্লার পাঠ লইয়া যে ব্যক্তি আসরে আসিত, প্রথমেই সে আজান দিত।

হাইয়ালের ফালা হাইয়ালের ফালা,
আমার ধান খাওয়ার কোন শালার বেটা শালা !!
আল্লাহকবার !! আল্লাহকবার !!
কানা মুরগী জবো কর !

এই ভাবে আজান দেওয়া সারা হইলে মোল্লা সাহেব হাতের লাঠির উপর ভর দিয়া নাচিয়া নাচিয়া গান ধরিত :

'মেজবানী খাইতে গেলাম চাচাজিগো বাড়িতি,
তারা, গোলমরিজস্থা রাইন্দা ডাইল ঢাইলা থুইছে খালুইতি।

শ্রোতাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল মুসলমান কিন্তু এরূপ গান শুনিয়া তাহারা কেহই বিক্ষুব্ধ হইত না।

সে একজন বিশেষ মোল্লা, তার জন্য গোলমরিচ দিয়া ডাল রাঁধিয়া খালুইতে ঢালিয়া রাখা যায়, এই কৌতুকময় রচনা শুনিয়া শ্রোতারা

হাসিয়া গড়াইয়া পড়িত। তখনকার পরিবেশে এক সমাজের লোক অপর সমাজকে সমালোচনা করিলে সেই কৌতুক লোকে উপভোগ করিত। সমালোচকের প্রতি খড়গহস্ত হইত না। আমাদের গ্রামের জুলফক্কর মৃধা যাত্রাদলে প্রায়ই ভণ্ড ব্রাহ্মণের পাঠ করিত। বড় বড় অবস্থার হিন্দুরা তাহার অভিনয় দেখিয়া হাসিরা ফাটিয়া পড়িত। জুলফক্কর হিন্দু না মুসলমান কেহই ভাবিত না।

এই চৈত্র পূজায় সুদর্শন ছেলেরা মেয়ে সাজিয়া নাচিয়া নাচিয়া যে সব অষ্ট-গান গাহিত তাহার তুলনা কোথাও মেলে না।

একটি গানের পদ আজও আমার মনে আছে ঃ

ও সুখ বসন্ত কালে
ডালে বসে কালো কোকিল তুমি
ডেকনারে আর।

অথবা—বাইদ্যা আইল বাড়িতে
ও দিদি শাশুড়ি, আমায় কিনা দাও চুড়ী
চাইর আনার পয়সা হইলে কিনি বেলোয়ারী চুড়ী।

এই অষ্ট-গানের সুর অন্যান্য পল্লী গানের সুর হইতে একেবারে আলাদা। আমার বেদের মেয়ে নাটকে "ও বাবু! সেলাম বারে বার" গানটিতে আমি একটি অষ্ট-গানের সুর ব্যবহার করিয়াছি। আমাদের গ্রামের শিল্পী ছাড়াও চৈত্র পূজার মাঝে মাঝে পদ্মার-পার (ঢাকা জেলা) হইতে কালী-কাচের দল আসিত। নানা দেব-দেবীর মুখোশ পড়িয়া তাহার অপূর্ব নৃত্য-গীতের অনুষ্ঠান করিত। কালীর মুখা নাচান এই দলের একটি বিশেষ অভিনয় দক্ষতার পরিচয় ছিল। একটি লোক যখন কালীর মুখোশ পরিয়া এক হাতে খাঁড়া অপর হাতে মানুষের মাথা লইয়া আসরে প্রবেশ করিত তখন দর্শকদের মধ্যে একটা ত্রাসের সঞ্চার হইত। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিত। কালী আসিয়া আসরে দাঁড়াইল বালা দুই হাতে দুইটি ধুপতি লইয়া কালীর মুখের সামনে ঘুরাইত। তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকী ঢাক বাজাইত। তাহার তালে তালে কালী ধীরে ধীরে কাঁপিয়া উঠিত। তারপর হাত কাঁপাইয়া, ঘাড় এদিক ওদিক

ঘুরাইয়া আস্তে আস্তে নাচ আরম্ভ করিত। সেই নাচ ধীরে ধীরে ভীষণ হইতে ভীষণতার হইতে থাকিত। তখন হিন্দু মেয়েরা জোকার দিয়া উঠিত। কালী নাচিতে নাচিতে কখনো নিজের হাতের খাঁড়া দিয়া নিজের বক্ষ নিজে বিদীর্ণ করিতে চাহিত। তারপর কি মনে করিয়া কাঁদিত। তখন ঢাকের বাদ্য অন্য রকমের বাজিত। ইহার পর কালী রুষ্ট হইয়া তাহার খাঁড়া লইয়া আসরের চারিদিকে ঘুরিয়া কাকে যেন আক্রমণ করিতে ছুটাছুটি করিত। তখন ঢোলের বাদ্য ভীষণ হইতে ভীষণতর হইত। মেয়েরা আবার উলুধ্বনি করিত। কালী তখন অন্য রকমে পা ফেলিয়া রুদ্র-নাচন নাচিত। নাচিতে নাচিতে কালীবেশধারী নর্তক অজ্ঞান হইয়া পড়িত।

আজ পরিণত বয়সে এই নাচের কথা ভাবিতে মনে, হয় ভয়কে যেমন মানুষ এড়াইয়া চলিতে চায়, ভয়কে তেমনি মানুষ উপভোগ ও করে। তাহা না হইলে নৃত্যকলার মধ্যে এই ভয়াবহ দৃশ্যের অবতারণা করিয়া মানুষ আনন্দ পায় কেন?

চৈত্র-সংক্রান্তির শেষ রাত্রে আমাদের গ্রাম-সংলগ্ন শ্মশান ঘাটে হাজরা পূজা হইত। বাদ্যভাণ্ড বাজাইয়া শোভারামপুর হইতে একদল আর লক্ষ্মীপুর হইতে আর একদল হাজরা পূজা করিতে আসিত। আমাদের গ্রাম-সংলগ্ন শ্মশান ঘাটে হাজরা পূজা করিতে শ্মশান-পূজার চিতা নির্বাচন লইয়া লক্ষ্মীপুরের দলের সঙ্গে শোভারামপুরের দলের প্রায়ই সংঘর্ষ হইত। এজন্য দুই দলের লোকই লাঠি-সোঁটা লইয়া প্রস্তুত হইয়া আসিত। আমাদের গ্রামের মুসলমানেরা মধ্যস্থ হইয়া তাহাদের এই কলহ মিটাইয়া দিত।

এই হাজরা পূজা দেখিবার জন্য মিঞাভাই প্রতিবার শেষরাত্রে উঠিয়া শ্মশান ঘাটে যাইতেন। আমাকে সঙ্গে লইতেন না। সেবার অনেক বলিয়া কহিয়া মিঞাভাইকে রাজী করাইলাম। গভীর রাত্রে দূর হইতে যখন ঢাকের বাদ্য শুনিতে পাইলাম মিঞাভাই আমাকে ডাকিয়া উঠাইলেন। ঢাকের বাদ্যের তালে তালে ভয়ে আমার বুক দুরু দুরু করিতেছিল। আমি মিঞাভাইয়ের হাত ধরিয়া চলিলাম। ভয়ের কথা বলিলাম না বলিলে হয়ত আমাকে সঙ্গে লইবেন না।

আমাদের গ্রামের আরও অনেকে হাজরা পূজা দেখিবার জন্য শ্মশান ঘাটের পথে চলিতেছিল। আমরা তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। এবার আমার বুকের দুরু দুরু ভাব কিছুটা কমিল। ধীরে ধীরে শোভারামপুরের দল শ্মশান ঘাটের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঢাকের বাদ্য অতিক্রাম করিয়া মাঝে মাঝে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করিয়া শব্দ আসিতেছিল, বলরে হরগৌরী নাম, বি-ভোর। সেই শব্দে আবার নূতন করিয়া আমার বুক দুর দুর করিতে লাগিল! প্রায় তিন চার শ' লোক লইয়া হাজরা পূজার দল শ্মশান ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই অনুষ্ঠানের পুরোহিত কোন ব্রাহ্মণ নয়, বালা। এই বালারা মন্ত্র-তন্ত্রে বড়ই অবিজ্ঞ। ভালমত গু-গ্রাম না জানিলে অপর পক্ষের বালা আসিয়া মন্ত্র দিয়া এ-পক্ষের সন্ন্যাসীদিগকে উড়াইয়া লইয়া যাইতে পারে। শোভারামপুরের বালা আমাদের গ্রামের মন্ত্রজ্ঞানী রামে-রাজ। ইঁহার মত গুণীন ব্যক্তি আমাদের তল্লাটে নাই। হাজরা পূজার পনর দিন আগে হইতেই পাড়ার সাহসী এবং বলিষ্ঠ একদল যুবক সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া ভাঙরা নাচের দলে এ-গ্রামে ও-গ্রামে ঘুরিত। আজ তাহারা মালকোছা দিয়া কাপড় পরিয়া সারি বাঁধিয়া শ্মশানের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। পিছনে পূজার সামগ্রী ও শোভারামপুরে অন্যান্য লোকজন। মূল বালা রামে-রাজ দুইটি ধূপদানী হাতে লইয়া সন্ন্যাসীদের মুখে ধূপের ধোঁয়া দিতে লাগিলেন। ঢাকের বাদ্য এখন কি গম্ভীর আওয়াজে অন্য তালে বাজিতেছে! সন্ন্যাসীরা সেই তালে তালে ধীরে ধীরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দোলা দিতে লাগিল। বালা জোরে জোরে মন্ত্র আওড়াইতে লাগিল। তারপর সেই ঢোলের তালে তালে সন্ন্যাসীরা নাচিতে আরম্ভ করিল। সে কি ভীষণ উন্মাদনা ভরা নাচ। এমন ভয়ঙ্কর নাচ জীবনে কোথাও দেখি নাই। উদয় শঙ্করের তাণ্ডব নাচ দেখিয়াছি। তাহাতে হয়ত অনেক শিল্প কার্য আছে কিন্তু এমন পরিবেশ নাই। শ্মশানের আলোতে চারিদিকের অন্ধকার আরও জমাট ধরিয়াছে। তাহারই মাঝখানে অর্ধ-উলঙ্গ এই সন্ন্যাসীদের নৃত্য। আর মাঝে মাঝে সমবেত কণ্ঠ ধ্বনি উঠিতেছে, বলরে হরগৌরী নাম:

বি—ভো—র

তারপর কি একটা মন্ত্র পড়া শেষ হইলে সন্ন্যাসীদল এখান হইতে রাত্র গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে বিলীন হইয়া গেল। জয়ঢাকের তালে তালে তাহাদের হাতের জোড়া-বেতের লাঠি মাটির উপর পড়িতেছে, সপাং সপাং সপাং।

শ্মশান ঘটে একটি পুরাতন শেওড়া গাছ ছিল। বহু বছরের লতায় পাতায় ও কাঁটা গাছে জড়াইয়া তাহার তলদেশটি লোকজনের অনতিক্রম্য ছিল। তাহারই এক পাশে একটি জায়গা আগে হইতেই পরিষ্কার করিয়া রাখা হইয়াছিল। সেইখানেই হাজরা পূজা হইবে। সেই গাছের তলায় পাতা বিছাইয়া ছোট ছোট পাত্রে তেল, সিন্দুর, চন্দন, রক্তজবা, ধুতরার ফুল ও পূজার ভোগ ইত্যাদি রাখিয়া রামেঃ রাজ তাহার পিছনে বসিয়া জোরে জোরে ডাক ছাড়িয়া মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। ঢাকের বাস্ত এখন খুব ধীরে ধীরে হইতেছে। সন্ন্যাসীরা সপাসপ বেতের আঘাত করিয়া শেওড়া গাছের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতেছে। বাহিরের হিন্দু জনতা রহিয়া রহিয়া ধ্বনি দিতেছে ঃ

বলরে হরগৌরী নাম
বি—ভো—র।

এই গুরু-গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে হাজার পূজা শেষ হইল। এবার হইবে শ্মশান-পূজা। ওদিক হইতে লক্ষ্মীপুরের দল আসিয়া পড়িল বলিয়া। তাহাদের ঢাকের বাস্ত শোনা যাইতেছে। সন্ত নির্বাপিত চিতার উপর এই পূজা করিতে হইবে। তাহারা আসিয়া পড়িলে এই লইয়া দুই দলে সংঘর্ষ বাধিতে পারে। এখন শোভারমপুরে ঢাকের বাদ্য আরও জোরে জোরে আরও ভীষণ হইতে ভীষণতর তালে বাজিতে লাগিল। লক্ষ্মীপুরের দলে ঢাক বাস্ত করিতে আসিতেছে মদন ঢুলী। আর শোভারামপুরের দলে আসিয়াছে যাদব আর তার ছোট ভাই জুড়ান। যাদবের উপরে আজ আমাদের গ্রামের মান সম্ভ্রম। যদি মদনের ঢাক বাস্ত শুনিয়া সমবেত লোকেরা যাদবের ঢাক বাস্তের চাইতে ভাল বলে তবে আমাদের আর মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না। আজ গ্রামের মুখরক্ষা করিবে যাদব—আমাদের যাদব—আমার পূর্ব-পরিচিত যাদব। যাদবও যেন তা জানে। সেই একমাত্র ব্যক্তি

আজ তার হাতে আমাদের গ্রামের যা কিছু সম্মান নির্ভর করিতেছে। তাই যাদব দুই হাতে ঢাকের কাঠি ধরিয়া কখনো নাচিয়া কখনো খাড়া হইয়া তার সারা জীবনের ঢাকবাদ্যের যত কৌশল জানা আছে, সমস্ত মেলিয়া ধরিতেছে। যাদবের ঢাকের তালে তালে আকাশ-বাতাস কাঁপিতেছে · সেও হয়ত ঢাকের বাদ্যের তালে তালে শূন্য আকাশে উড়িয়া যাইবে।

শ্মশানের উপর পূজার সামগ্রী বিছাইয়া শোভারামপুরের বালা রামে-রাজ মন্ত্র পড়িতে পড়িতে শোল মাছ পোড়া দিলেন। সন্ন্যাসীরা নদীর মধ্যে খাগড়া ঘাসের জঙ্গলে যাইয়া লুকাইয়া রহিল! এবার ঢাকের বাদ্য আরও ভয়ঙ্কর—আরও তাল-প্রধান। এই বাদ্যের তালে তালে কালকে-চণ্ডীর ভক্তেরা আসিয়া শ্মশান পূজার ভোগ খাইয়া যাইবে।

মিঞাভাই আমাকে কাছে লইয়া সাবধান করিয়া দিলেন, একটু পরেই ভূতেরা আসিয়া পূজার ভোগ খাইয়া যাইবে। ভয় করিস না কিন্তু। উহাতে আমার বুকের দুরু দুরু আরও বাড়িয়া গেল। মনে হইল এদিক হইতে ওদিক হইতে শত শত ভূত যেন ঢাক-বাদ্যের উপর সোয়ার হইয়া আমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে।

নানা রকম মন্ত্র-তন্ত্র শেষ করিয়া রামে-রাজ জোরে জোরে ডাক ছাড়িলেন,

পিঙ্গল পিঙ্গল দেবী পিঙ্গল মাথার কেশ
পিঙ্গল জটায় দেবীর আন্ধারিল দেশ।

শুনিয়া গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। এই মন্ত্র শেষ কয়িয়া বালা ডাক ছাড়িলেন,

কোথায়রে মা কালকে-চণ্ডী

অমনি সেই খাগড়ার বন হইতে সন্ন্যাসীর দল হিঁ হিঁ হিঁ রবে, বিকট চীৎকার করিয়া পূজার ভোগ কাড়াকাড়ি করিয়া খাইতে লাগিল!

শোভারামপুরের হাজরা পূজা এই ভাবে শেষ হইল। তখন দুই-জন সন্ন্যাসী ধুপতী-খেলা আরম্ভ করিল। আগুনভরা ধুপতীর মধ্যে ধূপের গুঁড়া ছড়াইয়া দিলে দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠে। সন্ন্যাসীরা সেই আগুন এক হাতে ধাক্কা দিয়া একে অপরের গায়ে ছুড়িয়া দিতেছিল। অপর ব্যক্তি নাচের তালে তালে সরিয়া গিয়া তার

প্রতিযোগীর গায়ে আবার ধূপের আগুন ছুড়িয়া মারিতেছিল। চারি-দিকের জমাট-অন্ধকারের উপর তাহাদের ধূপতীর আগুন নানা রকমের নক্সা আঁকিয়া নিবিয়া যাইতেছিল। শ্মশান ঘাটের এই ভীতি-বহুল সমাবেশে তাহাদের ধূপতীনাচ মনে এক অভূতপূর্ব ভাবের সমাবেশ করিতেছিল। এই ধূপতীনাচের লোক এখন আর দেখা যায় না। শ্রী অজিত মুখার্জ্জির সাহায্যে পরলোকগত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় একবার ফরিদপুর জেলা হইতে একটি ধূপতী নাচের দল কলিকাতায় লইয়া গিয়াছিলেন। খুব সম্ভব গুরুসদয় বাবু এই নাচের একটি ফিল্মও তুলিয়া লইয়াছিলেন। আজকাল যাহারা নৃত্যকলা লইয়া নতুন কিছু সৃষ্টি করিতে চান, তাঁহারা এই ধূপতী-নাচের অনুসন্ধান লইতে পারেন। হয়ত নমঃশূদ্রবহুল গোপালগঞ্জ এলাকায় এখনও এই ধূপতী-নাচের লোক পাওয়া যাইতে পারে।

লক্ষ্মীপুরের দল এবার হাজরা পূজা করিতে শ্মশান ঘাটে আসিয়া পৌঁছিল। এবার যাদবের সঙ্গে মদন ঢুলির ঢাক বাদ্যের প্রতিযোগীতা। মদন যখন খুব দ্রুত তালের একটি বাজনা বাজাইয়া ক্ষান্ত হইতেছিল, যাদব তখন আরও দ্রুত-তালে অপর একটি তাল বাজাইল। তারপর বাজাইতে বাজাইতে ইচ্ছামত তাল ভঙ্গ করিয়া আবার তালে আসিয়া বাজনা শেষ করিয়া দিল। মদন ঢুলিও কম গেল না। সে দুই হাতে ঢাকের কাঠি ধরিয়া ঢাকের চামড়ার উপর হাতের কবজী ঘসিয়া এমনি একটি বাদ্য বাহির করিল যে আমরা ভাবিলাম, এবার বুঝি মদন ঢুলির কাছে যাদব হারিয়া যাইবে। কিন্তু যাদব ছাড়িবার পাত্র নয়। সে তার ঢাকটি ছোট ভাই জুড়ানের পিঠের উপর রাখিয়া তার ঢাক-কাঠির গোড়ালী দিয়া এমনি আর একটি বাজনা তুলিল, আমাদের মনে হইল, সেই বাজনার তালে তালে আকাশ-জমিন কাঁপিয়া উঠি-তেছে। শুনিয়াছি কোথায় এক হাজরা পূজা হইতেছিল। ঢাকী এমনই করিয়া ঢাকবাদ্য করিয়াছিল যে তাহার তালে তালে বালা, সন্ন্যাসী সকলেই শূন্যে উড়িয়া গিয়াছিল। আজ এই দুই ঢুলির বাদ্য শুনিয়া আমার সে কাহিনী সত্য বলিয়া মনে হইল! হাজরা পূজা শেষ

হইলে আমরা সকলে যার যার বাড়ি চলিয়া গেলাম। যাইবার সময় সকলেই বলাবলি করিল, যাদব আর মদন দুইজনেই ভাল ঢাক বাজায়। কে, কার চাইতে বড় বলা যায় না। যদিও ইহাদের বাঙলা নাম কিন্তু ইহারা দুইজনই মুসলমান।

সেকালের যাত্রাগান

ছোটবেলায় আমি আর আমার চাচাত ভাই নেহাজদ্দীন দুইজনে মিলিয়া ফরিদপুরের চৌধুরী বাড়িতে যাত্রাগান শুনতে যাইতাম। গান হইবার তিন চারদিন আগে হইতেই আমাদের মধ্যে নানা রকম জল্পনা-কল্পনা হইত। গানের দিন সন্ধ্যা হইতেই আমরা চৌধুরী-বাড়িতে যাইয়া উপস্থিত হইতাম। চৌধুরীদের বাগানে রাশি রাশি শেফলী ফুল ফুটিয়া চারিদিকে গন্ধ ছড়াইত। জোছনা ধব-ধব রাত্রে সেই ফুলের সুবাস আসন্ন যাত্রাগানের আবেশটি যেন আমাদের বুকে ভরিয়া দিত।

চৌধুরীদের উঠানে একটি মণ্ডপ ঘর ছিল। তাহারই মাঝখানে যাত্রাগানের আসর বসিত। যেদিকে প্রতীমা সেদিকেই সামনের ফরাসে বসিত চৌধুরী-বাড়ির ছেলে-মেয়েরা। কি সুন্দর জামা কাপড় পরিয়া তাহারা আসিত। মেয়েদের গায়ে সোনার গহনা ঝলমল করিত। মনে হইত তাহারাই যেন অলঙ্কার হইয়া প্রতীমার শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। আসরের ডান ধারে বাম ধারে বসিত উপস্থিত হিন্দু জনসাধারণ। যেদিকে পিছন করিয়া যাত্রার রাজ-রাণীদের বসিবার জন্য চেয়ার দেওয়া হইত সেদিকে চাটাইয়ের উপর মুসলমানদের বসার জায়গা ছিল। আমি আর নেহাজদ্দীন সকলের আগে যাইয়া সেই চাটাইয়ের সামনে বসিতাম। যাত্রাগানের কোন জায়গায় কোন বিয়োগান্ত ঘটনা ঘটিলেই জুড়িরা উঠিয়া বিলম্বিত লয়ে গান ধরিত। যাত্রার দলের বালকেরা সোনা রূপার কাজ করা বনাতের পোষাক পরিয়া সেই গানের দোয়ার্কি করিত। একবার শ্যামা বাগ্‌দীর দল চৌধুরী-বাড়িতে গান করিতে আসিল। তখনকার দিনে

মাইকের প্রচলন হয় নাই। হাজার হাজার শ্রোতারা সামনে গলাভরা মেডেল ঝুলাইয়া শ্যামা বাগ্‌দী যখন গান ধরিত তখন শ্রোতাদের মধ্যে এরূপ নীরবতা আসিত যেন সুঁইটি পড়িলে শোনা যায়। শক্তি-শেলে আহত লক্ষ্মণকে সামনে লইয়া রামচন্দ্র যখন বিলাপ করিত, তখন শ্যামা বাগ্‌দী উঠিয়া গান ধরিত ঃ

একবার দাদা বলে ডাকরে ভাই লক্ষণ।

সেই গান শুনিয়া শ্রোতারা কেহই অশ্রু সংবরণ করিতে পারিত না। সেকালে শ্যামা বাগ্‌দীর মত এমন ভাল কণ্ঠস্বর বোধ হয় আর কাহারও ছিল না। আজ যে যাত্রাগান উঠিয়া যাইতেছে তাহার কারণ দেশের শ্রেষ্ঠ গুণীরা এখন সিনেমা, রেডিও প্রভৃতিতে যথেষ্ট উপার্জন করেন। যাত্রাগানের অধিকারীরা তাঁহাদিগকে সেরূপ টাকা দিতে পারেন না।

যাত্রাগানের আসরে আমার সবচাইতে ভাল লাগিত যেখানটিতে যুদ্ধ আরম্ভ হইত। আমি বড়ই ঘুম-কাতুরে ছিলাম। নেহাজদ্দীনকে বলিয়া দিতাম, "দেখ আমি একটু ঘুমাইয়া লই। যেখানটিতে যুদ্ধ আরম্ভ হইবে আমাকে ডাক দিস্।" এই অনুরোধ সে রক্ষা করিত। রাজায় রাজায় যখন যুদ্ধ হইত, আর সেই যুদ্ধের তালে তালে যখন বাজনা বাজিত তখন এক নিশ্বাসে চাহিয়া থাকিতাম কে হারে কে জেতে জানিবার জন্য। যুদ্ধে এক পক্ষের রাজার মৃত্যু হইলে, আমাদের বয়সী রাজার সুদর্শন ছোট্ট ছেলেটি আসিয়া যখন প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করিয়া একেবারে নাস্ত-নাবুদ করিয়া তুলিত, তখন মনে হইত এ জয় যেন আমাদেরই।

যাত্রার দলের কৃষ্ণ হইয়া যে ছেলেটি গান গাহিত, প্রতিদিন তাহার অভিনয় ও গান শুনিয়া তাহার সঙ্গে মনে মনে একটি বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করিতাম। শেষ গানের দিন অভিনয় করিয়া তাহরা চলিয়া যাইবে। সেদিন সেই বালকটির জন্য মনে মনে কতই ব্যথা অনুভব করিতাম। আহ্! এর সঙ্গে আর ত জীবনে কখনো দেখা হইবে না!

রাত একটার সময় বলিদান হইত। এই সময় মুসলমানদের মণ্ডপ-ঘর হইতে বাহিরে চলিয়া যাইতে হইত। তাহারা চলিয়া গেলে তাহাদের পরিত্যক্ত সামনের আসনগুলি হিন্দু শ্রোতারা আসিয়া দখল করিত। তাই তাহারা সহজে আসন ছাড়িয়া যাইতে চাহিত না। সেবার জমিদার

শুনিতে পাইলেন, বলিদানের সময় বহু মুসলমান পূজার মণ্ডপ-ঘরে রহিয়াছে। জমিদার তখন তাঁহার রূপা-বাঁধা লাঠিখানা লইয়া মুসলমানদিগকে মারিয়া বাহির করিয়া দিলেন। কেহই ইহার প্রতিবাদ করিল না। পূজা শেষ হইলে যাহারা জমিদারের মার খাওরায় কিঞ্চিৎ জখম হইয়াছিল সেই ক্ষতস্থানে ধূলা লাগাইয়া পূর্বের মতই আবার সেই চাটাইয়ের উপর বসিয়া গান শুনিতে লাগিল। ফরিদপুর জেলা ফরাজী-আন্দোলনের পটভূমি। এখানে বদ্ধিষ্ণু মুসলমানেরা বাড়িতে গান-বাজনার অনুষ্ঠান ত করিতেনই না, মুসলমান হইয়া যাহারা গান-বাজনা করে তাহাদিগকেও তাঁহারা একঘরে করিয়া ছাড়িতেন। কিন্তু গান শুনিবার ক্ষুধা মানব মনের চিরন্তন আকুতি, তাই নানা অবহেলা-অপমান সহ্য করিয়াও মুসলমানেরা হিন্দুর পূজা-পর্বণে গান শুনিয়া মনের ক্ষুধার নিবৃত্তি করিত।

চৌধুরী-বাড়ির অপমানের খবর পাইয়া মুসলমান প্রধানেরা জমিদার বাড়ির এই পূজা বয়কট করিতে বিজ্ঞাপন ছড়াইয়াছিলেন। সে বছর দুর্গা পূজার মেলার দিনে মুসলমানেরা আর বাইচের নৌকা লইয়া আসিল না। কিন্তু গান শুনিতে আগের মতই জমিদার বাড়িতে আসিয়া ভীড় করিল। সমাজের নেতারা যদি নিজের সমাজে অনুরূপ গানের ব্যবস্থা করিতেন তবে এই বয়কট আন্দোলন সফল হইতে পারিত। কিন্তু এত কথা ভাবিবার লোক তখনও আমাদের সমাজে আসে নাই। এখনও আসিয়াছে কিনা সন্দেহ।

যাত্রাগানের বিরামের সময় আমি আর নেহাজদ্দীন বাহিরে আসিতাম। সামনের দোকানে দোকানে কত রকমের খাবার। শত শত লোক আসিয়া বসিয়া খাইতেছে। আমরা দু'ভাই সন্ধ্যা বেলায় বাড়ি হইতে আসিয়াছি। ভাল করিয়া খাইয়া আসিতে পারি নাই। ক্ষুধায় পেট জ্বলিতেছে। কিন্তু পকেটে পয়সা নাই। মার কাছ হইতে চাহিয়া চিন্তিয়া একটা পয়সা আনিয়াছি। সেই এক পয়সার পান কিনিয়া দুইভাই খাইয়া আবার যাত্রার আসরে যাইয়া বসিতাম।

যাত্রা শুনিয়া পরের দিন বাড়ি যাইয়া ঘুমাইয়া পড়িতাম। দুপুর বেলা ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিয়া দুইভাই আমি আর নেহাজদ্দীন নদীর তীরে যাইয়া যাত্রার রাজাদের মত বক্তৃতা করিতাম। কলার ডাঁটার

তরবারী বানাইয়া দুই রাজায় যুদ্ধ করিতাম। কখনো কখনো এই কৃত্রিম যুদ্ধ সত্যকার যুদ্ধে পরিণত হইত। তখন বড়রা আসিয়া আমাদিগকে নিরস্ত করিতেন।

থিয়েটার

পরলোকগত কংগ্রেস সভাপতি অম্বিকাচরণ মজুমদারের সময় হইতে আমাদের ফরিদপুর শহরে প্রতি বছর একটি কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী বসিত। এই উপলক্ষ্যে সেখানে নানা রকম গান বাজনা হইত। একবার সেখানে বিল্ব মঙ্গল অভিনয় দেখিতে আসিলাম। এই আমার প্রথম থিয়েটার দেখা।

পরদিন বিকালে নদীর ধারে কাপড় টানাইয়া কৃত্রিম মঞ্চ তৈরী করিয়া পাড়ার ছেলেদের ডাকিয়া বিল্ব-মঙ্গল ঠাকুরের অভিনয় দেখাইলাম।

চিন্তা ধ্যান চিন্তা জ্ঞান
চিন্তামণি কোথা গেলে তুমি?

বলিয়া আমি যখন অভিনয় করিতেছিলাম, আমার শ্রোতারা সেদিন সত্যকার থিয়েটারের শ্রোতাদের চাইতে আমার কম তারিফ করে নাই।

ইহার পরে বড় হইয়া থিয়েটার দেখার নেশা আমাকে পাইয়া বসিল। ফরিদপুর টাউন-থিয়েটারের অভিনয় হইত টিকেট করিয়া। কিন্তু টিকেট কেনার পয়সা আমি কোথায় পাইব? অভিনয়-ঘরের জানালার পাশে একটি সুপারী গাছ ছিল। সেই সুপারী গাছে উঠিয়া শীতে ঠির ঠির করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে অভিনয় দেখিতাম। শাজাহান, মোগল-পাঠান, সোনায়-সোহাগা, রাজা হরিশচন্দ্র প্রভৃতি নাটকের অভিয়ন আমি এইভাবে দেখিয়াছিলাম। মাঝে মাঝে চাহিয়া চিন্তিয়া দু'একদিন পাশ সংগ্রহ করিতাম। সেদিন অভিনয়ের সমস্ত কিছু মনে মনে মুখস্ত করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতাম। পরদিন নদী-তীরে যাইয়া অভিনয়ের চরিত্রগুলির মত বক্তৃতা করিতাম।

ফরিদপুরে ড্রামেটিক ক্লাব নামে আরও একটি থিয়েটারের দল ছিল। এই দলের নায়কের পাঠ করিতেন বাবু বিমলচন্দ্র সেন। একবার স্কুলের

রিসাইটেশনের কোন পাঠ লইয়া কিছু নির্দেশ পাইতে আমি বিমল বাবুর কাছে গেলাম। তিনি সস্নেহে আমার পাঠটি আমাকে শিখাইয়া দিলেন। সেই হইতে তাঁহার সহিত আমার খুব ভাব হইয়া গেল। থিয়েটারে প্রায়ই তিনি আদর্শ চরিত্রের অভিনয় করিতেন। আমার মনে হইত তিনি যেন সেই সব চরিত্রের সমস্ত সদগুনেরই অধিকারী। তাই তিনি আমার বালক-বয়সের কল্পনায় একটি ছোট খাট দেবতা ছিলেন। একবার থিয়েটারের বড় বড় বক্তৃতার অনুকরণে কল্পিত কোন কাহিনীর পাঠ খাতা ভরিয়া লিখিয়া তাঁহার নামে উৎসর্গ করিয়া তাঁহাকে পড়িতে দিলাম। তিনি পড়িয়া বলিলেন, "বেশ মিষ্টি লাগিতেছে।" মাতৃ-দুগ্ধের মত এরূপ স্বীকৃতি নূতন সাহিত্যিকদের পক্ষে বড়ই উপকারী। তখনকার লেখায় কত যে ভুল-ত্রুটি আর উচ্ছাস থাকিত; কিন্তু কোনদিনের জন্যও তিনি আমার লেখার সমালোচনা করেন নাই। তিনি শুধু প্রশংসাই করিতেন।

বিমলবাবু ভাল অভিনেতা ছিলেন। তাঁহার মত এমন মিষ্টি কণ্ঠস্বর খুব কম লোকেরই দেখিয়াছি। রাজা হরিশচন্দ্রের পাঠ বলিয়া তিনি তাঁহার দর্শকদিগকে কাঁদাইয়া আকুল করিতেন। তখনকার দিনে মফঃস্বলের রঙ্গমঞ্চগুলিতে অমরেন্দ্র নাথের যুগ চলিতেছে, থিয়েটারের মূক-অভিনয়ের দিন তখনো আসে নাই।

তাঁর সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় আমি ড্রামেটিক-ক্লাবের রিহার্সেলে প্রবেশ করিবার সুযোগ পাইলাম। আমার বয়সী যে দু'চারজন অল্প বয়সের বালক থিয়েটারে পাঠ ও নৃত্য-গীতের সুযোগ পাইত। আমি তাহাদিগকে ভাগ্যবান মনে করিতাম। থিয়েটারের রিহার্সেল বার বার দেখিয়া কোন কোন পাঠের অংশ আমার মুখস্থ হইয়া যাইত। সন্ধ্যাবেলায় নদীর ধারে দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে তাহারই অনুকরণ করিতাম। লোকে আমাকে পাগল জসীম বলিত। এইভাবে একা একা অভিনয় করিয়া কণ্ঠস্বরের আড়ষ্টতা অনেকখানি সাবালীন হইল। নিজের স্বরকে নানা ভঙ্গীতে নামান উঠানর শিক্ষা আমি লাভ করিলাম।

সন্ন্যাসী ঠাকুর

আমি তখন চতুর্থ শ্রেণীতে উঠিয়াছি। বয়স বোধ হয় ছয় সাত বৎসর হইবে। আমাদের বাড়ির পশ্চিম ধারে নদীর তীরে শ্মশান-ঘাট। এখানে একখানা টিনের আটচালা ঘর ছিল। মরা পোড়াইতে যাহারা শ্মশানে আসিত রৌদ্র বৃষ্টির সময় তাহারা সেখানে আসিয়া আশ্রয় লইত।

সেদিন আমি আর আমাব বড় ভাই শ্মশানের পথে বাড়ি ফিরিতেছি, দেখিলাম গেরুয়া-পোষাক পরা একজন সন্ন্যাসী সেই ঘরের মধ্যে আধ-শোয়া অবস্থায় হাত ঢেলান দিয়া বসিয়া আছেন। কৌতুহলি দৃষ্টি মেলিয়া ঘরের জানালা দিয়া আমরা তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম। আমার মনে হইল কুমার বাড়ি হইতে কে যেন সদ্য রঙ-করা একখানা মাটির মূর্তি সেখানে রাখিয়া গিয়াছে। তাঁহার গাঁয়ের বর্ণে কে যেন কাঁচা সোনা মাখিযা দিয়াছে। মাথার সুদীর্ঘ কেশ-বিন্যাস, আজানুলম্বিত বাহু আর মুখভরা ঘনকৃষ্ণ শ্মশ্রুতে দেব-জ্যোতি ঠিকরিয়া বাহির হইতেছে। আমরা অবাক হইয়া তাঁহাকে দেখিতেছি। তিনিও দুই একবার আমা-দিগকে চাহিয়া দেখিলেন, তারপর হাতের ইসারায় আমাদিগকে নিকটে ডাকিলেন।

আমরা কাছে গেলে অতি স্নেহের সঙ্গে তিনি আমাদের নাম, বাড়ি-ঘর, পিতামাতার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। এইসব কথার উত্তর দিয়া আমার সঙ্কোচ কাটিয়া গেল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি ঘর বাড়ি ছাড়িয়া এখানে শ্মশানে আসিয়া রহিয়াছেন কেন?

তিনি উত্তর করিলেন, "আমার যে ঘড়-বাড়ি নাই।" আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি গেরুয়া-কাপড় পরিয়াছেন কেন?" তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "গেরুয়া-কাপড় না পড়িলে তোমার মত খোকা কি আমার দিকে চাহিয়া দেখিত?"

এইভাবে প্রথম দিনের আলাপে সন্ন্যাসী ঠাকুরকে অনেক চোখা চোখা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম। বড় ভাই আকারে ইঙ্গিতে আমাকে বারণ করিতেছিলেন; কিন্তু কে কাহার কথা শোনে! কেন যেন জানি না, সবগুলি প্রশ্নেই আমি সন্ন্যাসী ঠাকুরকে ঠকাইতে চাহিয়াছিলাম। সেই আদিকালের মানুষেরই স্বভাব। অপরিচিত কেহ সংস্পর্শে আসিলে প্রথমে তাহাকে আক্রমণ করিবার মনোবৃত্তির মত। তিনি আমার সবগুলি প্রশ্নের আক্রমণ এমন সস্নেহ উত্তরে কাটাইলেন যে, ধীরে ধীরে আমি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলাম।

সন্ন্যাসী ঠাকুরের সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করিয়া বাড়ি ফিরিলাম। ফিরিবার পথে আমি আর আমার বড়ভাই দুইজনেই একমত হইলাম, সন্ন্যাসী ঠাকুর বেশ ভাল লোক। কাল আবার আমরা তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিব।

পরদিন আমি একাই সন্ন্যাসী ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। চারিদিকে বসিয়া শহরের বহু গণ্যমান্য লোক তাঁহার সঙ্গে ধর্মকথা অলোচনা করিতেছিলেন। এত লোকের মধ্যে বসিয়াও তিনি বালক বলিয়া আমাকে অবহেলা করিলেন না। তিনি আমাকে সস্নেহে কাছে ডাকিয়া লইয়া বসাইলেন। তারপর আবার ধর্মকথা আরম্ভ করিলেন। সে সব বড় বড় দাশনিক তত্ত্বপূর্ণ-কথা আমি কি বুঝি? আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। এইসব ধর্মকথা প্রসঙ্গে তিনি যখন তাঁহার সন্ন্যাস জীবনের রোমঞ্চকর কাহিনীগুলি বলিয়া যাইতে লাগিলেন তাহা বংশীধ্বনি-আকৃষ্ট বন্য হরিণের মত আমার বালক-মনকে আকৃষ্ট করিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। গৃহস্থজীবনে তিনি নাটরের পাগলা মহারাজার বন্ধু ছিলেন। তাঁহার পিতা মহারাজার ম্যানেজার অথবা অন্য কোন উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল দুর্গাচরণ চক্রবর্তী।

ঢাকা জেলার বিক্রমপুর অঞ্চলে কোন এক গ্রামে তাঁহার বাড়ি ছিল। নাটরের পাগলা মহারাজার সঙ্গে ঘোড়ায় চড়িয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর এখানে ওখানে ঘুড়িয়া বেড়াইতেন। মহারাজার মতই সকলে তাঁহাকে সম্মান করিত। তাঁহার স্ত্রী ছিলেন অসামান্য সুন্দরী। দুই তিনটি শিশুপুত্র রাখিয়া তিনি পরলোকবাসিনী হইলেন। তখন চলিল কিছুদিন

তাঁহার শোকের অগ্নিদাহনে নিজেকে তিলে তিলে দহন করার কঠোর তপস্যা। সেই বহ্নিমান শোক-যজ্ঞে ধীরে ধীরে তিনি বিলাস, ব্যসন, খ্যাতি, মান সমস্ত কিছু বিসর্জন দিয়া একদিন সন্ন্যাসীর গেরুয়া, কমণ্ডলু ধারণ করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। তারপর লোকনাথ ব্রহ্মচারী, বামাখ্যাপা প্রভৃতি বহু সন্ন্যাসীর শিষ্য হইয়া ভারতের বহু তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিলেন। কখনো অমানিশার ঘোর কুজ্ঝটি-অন্ধকারে শ্মশানে শবের উপর বসিয়া, কখনো হিংস্রজন্তু-অধ্যুষিত হিমাচলের দুর্ভেদ্য গুহার গহীন কুহরে বসিয়া চলিল তাঁহার কঠোর তপস্যা।

তারপর শত শত সন্ন্যাসীর সঙ্গে কেদার বদরি পার হইয়া লছমোন-ঝোলা অতিক্রম করিয়া সেই সুদূর বাঘগোহা, সেখান হইতে মানস-সরোবর। এত পথের স্মরণ-চিহ্ন খুলিয়া খুলিয়া তিনি তাঁর শ্রোতাদের মধ্যে বিতরণ করিতে লাগিলেন। আমার বালক-মন ফুলের মত জীবন-বৃক্ষ হইতে ঝরিয়া তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িল। সেইদিন হইতে আমার শয়নে-স্বপনে এই সন্ন্যাসী ঠাকুরের কথা মনে আসিতে লাগিল।

আমাদের ঘরে নানা অভাব, সেই অভাব অবলম্বন করিয়া নানা কলহ। সেখান হইতে কে যেন আমাকে বংশীধ্বনির আকর্ষণ করিয়া এই সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে টানিয়া আনিত। এখানে আসিলে ভাল-বাসা, স্নেহ, মমতা, শান্তি। সুযোগ পাইলে আমি সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে আসিয়া বসিয়া থাকিতাম। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতাম। এমন মানুষ যেন আর কোথাও হয় না। আর কোথয় হইবেও না। আমার প্রাণের মানুষ—আমার মনের মানুষ। সন্ন্যাসী ঠাকুরও যেন আমাকে না দেখিলে থাকিতে পারিতেন না। শহর হইতে তাঁহার ভক্ত-মণ্ডলী ভারে ভারে মিষ্টি, ফলমূল, আরও কত রকমের খাবার আনিয়া তাঁহাকে ভেট দিত। সেই সব খাবার তিনি নিজের হাতে তুলিয়া আমাকে খাইতে দিতেন।

এইভাবে দিনে দিনে আমি সন্ন্যাসী ঠাকুরের ভক্তগোষ্ঠির একজন হইয়া পড়িলাম। তিনি যেমন আমাকে ভালবাসিতেন তাঁহার ভক্তেরাও তেমনি আমাকে স্নেহের সঙ্গে দেখিতে লাগিলেন।

শহরের ভক্তেরা সন্ন্যাসী ঠাকুরের জন্য শ্মশানেরই একপাশে একখানা

ঘর তৈরী করিয়া দিলেন। চারিধারে পাঁচ ছয়টি আম গাছের মধ্যে ছোট্ট একখানা কুঁড়ে ঘর। সামনে একটি ছোট্ট বারান্দা। তারপরে প্রকাণ্ড উঠান। উঠানের পরে ফুলের বাগান। সেখানে নানা রকমের ফুলের চারা সন্থ রোপিত হইয়াছে। প্রতিদিন সকালে উটিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর নিজেই এই বাগানের তদ্বির-তালাশী করিতেন। আমি আর তাঁহার খাসভক্ত অশ্বিনীদাদা বাগানের গাছগুলিতে পানি দিতাম। তারপর ঘরদোর ঝাঁট দিয়া গোবর-পানি দিয়া লেপিয়া দিতাম। এ সব কাজ করিতে আমার মোটেই পরিশ্রম লাগিত না। আমাদের বাড়ির সাংসারিক কাজে আমি একখানা কুটাও টানিয়া দুইখানি করিতাম না। কিন্তু সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে আসিয়া তাঁহার সমস্ত ঘর-গোছালীর কাজ করিতে আমার এতটুকুও কষ্ট বোধ হইত না। ইতিপূর্বে বাড়িতে ফুলের বাগান করিবার সখ মিটাইতে পারি নাই। ধানের মরসুমে আমার যত্নে রোপিত ফুলগাছগুলির উপর দিন-মজুরেরা খড়ের আটি ফেলিয়া সেগুলিকে ধ্বংস করিত। আমার মনে ক্ষোভের অন্ত ছিল না। আজ সন্ন্যাসী ঠাকুরের বাগানে কাজ করিয়া ফুলগাছ রোপনের সখ যেন আবার আমাকে পাইয়া বসিল। এ বাগান ত সন্ন্যাসী ঠাকুরের নয়। এ বাগান আমার, তোমার সকলের – সন্ন্যাসী ঠাকুরের ভক্তদের। বাগান ভরিয়া অপরাজিতা, মল্লিকা, যুঁই, চামেলী, বেলী, সন্ধ্যা-মালতী, জবা, টগর, গন্ধরাজ, নানা বর্ণের গাঁদা প্রভৃতি ফুলগুলি যখন ফুটিত তখন আমার মনে হইত আমি নিজেই যেন ফুটিয়া উঠিয়া ইহাদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছি। শহর হইতে ভক্তেরা আসিয়া বলিত, 'বাবাজি! আপনার আঙিনায় আসিলে আর যাইতে ইচ্ছা করে না। মনে হয় এই ফুল-গাছগুলির সঙ্গে চিরকাল এখানে থাকিয়া যাই।

সন্ন্যাসী ঠাকুর আমাকে দেখাইয়া বলিতেন, "এই বাগানের জন্য যা কিছু প্রশংসা তাহা এই বালকটির প্রাপ্য।" শুনিয়া গৌরবে আমার বুক ভরিয়া যাইত।

এইভাবে ঘন ঘন সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে আসিয়া হিন্দু দেব-দেবতার পৌরাণিক কাহিনীগুলি আজি জানিয়া ফেলিলাম। আমার প্রথম জীবনে মুনসুর মৌলবী সাহেবের কাছে যে ইসলামিক শিক্ষা পাইয়াছিলাম তাহা

ভুলিয়া গেলাম। কালী, মহাদেব, দুর্গা, শিব প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবীতে বিশ্বাস করিতে লাগিলাম। পুরাকালে কে কি ভাবে তপস্যা করিয়া সিদ্ধি-লাভ করিয়াছিলেন সেই সব কাহিনী শুনিয়া বিশ্বাস করিতে লাগিলাম।

তখন স্কুলে নামমাত্র যাই। আর অধিকাংশ সময়ই সন্ন্যাসী ঠাকুরের এখানে কাটাই। বাড়ি হইতে অভিভাবকেরা আমার জন্য ভাবিত হইলেন। আমার পিতা সন্তানদের প্রতি কখনো কঠোর ছিলেন না। আমরা কোন গুরুতর অন্যায় করিলে যদিও কখনো কখনো তিনি কিল থাপড়ঠা মারিতেন কিন্তু সেই মারে তেমন ব্যথা ছিল না।

আমার শাস্তির ভার লইলেন আমার বড় ভাই। নিজে তিনি সপ্তম শ্রেনীতে উঠিয়াই পড়াশুনা ছাড়িয়া দিযাছেন। আমার পিতার শত চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি আর স্কুলে ফিরিযা গেলেন না। মাঝে মাঝে পিতার বাক্স ভাঙ্গিরা তাঁহার সেই কষ্টে উপার্জিত টাকা পয়সা লইয়া তিনি বাড়ি হইতে উধাও হইতেন। তাহার পব কিছুদিন পরে আবার ফিরিয়া আসিতেন। এই বড় ভাই শিশুকাল হইতেই আমার প্রতি খুবই নিষ্ঠুর ছিলেন। তাঁহার জিনিস-পত্র, বই, কলম প্রভৃতির উপর আমার ছিল মস্ত বড় আকর্ষণ। তাঁহার অবতমানে আমি সেগুলি নাড়িযা চাড়িযা তছনছ করিতাম। অপটু হাতে লিখিতে যাইযা পেন্সিলে শিষ ভাঙিযা ফেলিতাম। এজন্য তিনি আমাকে বেদম প্রহার করিতেন। তাই শৈশবকাল হইতেই তাঁকে আমি দুই চক্ষে দেখিতে পারিতাম না। সেই বড় ভাই সন্ন্যাসীর কাছে যাওয়া লইয়া আমাকে শাসন করিবার ভার লইলেন।

আমার পিতা বাড়িতে থাকিলে তাঁহার বেদম প্রহার হাত হইতে আমাকে তিনি রক্ষা করিতেন। কিন্তু পিতার অবর্তমানে যখন তিনি আমাকে ঠেঙ্গাইতে আরম্ভ করিতেন, কেহই আমার সাহায্যে আসিত না।

তিনি আমাকে মারিতেন আর বলিতেন, "বল্, আর সন্ন্যাসীর কাছে যাইবি না?" আমি কিছুতেই তাহা বলিতাম না। যা মুখে আসে অকথ্য ভাষায় তাঁহাকে গালি পাড়িতাম। ইহাতে তাঁহার রাগ আরও বাড়িয়া যাইত। তিনি আরও জোরে জোরে আমাকে মারিতেন। তারপর হয়রান হইয়া আমাকে ছাড়িয়া দিতেন।

তবু তিনি আমাকে সন্ন্যাসীর কাছে যাওয়া বন্ধ করিতে পারিলেন না।

সন্ন্যাসী ঠাকুরের ওখানে আমি ধ্রুব প্রহ্লাদের গল্প শুনিয়াছিলাম। কৃষ্ণ-ভক্তির জন্য প্রহ্লাদকে তাঁহার পিতা হস্তিপদতলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, জলন্ত অগ্নির মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছিলেন, তবু তাঁহার কৃষ্ণভক্তি টলে নাই। প্রহ্লাদের তুলনায় আমার বড় ভাইয়ের মার আমার কাছে ত পুষ্পাঘাত। আমি নীরবে তাঁহার মার সহ্য করিতাম। সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে আগের মতই যাইতাম। এই অত্যাচারের কথা তাঁহাকে বলিতাম না।

একদিন আমার বড়ভাই একখানা বেত লইয়া আমাকে এমন প্রহার করিলেন যে, আমার পিঠে হাতের আঙ্গুলের মত দশ বারটি দাগ পড়িয়া গেল। কোন কোন দাগে রক্ত উঠিয়া পিঠ লাল হইয়া গেল। আমি মাটিতে পড়িয়া বলির ছাগলের মত আছাড়ি-পিছাড়ি করিতে লাগিলাম।

তারপর বহুক্ষণ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া মুখহাত মুছিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে আসিলাম। তখন আমার চোখের পানি শুকাইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার দাগ মোছে নাই। সন্ন্যাসী ঠাকুর আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ তোমাকে এত বিমর্ষ দেখাইতেছে কেন?" তখন আমি আর কান্না সংবরণ করিতে পারিলাম না। কাঁদিতে কাঁদিতে পিঠের কাপড় তুলিয়া দেখাইলাম আর আনুপূর্বক সকল ঘটনা তাঁহাকে বলিলাম। আমার সমস্ত কাহিনী শুনিয়া তিনিও প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। আমার পিঠে হাত বুলাইয়া আমাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। ইহাতে আমার কান্না আরও বাড়িয়া গেল।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় যখন শহর হইতে ভদ্রলোকেরা আসিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হইয়াছেন তাহাদের নিকট তিনি আমার প্রতি আমার বড় ভাইয়ের অমানুষিক অত্যাচারের কথা আনুপূর্বক সকল বলিলেন। সেই হইতে তাঁহার ভক্ত-মণ্ডলীর মধ্যে আমি শহীদের মত উচ্চ সম্মানের আধিকারী হইলাম।

ইহার পরে আমাকে সন্ন্যাসীর নিকট যাওয়া বন্ধ করিতে আমার বড় ভাই আরও অভিনব শাস্তির ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু ধ্রুব প্রহ্লাদের যে আদর্শবাদ আমার মনে স্থান পাইয়াছিল তাহারই বলে আমি সমস্ত অত্যাচার সহ্য করিলাম। মিথ্যা হৌক—সত্য হৌক মানুষ যে-কোন বস্তু

লইয়াই বিশ্বাস স্থাপন করুক না কেন, অত্যাচার করিয়া, পীড়ন করিয়া কেহ তাহাকে সেই বিশ্বাস হইতে টলাইতে পারে না। আমার বড় ভাই যদি আমাকে ভালবাসিয়া সেই সন্ন্যাসী ঠাকুরের চাইতে আরও স্নেহ-মমতার সঙ্গে আমাকে বুঝাইতে পারিতেন যে সন্ন্যাসীর কাছে যাওয়া আমার পক্ষে ভাল না, ইহাতে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের ক্ষতি হইবে; তবে হয়ত তিনি আমাকে সেখানে যাওয়া হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিতেন। যুক্তি ছাড়িয়া যেখানেই কেহ শক্তির দম্ভে অপরকে নত করিতে যায়, সাময়িক ভাবে ইহাতে কিছুটা সাফল্য দেখা গেলেও সে সাফল্য শুধু বালুর উশরে লেখন লেখা, অল্প দিনেই মুছিয়া যায়।

আমার এই বড় ভাই অপরিণত বয়সে আমাকে এরূপ প্রহার করিয়া আমার যে ক্ষতি করিয়াছেন এমন ক্ষতি আমার কেহই করে নাই। তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনায় আমার স্মরণশক্তি এমন প্রখর ছিল যে, বাড়িতে না পড়িয়া স্কুলে যাইয়া শুধুমাত্র দুই একবার বই দেখিয়াই আমি শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিতাম। কিন্তু অপরিণত বয়সে এইরূপ অমানুষিক প্রহারের ফলে ধীরে ধীরে আমি সেই শৈশবেই স্মরণশক্তি হারাইয়া ফেলিলাম। এই জন্য যেমন আমার পাঠ্য-জীবনে তেমনি ভবিষ্যৎ-জীবনে স্মরণ-শক্তির অভাবে আমাকে বহু দুর্গতি সহ্য করিতে হইয়াছে।

শুধু বড় ভাই এর অত্যাচারই নয় আমি নিজেও স্বেচ্ছায় আমার জীবনের উপর আরও অনেক অত্যাচার ডাকিয়া আনিলাম। তখন আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম সুযোগ পাইলেই আমি একদিন বাড়ি-ঘর ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়া হিমালয় পর্বতে যাইয়া তপস্যা করিব। সন্ন্যাসী ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছিলাম, সেই বন্ধুর হিমালয় পথে কোন খাদ্য পাওয়া যায় না। এক রকমের গাছের বড় বড় পাতা পাওয়া যায়। তাহাই চিমটা দিয়া আগুনের উপর ধরিয়া সামান্য সিদ্ধ করিয়া খাইতে হয়। একদিন ঠিক করিয়া ফেলিলাম, আর মাছ-মাংস খাইব না। ধীরে ধীরে ভাতও ছাড়িয়া দিব। শুধু মাত্র শাক-পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করিব। আমার প্রতিজ্ঞা শুনিয়া বাড়ির কেহই কোন গুরুত্ব দিলেন না। তাঁহাদের ধারণা হইল দুই একদিন মাছ-মাংস না খাইয়াই আমার প্রতিজ্ঞা টুটিয়া যাইবে। কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা টুটিল না। আমাদের বাড়িতে রোজ ত আর

মাছ-মাংস রান্না হইত না। প্রায় অধিকাংশ দিনই শুধু ডাল-ভাত অথবা শাক-ভাত খাইতে হইত। যেদিন মাছ অথবা মাংস রান্না হইত সেদিন আমি লবণ, মরিচ, পেঁয়াজ-ভর্তা করিয়া ভাত খাইতাম।

প্রতিদিন একবেলাও যাদের ভাত জোটে না সেই গরীব মুসলমান চাষীদের রোজা রাখার মত এই মাছ-মাংস না খাওয়াটা আমার পক্ষে কিছুই অসুবিধা বলিয়া মনে হইত না। সন্ন্যাসীর আশ্রমে যে সব গোঁড়া-হিন্দু আসিত তাহারা আমার মুখে পেঁয়াজ ও রসুনের গন্ধ পাইত। এ জন্য মাঝে মাঝে সমালোচনাও করিত। ইহা ত স্বাভাবিক। যেদিন পেঁয়াজ-মরিচ ভর্তা করিয়া ভাত খাইতাম সেদিন মুখ হইতে কাঁচা পেঁয়াজের গন্ধ বাহির হইত। একজন গোঁড়া-হিন্দু একদিন এই কথা সন্ন্যাসী ঠাকুরকে বলিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি পেঁয়াজ-রসুন খাওয়া ছাড়িয়া দিতে পার?"

আমি বলিলাম, "নিশ্চয়ই পারি। আজ হইতে আর আমি পেঁয়াজ-রসুন স্পর্শও করিব না!"

এইবারই আমার সত্যকার আত্মপীড়ন আরম্ভ হইল। আমাদের মুসলমান পরিবারে যে যে তরকারী রান্না হয় তাহার প্রত্যেকটিতেই পেঁয়াজ-রসুন দেওয়া হয়। আমার মায়ের একলার সংসার। একটার বেশী তরকারী তিনি কখনও রাঁধিবার সময় পাইতেন না। আর সময় থাকিলেও আমাদের সামর্থ ছিল না। সপ্তাহে একদিন বা দুইদিন মা বিনা পেঁয়াজ-রসুনে আমাকে একটু ডাল রাঁধিয়া দিতেন। অন্যান্য দিনে আমি শুধু নুন মরিচ দিয়াই ভাত খাইতাম। দুধ ঘিয়ের কথা ত আসেই না। এইভাবে খাইতে খাইতে আমি শুখাইয়া কাঠ হইয়া উঠিলাম। কিন্তু আমার সংকল্প হইতে বিচ্যুত হইলাম না। ইহার পরে আমি আরও কঠোরতা আরম্ভ করিলাম। যে ঘরে আমার দাদা দানু মোল্লা থাকিতেন সেই ঘর পরিষ্কার করিয়া লেপিয়া-পুঁছিয়া সেখানে করিলাম আমার সাধনার স্থান। সকালে বিকালে আসন করিয়া বসিয়া ঘরের বেড়ায় কাগজে আঁকা একটি কালো ফোঁটার দিকে চাহিয়া থাকিতাম। কিন্তু সেই শিশু বয়সের চঞ্চলমন। কালো ফোঁটার দিকে চাহিয়া চাহিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুরের ওখানে কোন্ দিন কি ঘটনা ঘটিয়াছে এই সব চিন্তা করিতাম। বহুদিন ভাল কিছু খাই

না। সেই ধ্যানাসনে বসিয়া ভাল ভাল খাবার জিনিসের কথাও মনে আসিত। আগে আমি আমার পিতার সঙ্গে এক বিছানায় শয়ন করিতাম। এই সাধনা আরম্ভ করিয়া আমি একা সেই ঘরে শয়ন করিতে লাগিলাম।

মাঝে মাঝে আমি পদ্মাসনে বসিয়া নাভীমূলের দিকে চাহিয়া থাকিতাম সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিয়া দিয়াছিলেন, এইভাবে দেখিতে দেখিতে তুমি নাভী-মূলে একটি চন্দ্রের মত উজ্জ্বল বিন্দু দেখিতে পাইবে। কিন্তু নাভীর মূলে চাহিয়া চাহিয়াও আমার মন নানা কল্পনায় উধাও হইয়া যাইত। বিশেষ করিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুরের রোমাঞ্চকর ভ্রমণ কাহিনীর পথে পথে আমার মন ঘুড়িয়া বেড়াইত।

সেই চির-বন্ধু হিমাচল পথে ভীষণ শীত। তাই আমাকে শীত জয় করিতে হইবে। শীতকালে কোন রকম লেপ-কাঁথা গায়ে দেওয়া ত্যাগ করিলাম। শুইলে বেশী শীত করে বলিয়া কোঁচার খোঁট গায়ে দিয়া একটা তক্তা হেলান দিয়া সারারাত আধঘুমে কাটাইতাম। সকাল হইলেই নদীতে যাইয়া স্নান করিয়া শীতে ঠির ঠির করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আমার ঘরের আসনে বসিয়া নাভীমূলে চাহিয়া থাকিতাম। কিন্তু কোন দিনই নাভীমূলে একটুকুও আলোক রশ্মি দেখিতে পাইলাম না। সন্ন্যাসী ঠাকুরের আর আর শিষ্যেরা এরূপ সাধনা করিতে করিতে কত বিভূতি দেখিতে পাইতেন। বহুদূরে বসিয়া তাঁহারা যখন সাধনা করিতেন তখন অশরিরী হইয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর তাঁহাদের দর্শন করিতেন। মাঝে মাঝে কালী দেবী আসিয়াও তাঁহাদেয় ধ্যানে উদয় হইতেন। তাঁহারা সুযোগ পাইলেই এইসব গল্প করিতেন। আমি কিন্তু এত করিয়াও কিছুই দেখিতে পাইতাম না। মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছা হইত, বানাইয়া বানাইয়া আমিও এরূপ দু'একটি গল্প ইহাদের কাছে বলি। কিন্তু শৈশব হইতেই আমার অন্ধ-দাদা দানু মোল্লার কাছে সত্য ভাষণের যে শিক্ষা পাইয়াছিলাম তাহাই আমাকে এরূপ বানাইয়া বলা হয়তে নিরস্ত করিল।

আমি পায়ে জুতা পরিতাম না। শীতকালে গরম জামা কাপড় কিনিয়া দেওয়ার জোগ্যতাও আমার পিতার ছিল না। স্কুলে যাওয়ার সময় একটি সার্ট বা পাঞ্জাবী আর শীতকালে সুতোর একটি লাল

আলোয়ান বাজান কিনিয়া দিতেন। সেই আলোয়ানও আমি বর্জন করিলাম। এরূপ কৃচ্ছ্র সাধনা করিতে করিতে আমার প্রায়ই সর্দী কাশী হইতে লাগিল। গলার টন্‌সিল ফুলিয়া গেল কিন্তু কিছুই আমাকে এই কৃচ্ছ্র সাধনা হইতে টলাইতে পারিল না।

সন্ন্যাসী ঠাকুরের আশ্রমে আসিলে সমস্ত দুঃখ-কষ্ট যেন আমার মন হইতে মুছিয়া যাইত। তিনি আমার কৃচ্ছ্র-সাধনার কাহিনী আরও ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া তাঁহার শিষ্য-ভক্তমণ্ডলীকে বলিতেন। তাঁহারাও কেহ কেহ আমার বড়ই অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। একজন শিষ্য একদিন আমাকে এক বনের মধ্যে লইয়া গিয়া আমার পা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমি বিহ্বল হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। পরে তিনি আমার হাত দুইটি ধরিয়া বলিলেন, "জসীম! তুমি বল, যখন স্বর্গে যাইবে, আমাকে সঙ্গে না লইরা যাইবে না।" তাঁহার সেই কান্না দেখিয়া আগেই আমি কিছুটা ভয় পাইয়াছিলাম। আমি সহজেই বলিলাম, "আমি আপনাকে সঙ্গে না লইয়া স্বর্গে যাইব না।" ভদ্রলোক আমাকে লইয়া বনের বাহির হইয়া আসিলেন। আরও একদিন সন্ন্যাসী ঠাকুর তাঁহার ভক্তমণ্ডলীকে বলিলেন, "আমার যা কিছু সাধন-প্রনলী এই জসীমকে শিখাইয়া দিয়াছি। সে সাধনা করিবার সময় তোমাদের চাইতেও আরও অনেক ভাল ভাল বিভূতি দেখিতে পায়।

সন্ন্যাসী ঠাকুরের শিষ্যদের মধ্যে জলধর চক্রবর্তী নামে একজন মোক্তার ছিলেন। একদিন তিনি আমাকে তাঁর বাসায় ডাকিয়া লইয়া গিয়া বৈঠকখানার জানালা দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া বলিলেন, "বল, জসীম! বাবা তোকে কি কি সাধন-প্রণালী শিখাইয়াছেন?" আসন করিয়া নাভীমূলে চাহিয়া থাকা, একটি কালো ফোঁটার দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকা, আর কাকের মত ঠোঁট সরু করিয়া নিশ্বাস লইয়া নাক দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া প্রভৃতি আমি সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে যাহা যাহা শিখিয়াছিলাম তাঁহাকে বলিলাম। তিনি জেরা করিতে লাগিলেন, "আর কি কি শিখিয়াছিস, আমাকে বল?" আমি উত্তর করিলাম, "সন্ন্যাসী ঠাকুর আমাকে আর কিছুই শেখান নাই।"

অখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই সাধনা করিবার সময়

কি কি বিভূতি দেখিয়াছিস আমাকে বল্?" বিভূতি মানে সাধন-অবস্থায় সাধক নানা জিনিস দেখিতে পান। তিনি মাঝে মাঝে অনেক ঐন্দ্রজালিক শক্তির অধিকারীও হন।

আমি জলধর দাদাকে বলিলাম, "আমি সাধনা করিতে কোন বিভূতিই দেখিতে পাই না।" তিনি প্রশ্ন করিলেন, "তবে যে বাবা বলেন তুই সাধন-পথে অনেক অগ্রসর হইয়াছিস্? সাধনা করিতে করিতে অনেক কিছু দেখিতে পাস্?" আমি বলিলাম, "তিনি এই সব কেন বলেন আমি জানি না। আমি আপনাকে সত্য কথাই বলিতেছি।" জলধর দাদা আমাকে ছাড়িয়া দিলেন।

সন্ন্যাসী ঠাকুর মাঝে মাঝে তাঁর ভক্তদের নিমন্ত্রণে শহরে যাইতেন। সেদিন আশ্রমের পাহারার ভার থাকিত আমার উপর। কোন কোন দিন বাগানের ফুলগাছের চারা বা ডাল আনিবার জন্য জলধর দাদার বাড়ি যাইতাম। একদিন বাগান হইতে এ-গাছের ও-গাছের ডাল কাটিয়া জলধর দাদা আমার হাতে দিতেছেন এমন সময় অন্দর মহল হইতে আমার ডাক পড়িল। ভিতরে যাইয়া দেখি, দুর্গা-প্রতিমার মত একটি মহিলা বারান্দায় বসিয়া আছেন! লাল চওড়া পাড়ের সাদা ধব-ধবে কাপড় পরনে, কপালভরা লাল সিন্দুর। তিনি বলিলেন, "আমি তোর রাণী-দিদি। এইখানে বস্।" এই বলিয়া রাণীদিদি আমাকে একখানা পিঁড়ি আগাইয়া দিলেন। আমি দুই হাত জোড় করিয়া রাণীদিদিকে নমস্কার করিলাম। এই সেই রাণীদিদি! যাঁহার প্রসংসা সন্ন্যাসী ঠাকুর পঞ্চমুখে করেন, তিনি কত রকমের মিষ্টি তৈরী করিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে পাঠান। রাণীদিদি খুঁটিয়া খুঁটিয়া প্রশ্ন করিয়া আমার নিকট হইতে সন্ন্যাসী ঠাকুরের সমস্ত খবর জানিয়া লইলেন। সেই সব প্রশ্ন কতই তুচ্ছ বলিয়াই আজ মনে হয়। কিন্তু যে যাঁহাকে ভালবাসে, ভক্তি করে, তাঁহার কাছে এই সব তুচ্ছ ঘটনাই যে কত কাব্যময় হইয়া উঠে। "বাবা কোন্ সময় ঘুম হইতে উঠেন? কোথায় স্নান করিতে যান, কখন যান? বাবার বাগানখানা কত বড়? কি কি ফুলগাছ সেখানে লাগান হইয়াছে, কোন্ কোন্ গাছে ফুল ফুটিয়াছে?" এমনি প্রশ্নের পর প্রশ্ন। এই অবরোধবাসিনী মহিলার শ্মশান-ঘাটে আসিয়া সব কিছু দেখিয়া যাইবার ক্ষমতা নাই।

আমার নিকট হইতে সব কিছু জানিয়া হয়ত এই সন্ন্যাসী ঠাকুরের আশ্রমের পারিপার্শ্বীকতার একটি ছবি মনে মনে আঁকিয়া লইলেন। গল্প করিতে করিতে এক বাটি মিষ্টান্ন আনিয়া বলিলেন, "ভাই! জান ত আমরা হিন্দু। আমাদের থালাবাটিতে তোমাকে খাইতে দিলে আমার ভাসুরেরা অসন্তুষ্ট হইবেন। তুমি কিছু মনে করিও না। আমি তোমার হাতে একটু একটু করিয়া মিষ্টান্ন দেই, তুমি খাইতে থাক।" দিদি একটু একটু করিয়া মিষ্টান্ন আমার হাতে দিয়া আমাকে যত্নের সঙ্গে খাওয়াইলেন। তারপর আমাকে অঞ্জলি করিয়া হাত পাতা শিখাইয়া, সেই হাতের উপর শূন্য হইতে জল ঢালিয়া আমাকে পান করাইলেন। অনভ্যস্ত হাতে এরূপ জলপান করিতে জামার কিছুটা ভিজিয়া গেল। সেই জলের দু'এক ফোঁটা দিদির সুন্দর ধবধবে শাড়ীতেও লাগিল। দিদি এদিকে ওদিকে চাহিয়া তাহা শাড়ীর অপর ভাঁজে লুকাইয়া ফেলিলেন, পাছে বাড়ির আর কেহ দেখিয়া ফেলেন। বিদাযের সময় দিদি বার বার করিয়া বলিয়া দিলেন, "তুমি ভাই! যখনই অবসর পাবে আমার সঙ্গে আসিয়া দেখা করিও।'

ফুলগাছের কয়েকটি ডাল বগলে করিয়া শ্মশান-ঘাটে ফিরিলাম! দিদির সঙ্গে পরিচিত হইযা মনে হইল কি যেন অমূল্য রত্ন কুড়াইযা পাইলাম। তারই আনন্দে সারাপথ নাচিতে নাচিতে আর গান গাহিতে গাহিতে চলিলাম।

ইহার পরে যখনই অবসর পাইয়াছি দিদির সঙ্গে দেখা করিয়াছি। দিদি আমাকে কোন দিনই কিছু না কিছু, না খাওয়াইয়া ছাড়েন নাই। আমি যখন আমার আসনে বসিয়া ধ্যান করিতাম সন্ন্যাসী ঠাকুরের পাশে দিদির সুন্দর স্নেহময় হাসি মুখখানি আমার মনে ভাসিয়া উঠিত। মনে মনে ভাবিতাম, দিদি কেন আমাকে কোন কঠিন কাজের ভার দেন না? ধ্যান করিতে করিতে নিজেরই অজ্ঞাতে কাহিনীর জাল মেলিয়া ধরিতাম। দিদির খুব অসুখ করিয়াছে। ডাক্তার কবিরাজ কেহই সারাইতে পারিতেছে না। সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিলেন, শত মাইল দূরের পাহাড় হইতে কেহ যদি অমুক গাছের পাতা আনিয়া দিতে পারে, তবে রাণীদিদি ভাল হইয়া উঠিবেন। আমি মন্ত্রবলে সেই পাহাড়ে যাইয়া

উপস্থিত হইলাম। সেখানে বাঘ ভাল্লুক কত হিংস্র জানোয়ার। সবাই ঘুমাইয়া আছে। আমি পা টিপিয়া টিপিয়া অতি সাবধানে সেই গাছের কয়েকটি পাতা লইয়া আবার মন্ত্রবলে ফিরিয়া আসিলাম। সন্ন্যাসী ঠাকুর সেই পাতা ছেঁচিয়া দিদিকে খাওয়াইয়া দিলেন। দিদি তৎক্ষণাৎ ভাল হইয়া উঠিলেন। সবাই আমাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। তাহাতে আমার মনে এতটুকুও আনন্দ হইল না। দিদি যখন স্নেহের সঙ্গে বলিলেন, "ভাই! আমার কাছে আসিয়া বস," তখনই মনে হইল আমার সকল পরিশ্রম স্বার্থক হইল।

কিন্তু দুঃখের বিষয় কতদিন যে কতবার দিদির সঙ্গে দেখা হইয়াছে। কোনদিনই দিদিকে এতটুকু অসুখে পড়িতে দেখিলাম না।

দিদি যখন আমার সঙ্গে গল্প করিতেন তখন দিদির ছোট জা ও আসিয়া দিদির পাশে বসিতেন। তাহার চেহারা দিদির মত অত সুন্দর নয়। কিন্তু দিদির চাইতে বয়সে অনেক ছোট। তিনিও মাঝে মাঝে এটা ওটা আনিয়া আমাকে খাইতে দিতেন। তখনকার দিনে এই ব্রাহ্মণ বাড়ির রান্নাঘরে বসিয়া কেহ যদি পেয়াজ এই কথাটি উচ্চারণ করি, তবে রান্না-ঘরের সকল হাঁড়ি-কুড়ি ফেলিয়া দেওয়া হইত। পরবর্তীকালে দেখিয়াছি এই বাড়ির ছেলেরা মুসলমান বন্ধুদের বাড়িতে আসিয়া পোলাও মাংস খাইত। দিদির দেবর-পুত্র সুধীরলাল সঙ্গীত জগতে বিখ্যাত হইয়া একটি মুসলমান মেয়েকে বিবাহ করিয়াছিল। ত্রিশ বৎসরের মধ্যেই হিন্দু সমাজে এতটা পরিবর্তন আসিয়াছে। অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় সুধীর-লালের সুকণ্ঠ লইতে বঙ্গদেশ বঞ্চিত হইল।

রাণীদিদির বাসায় গেলে সন্ন্যাসী ঠাকুর কোন্‌দিন কি গল্প বলেন তাহা দিদিকে বলিতে হইত। সেই গল্প শুনিবার জন্য দিদির দুই জা, সুধীরলালের মা, রতনের মা আসিয়া বসিতেন। সামনে দুইটি হাঁটু ভাঙিয়া পিঁড়ি পাতিয়া তাঁহারা বসিতেন। তিনজনের তিনজোড়া পা আলতার রঙে রঙীন হইয়া লাল টুকটুক করিত। এই তিনজোড়া সুন্দর পায়ের কাছে আমি আমার গল্পের অঞ্জলি নিবেদন করিতাম। সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে গল্পটি যেমন শুনিতাম তার উপরে এই তিনজোড়া চরণের আলতার রঙ কিছু মাখাইয়া গল্পটিকে আরও একটু বাড়াইয়া

লইতাম। এক দিনের একটি গল্প মনে আছে। সন্ন্যাসী ঠাকুর যখন মানস-সরোবরের পথে হিমালয়ের অনেক উপরে উঠিয়াছেন, তখন তাঁহার বেদম জ্বর হইল। সেই জ্বরের জন্য তিনি নীচে নামিয়া আসিলেন। আর তিনি পথ চলিতে পারেন না। একটি পরিত্যক্ত কুঁড়েঘরে কম্বল মুড়ি দিয়া তিনি প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন। এমন সময় শিয়রে কাহার পায়ের মলের শব্দ শুনিতে পাইলেন, চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখেন, কাহাদের যেন একটি কালো মেয়ে সামনে দাঁড়াইয়া আছে। মুখখানি বড়ই লাবণ্য মাখা। সন্ন্যাসী ঠাকুরের কপালে হাত দিয়া মেয়েটি বলিল, "বাবা! তোমার ত বেশ জ্বর হইয়াছে। আহা? তোমাকে দেখিবার ত কেত নাই। কোন চিন্তা করিও না। আমিই তোমাকে দেখাশোনা করিব। এই দুধটুকু খাইয়া ফেল।" এই বলিয়া মেয়েটি একবাটি দুধ সন্ন্যাসী ঠাকুরের মুখের কাছে তুলিয়া ধরিল। তারপর সারারাত্র বসিয়া মেয়েটি সন্ন্যাসী ঠাকুরের মাথায় জলপট্টি দিল। গায়ে-মুখে হাত বুলাইতে লাগিল। এমনি করিয়া সাত আট দিন সমানে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া মেয়েটি সন্ন্যাসী ঠাকুরের সেবা যত্ন করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে সে অল্প সময়ের জন্য কোথায় উধাও হইয়া যাইত। তারপর কোথা হইতে দুধ লইয়া আসিত— ফলমূল লইয়া আসিত। সন্ন্যাসী ঠাকুর টেরও পাইতেন না। যখন তিনি অসুখের ঘোরে আহা-উহু করিতেছিলেন মেয়েটি সস্নেহে বলিত, "বাবা, তোমার কোন চিন্তা নাই। অল্পদিনেই ভাল হইয়া যাইবে।"

একদিন সন্ন্যাসী ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা! তুমি আমার কে? আমার জন্য তুমি এত করিতেছ কেন?"

মেয়েটি হাসিয়া বলিল, "তুমি যে আমার ছেলে বাবা! ছেলের জন্য মা এত কিছু করিবে না ত কে করিবে?" সন্ন্যাসী ঠাকুর আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! বল ত তুমি কে?"

মেয়েটি বলিল, "আমি গয়লাদের মেয়ে। পাহাড়ের ওই ধারে একটা বাড়ি দেখিতে পাইতেছ না? আমি ওইখানে থাকি" সন্ন্যাসী ঠাকুর মেয়েটির হাত দুইখানা কপালে রাখিয়া বলিলেন, "মা, বল ত; তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইবে না?"

মেয়েটি বলিল, "ছিঃ বাবা! অমন অলুক্ষণে কথা মনে করিতে নাই। মা কি কোনদিন ছেলেকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে? তুমি যখন ডাকিবে তখনই আমাকে পাইবে।" এমনি করিয়া দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। রোগী এখন কিছু ভালর দিকে। মেয়েটি এখন আর বসিয়া থাকে না। সকালে বিকালে আসিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুরকে খাওয়াইয়া দিয়া চলিয়া যায়। সেই সময়টি সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে যেন স্বর্গের মত মনে হয়। মেয়েটি যখন আসে তখন সমস্ত পাহাড় যেন বেলী ফুলের গন্ধে যেন ভরিয়া যায়।

সন্ন্যাসী ঠাকুর যেদিন অন্নপথ্য করিবেন সেদিন মেয়েটি নিজ হাতে রান্না করিল। তারপর ঝরণার জল আনিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুরকে স্নান করাইয়া আচল দিয়া তাঁহার গা মুছাইয়া দিল। নিজের হাতে তুলিয়া তুলিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুরকে খাওয়াইল। সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিলেন, "মা তুমি নিজে খাইবে না?"

মেয়েটি বলিল, "বাবা! আমার খাইতে অনেক দেরী। স্নান করিব। পূজা-অচনা করিব। তবে আমার খাওয়া। এই কলসীতে জল ভরিয়া রাখিয়া গেলাম। তেষ্টা পাইলে পান করিও। আর এই ভাণ্ডের মধ্যে কিছু ছাতু রাখিলাম। খুধা পাইলে খাইও। বাবা! আমার ত দেরী হইয়া গেল। আমি এখন যাই।"

এই বলিয়া মেয়েটি চলিয়া গেল। পরদিন সারাক্ষণ পথের দিকে চাহিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর অপেক্ষা করিলেন। মেয়েটি আসিল না। তার পরদিনও চলিয়া গেল। মেয়েটির আর দেখা নাই। কলসীর জল কলসীতে পড়িয়া রহিল। ভাণ্ডের ছাতু ভাণ্ডে পড়িয়া রহিল। কার খাওয়া কে খায়! সেই মেয়েটিকে খুঁজিয়া পাওয়া এখন সন্ন্যাসী ঠাকুরের একমাত্র কামনা। দুর্বল শরীরে যতটা পারেন এ-পাহাড় ও-পাহাড় ঘুরেন। মা মা বলিয়া ডাক ছাড়েন। পাহাড়ের গায়ে সে ডাক প্রতিধ্বনিত হইয়া তাঁহারই কানে আবার ফিরিয়া আসে। একদিন তিনি অনেক কষ্টে অদূরের গয়লা বস্তিতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে এ-বাড়ি ও-বাড়ি মেয়েটির কত সন্ধান করিলেন। কেহই তাহার কোন খোঁজ দিতে দিতে পারিল না।

এই গল্প শেষ হইলে দিদি একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন,

"কি করিয়া বাবা এই মেয়েটির সন্ধান পাইবেন? মা কালী স্বয়ং আসিয়া বাবার সেবা শুশ্রূষা করিয়া গেলেন।" এই বলিয়া দিদি দুইহাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইলেন।

দিদি শুধু আমার কাছে সন্ন্যাসী ঠাকুরের কথাই শুনিতেন না। খুঁটিয়া খুঁটিয়া তিনি আমার বাড়ি-ঘরের কথা, আমার মা-বাবা ভাই-বোনদের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। আমি যে প্রায় অধিকাংশ দিনই নুনভাত খাই তাহা শুনিয়া দিদির চোখ দুইটি অশ্রু সজল হইল। একদিন দিদি আমাকে বলিলেন, "জইসারে! তুই ত আমাকে আপন দিদির মতই জানিস। যেদিন তোর ইচ্ছা হয় আমার কাছে আসিয়া খাবার চাহিস। কোন লজ্জা করিস না।"

ইহার পর কোন কোন দিন এখানে ওখানে ঘুরিয়া সময় কাটাইয়াছি। বাড়ি যাইয়া খাইবার অবসর পাই নাই। বেলা তিনটার সময় রাণীদিদিকে যাইয়া বলিয়াছি, "দিদি! আপনার এখানে আমি খাইব।"

এত বেলায় সকলের খাওয়া হইয়া গিয়াছে। দিদিরা হাঁড়ি-পাতিল ধুইয়া তিন জায়ে গল্প করিতে বসিয়াছেন। দিদি আমার শুকনা মুখের দিকে চাহিয়া তৎক্ষণাৎ ঘরের বারান্দায় একটি ছোট্ট চুলায় আমার জন্য ভাত চড়াইয়া দিলেন। সুবীরলালের মা বটি পাতিয়া বসিয়া দুইটি পটলের ছাল ছাড়াইয়া সেই হাঁড়ির মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। রতনের মা আনিয়া দিলেন তিন চারটি আলু। গল্প করিতে করিতে কুড়ি মিনিটের মধ্যে রান্না শেষ হইয়া যাইত।

দিদি নিজের হাতে কলা পাতার উপর ভাত, পটল-ভর্তা, আলু-ভর্তা বাড়িয়া দিতেন। এক পাশে একটু ঘি ঢালিয়া দিতেন। একটি মুসলমান ছেলেকে বাড়ির বৌ ঝিরা এমন করিয়া খাওয়ায়, ইহা দিদির দুই ভাসুর হলধর বাবু আর গঙ্গাপ্রসাদ বাবু পছন্দ করিতেন না। একবার আমাকে শুনাইয়াই তাঁহারা দিদিকে একথা সেকথা বলিলেন। ইহাতে দিদির সুন্দর মুখখানা কালো হইয়া গেল। সেই হইতে দিদির ওখানে আর খাইতে চাহিতাম না। দেখা হইলে দিদি তবু আমাকে জোর করিয়া এটা ওটা খাওয়াইতেন।

সন্ন্যাসী ঠাকুরের আর এক ভক্ত ছিলেন মালখা নগরের সুহৃদ বসু

মহাশয়। তিনি ফরিদপুর সেটেলমেণ্ট অফিসে বড় চাকুরী করিতেন। এই ভদ্রলোকের সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি ছিল অগাধ ভক্তি। হিন্দু মুসলমান যেখানে যে-কোন সাধু দেখিতেন তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া তিনি বাড়িতে রাখিতেন; আমিরি হালে আহার করাইতেন, আর সাধুরা যখন যাহা চাহিতেন আনিয়া দিতেন। এই সুহৃদ-দার বাড়িতেও আমি মাঝে মাঝে যাইতাম। সুহৃদ-দার মা আদর করিয়া আমাকে খাওয়াইতেন। রাণীদিদি-দের বাড়ির মত এখানে ছোঁয়া-ছুঁয়ীর বাছবিচার ছিল না। সুহৃদ-দার স্ত্রী আমাদের বৌদিদি ছিলেন উজ্জল শ্যামবর্ণের মেয়েটি। পাতলা একহারা চেহারা। গা ভরা যেন সোহাগ ঝলমল করিত। শ্বাশুড়ির আদেশে তিনি আমাকে খাইতে দিতেন। আমার এঁটো থালা গেলাস বৌদি নিজেই পরিষ্কার করিতেন। সুহৃদ-দার বোন সাধনদিদি শ্বশুর বাড়ি হইতে বেড়াইতে আসিতেন। তিনিও আমাকে বড়ই স্নেহ করিতেন। এই বাড়িটি আমার নিজের বাড়ি বলিয়া মনে হইত। সন্ন্যাসী ঠাকুরও মাঝে মাঝে এখানে আসিতেন। সেদিন সুহৃদ দার বাসায় উৎসব পড়িয়া যাইত।

ফরিদপুর হইতে সেটেলমেণ্ট অফিস উঠিয়া গেল। তারপর সুহৃদ-দাদা যে কোথায় চলিয়া গেলেন সেই বয়সে খোঁজ লইতে পারি নাই। হয়ত তাঁহারা ফরিদপুর জেলা হইতে অন্য জেলায় চলিয়া গিয়াছিলেন। ইহার বহু বৎসর পর আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করি তখন মালখা নগরের কোন কোন লোকের নিকট সুহৃদ-দার খবর জানিতে চেষ্টা করি। পরলোকগত নলিনী ভট্টশালী মহাশয়ের নিকট শুনিলাম সুহৃদ দা সেটেল-মেণ্টের সেই বড় চাকুরী ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়া নানা দেশে ঘুরিয়াছেন। আগের সঞ্চিত টাকা পয়সা কিছুই নাই। বর্তমানে বিবাহের ঘটকালী করিয়া সংসার চালান। একদিন আমি বাসায় আসিয়া দেখি একজন সন্ন্যাসী আমার বৈঠক খানায় বসিয়া আছেন। তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "জসী! আমাকে চিনতে পার?" আমি বলিলাম, "না ত।" তিনি বলিলেন, "আমি তোমার সুহৃদ- দা।"

আমার দুইচোখ বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। এই সেই সাহেব-বেশধারী মিঃ সুহৃদ বোস। ব্যাটবল খেলার মাঠে যাঁর সুনামে

দিগদিগন্ত মুখরিত হইত। যাঁর দানের অন্ত ছিল না। আজ তাঁর এই জীর্ণ ভিখারীর বেশ। আমি দাদার পদধুলী লইয়া একে একে সকলের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, "মা কেমন আছেন—বৌদী কেমন আছেন? সাধনদিদি কোথায়? আপনার ছোট বোনটি—ভজন কোথায়? দাদা বলিলেন, "সবাই ভাল আছে! তুমি একবার চল আমার ওখানে। অনেককেই দেখিতে পাইবে।"

একটা দিন স্থির করিলাম দাদার ওখানে যাইবার। তারপর অতি সঙ্কোচের সঙ্গে দাদা আমাকে বলিলেন, "কিছু টাকা আমাকে ধার দিতে পার ভাই? ধর গোটা পঁচিশেক টাকা। তোমাকে বলিতে ত লজ্জা নাই। বড়ই অভাব পড়িয়াছে সংসারে।" আমি বলিলাম, "হাত খরচের জন্য আমার কাছে মাত্র দশটি টাকা আছে। ইহাতে কি আপনার হইবে?" দাদা বলিলেন, "আর যখন নাই, তাই দাও। তোমাকে বড়ই অসুবিধায় ফেলিলাম।"

আমি উত্তর করিলাম, "না দাদা। আমার কোনই অসুবিধা হইবে না। আপনি যে দয়া করিয়া এই লইতে চাহিলেন তাহাই আমার পরম সৌভাগ্য। আমার বালক কালে আপনার গৃহে যে আদর যত্ন পাইয়া আসিয়াছি তাহার ঋণ কোনদিন পরিশোধ করিতে পারিব না।" দাদা বলিলেন, "ও সব বলিয়া আর লজ্জা দিও না ভাই। আমরা তোমার কিছুই করি নাই।"

দাদাকে দশটি টাকা আনিয়া দিলাম। দাদা চলিয়া গেলেন। নির্দিষ্ট দিনে মালখা নগরে সুহৃদ-দার বাড়ি যাইয়া উপস্থিত হইলাম বসুদের সেই চকমিলান বাড়ি সুহৃদ-দার দারিদ্রের মতই চুন-জলের অভাবে খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে। বৌদি আসিয়া দেখা করিলেন। আমার সেই সোনার বৌদী। বয়সের নিষ্ঠুর দেবতা তাঁর অঙ্গ হইতে ঝলমল রূপ কবে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। কপালের বলিরেখায় মোটা কলমের আঘাতে কে যেন কঠোর দারিদ্রের লেখন লিখিয়া গিয়াছে। দেখিলেই পড়িতে পারা যায়। বৌদিকে বলিলাম, 'আমাকে চিনিতে পারেন বৌদি? আমার কথা মনে আছে আপনার?"

বৌদি বলিলেন, "কেন মনে থাকিবে না? সেকালের কথা কি

ভোলা যায় ?" মনে মনে ভাবিলাম, এই কঠোর অভাবের জীবনে সেই বিগতকালের দিনগুলির স্মৃতিই হয়ত ইহাদের বাঁচিয়া থাকার একমাত্র অবলম্বন! স্বেচ্ছায় সন্ন্যাস বরণ করিয়া সংসারের সবকিছু বিসর্জন দিয়াছিলেন সুহৃদ-দাদা। তাঁহার পায়ের কাছে অর্থ-সম্পদ গড়াগড়ি যাইত। তাহা স্বেচ্ছায় পদাঘাত করিয়া আজ পরিণত বয়সে সুহৃদ-দাদাকে কতজনের কাছেই সামান্য অর্থের জন্য হাত পাতিতে হয়।

বাড়ির ভিতরে যাইয়া মার সঙ্গে দেখা করিলাম। সেই স্নেহময়ী মা আজ কঠিন বাত ব্যাধিতে শয্যাগত। তিনি আমাকে দেখিয়া কত খুশী হইলেন। সুহৃদ-দা আর একটি বিবাহ করিযাছেন। সেই নতুন বৌদিকেও দেখিলাম। রূপে আগের বৌদিদির পায়ের নখেরও সমান নয়! বয়সও বেশ। মানুষ কার কি দেখিয়া যে ভোলে তা বিধাতারও অগোচর!

আমি যতদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতাম, সুহৃদ-দা মাঝে মাঝে আমাকে দেখিতে আসিতেন। তারপর আমি কলিকাতা চলিয়া গেলাম। দেশ বিভাগের পর সুহৃদ-দাদারা যে কোথায় গিয়াছেন জানিতে পারি নাই।

সন্ন্যাসী ঠাকুরের আশ্রমে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় শহর হইতে বহু লোক আসিত। তাহাদের কেহ কেহ সন্ন্যাসী ঠাকুরকে গান শুনাইতেন। তিনি গান বড় ভালবাসিতেন। তিনি তান্ত্রীক সন্ন্যাসী ছিলেন বলিয়া এখানে প্রায়ই শ্যামা বিষয়ক গান হইত। কয়েকটি গানের প্রথম পদ এখনও আমার মনে আছে,

(১) আয় মা সাধন সমরে, দেখি, মা হারে কি পুত্র হারে।

(২) এবার কালী তোমায় খাব, খাব খাব তোর মুণ্ডমালা চিবিয়ে খাব।

(৩) শ্মশান ভালবাসিস বলে শ্মশান হৃদি।

(৪) ভক্তের কাঙাল ভবে চিরকাল ভক্ত আমার প্রাণের প্রাণ।

(৫) তারা তারা তারা বলে। (৬) আগে পাছে দুঃখ চলে মা।

নির্জন নদীতীরে বসিয়া এই সব গানের যতগুলি কলি আমার মনে থাকিত একা একা গাহিয়া যাইতাম। সেকালে এরূপ বহুগানের সুর

আমি শিখিয়া ফেলিয়াছিলাম। সন্ন্যাসী ঠাকুরের একজন চেলা ভাল গান গাহিতে পারিতেন। নাম মনে নাই। তিনি আমাকে কয়কটি গান শিখাইয়া দিয়েছেন। গানের জগতে আমার প্রথম হাতে খড়ি হইয়াছিল এই সব ভদ্রলোকী শহরে-গানের মারফৎ। আজ ভাবিয়া আশ্চর্য হই, পরিণত বয়সে এই সব ভদ্রলোকী-গানের এমন বিরূপ সমালোচক আমি কি করিয়া লইয়া উঠিলাম?

একবার আমাদের এক ভগ্নীপতি পদ্মাপার হইতে আমাদের বাড়ি বেড়াইতে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে একখানা বিষাদসিন্ধু বই ছিল। তিনি সন্ন্যাসী ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহার বড়ই অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁর সেই বিষাদসিন্ধু বইখানা সন্ন্যাসী ঠাকুরকে তিনি পড়িতে দিলেন। সেই বই পড়িতে পড়িতে সন্ন্যাসী ঠাকুর প্রায়ই চোখের জল মুছিতেন। এই পুস্তকের করুণ কাহিনী তাঁহাকে এতই প্রভাবিত করিয়াছিল যে, সন্ধ্যাবেলায় শহর হইতে ভক্তমণ্ডলী আসিলে তিনি প্রায়ই তাহাদের নিকট বিষাদসিন্ধুর কাহিনী বলিতেন। বলিতে বলিতে তাঁহার সঙ্গে তাঁহার শ্রোতাদেরও চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইত।

সন্ন্যাসী ঠাকুর তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। বৈষ্ণবদের মত রাগ, হিংসা দমন করার শিক্ষা তাঁহার ছিল না। কোন দুশ্চরিত্র লোক তাঁহার নিকট আসিয়া তিনি তাহাকে বড়ই বকিতেন। এজন্য একদল লোক সন্ন্যাসী ঠাকুরের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিল। শহর হইতে বারবনিতা-দের আনিয়া দুষ্টলোকেরা মাঝে মাঝে শ্মশানে আসিয়া মদ খাইত। সন্ন্যাসী ঠাকুর এখানে আশ্রম করায় তাহাদের পক্ষে বড়ই অসুবিধা হইল। সন্ন্যাসী ঠাকুর শহরে গেলে বহু স্ত্রীলোক তাঁহাকে দেখিতে আসিত। একবার সুহৃদ-দার শহরের বাড়িতে সন্ন্যাসী ঠাকুর রাত্র যাপন করেন। তখন শহরের বহু স্ত্রীপুরুষ তাঁহার উপদেশ শুনিতে আসেন। এমন সময় দুইটি লোক সন্ন্যাসী ঠাকুরকে তাঁহার চরিত্র লইয়া আপত্তি জনক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। ইহাতে সন্ন্যাসী ঠাকুর বড়ই রুষ্ট হইয়া পড়েন। শিষ্যেরা লোক দুইটিকে ঘাড় ধরিয়া সেখান হইতে বাহির করিয়া দেন।

পরদিন নানা কুৎসা করিয়া সেই লোক দুইটি কোর্টে যাইয়া সন্ন্যাসী

ঠাকুরের নামে এক মামলা দায়ের করিয়া দিল। ইহা লইয়া সারা শহরে টি টি পড়িয়া গেল। সন্ন্যাসী ঠাকুরের নামে তাঁহার বিরুদ্ধে পক্ষীয়েরা নানা রকম কুৎসা প্রচার করিতে লাগিল। তখনকার দিনে ফরিদপুর হইতে 'সঞ্জয়' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির হইত। সেই পত্রিকা প্রতি সপ্তাহে সন্ন্যাসী ঠাকুরের নামে স্ত্রীলোক-গঠিত নানা কল্পিত কাহিনী প্রচার করিতে লাগিল। কোন ভাল লোকের নামে কেহ কুৎসা রটাইলে লোকে সহজেই তাহা বিশ্বাস করে। মামলা সন্ন্যাসী ঠাকুর খরচাসহ ডিক্রী পাইলেন। কিন্তু তাঁহার ভক্ত গোষ্ঠির সংখ্যা দিন দিন কমিতে লাগিল। আগে যেখানে প্রতিদিন শহর হইতে ভারে ভারে মিষ্টি ও খাবার নানা রকম সামগ্রী আসিত, এখন তাঁহার কিছু আসে না। বিহারীলাল নামে সন্ন্যাসী ঠাকুরের এক শিষ্য প্রতিদিন দুইবেলা নিয়মিত খাবার ওঠাইতেন। স্ত্রীর প্রতি কি অত্যাচার করায় সন্ন্যাসী ঠাকুর তাঁহার খাবার বর্জন করিলেন।

এখন প্রতিদিন তিনি চিড়া ভিজাইয়া তাহাই চিনি অথবা কলা দিয়া খাইতেন। তাহাও কিছুটা জোর করিয়া আমাকে খাওয়াইতেন। অল্প আহারে দিন দিন তাঁহার শরীর শুখাইয়া যাইতে লাগিল। তিনি যাহাকে তাহাকে শিষ্য করিতেন না। বাছিয়া বাছিয়া যাঁহাদিগকে শিষ্য করিতেন তাঁহাদিগকে প্রতিদিন তাঁহার আশ্রমে আসিয়া যোগ-সাধনা অভ্যাস করিতে হইত। তাঁহারা নিয়মিত না আসিলে তিনি বড়ই রুষ্ট হইতেন। আমি ছোট বলিয়া আমাকে তিনি কোন যোগ-সাধানা শিখান নাই। মাত্র কয়েকটি মুদ্রা ও ধ্যান শিখাইয়াছিলেন। আস্তে আস্তে শিষ্যেরাও আর যোগ-সাধনা করিতে আসে না। তিনি নিজে যোগ-সাধনা করিতেন আর অবসর পাইলে বই পড়িতেন। তাঁহার নিকট 'উৎসব' আর 'ব্রহ্মবিদ্যা' নামে দুইখানা মাসিক পত্র আসিত। রামবাবু নামে এক ভদ্রলোক 'উৎসবের' সম্পাদক ছিলেন। পরবর্তীকালে এই রাম বাবুর নিকট নজরুল ইসলাম যোগ শিক্ষা করিয়াছিলেন। 'ব্রহ্মবিদ্যার' সম্পাদক ছিলেন পরলোকগত দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। বৎসর শেষ হইলে এই পত্রিকা দুইখানা তিনি দপ্তরী দিয়া বাঁধাইয়া লইতেন। তাহার নিকট আরও অনেক বই ছিল।

সবই দর্শন শাস্ত্রের উপর। 'ধর্ম পূজা মিমাংসা' বলিয়া একখানা বই তিনি আমাকে পড়িতে দিয়াছেলেন। সেই পুস্তকে অনেক উপদেশ লিখিত ছিল।

ইতিমধ্যে একটি কাণ্ড ঘটিল। একদিন সন্ন্যাসী ঠাকুর রাতে শুইয়া আছেন। তাঁহার ঘরের দরজা বন্ধ। এমন সময় একটি লোক তাঁহার বুকের উপর বসিয়া তাঁহার সারাগায়ে ফুঁদিতে লাগিল। সেই ফুয়ের সঙ্গে গাদা গদা আগুন সন্ন্যাসী ঠাকুরের গায়ে পড়িতে লাগিল। তারপর লোকটি অদৃশ্য হইয়া গেল। এই কাহিনী শুনিয়া শিষ্যেরা বলিল, 'মা কালী' তাঁর চর পাঠাইয়া সন্ন্যাসী ঠাকুরকে পরিশুদ্ধ করিয়া গেলেন।"

রাত্রকালে মাঝে মাঝে সন্ন্যাসী ঠাকুর শ্মশানের শেওড়া গাছটির সামনে নদীর দিকে মুখ করিয়া একটি মেযেকে বসিয়া থাকিতে দেখিতেন। তাঁর পরনে সাদা ধবধবে বসনের মতই তাঁহার গায়ের রঙ ফর্সা। তিনি নাকি একটি ব্রাহ্মণ কন্যা। সকাল হইবার আগেই তিনি আকাশে ভাসিয়া অদৃশ্য হইয়া যাইতেন। স্যাসী ঠাকুরের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাঁহার আলাপও হইত। এই সব কাহিনী শুনিয়া মাঝে মাঝে আমার সামান্য ভয়ও করিত।

শ্মশান ঘাটে শহর হইতে বহু লোক মড়া পোড়াইতে আসিত। একবার একটি অল্প বয়সের বউকে পোড়াইতে আনিয়াছে। অপরিণত বয়সে সন্তান হওয়ার সময় মেয়েটি মারা যায়। দেখিতে মেয়েটি কতই সুন্দর। দু'টি পায়ে দবদব করিতেছে আলতার রঙ আর কপাল ভরিয়া লাল সিন্দুর। বউটিকে যখন চিতার উপর তুলিয়া দেওয়া হইল কোথা হইতে আমার দুই চোখ বাহিয়া জল গড়াইতে লাগিল।

আর একবার একটি অল্প বয়স্ক যুবককে পোড়াইতে আনা হইয়াছিল। তাহার যুবতী বধূর সে কি কান্না। শুনিলাম যুবকটির আর কোন ভাই নাই। মাত্র ছয় মাস আগে বিবাহ হইয়াছিল। বিধবা হইয়া মেয়েটি কার কাছে আশ্রয় পাইবে? এই মেয়েটির কান্না দেখিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর ঘন ঘন চোখ মুছিতে লাগিলেন। স্বামীকে যখন চিতায় তুলিয়া দেওয়া হইল তখন মেয়েটি বারবার সেই চিতার আগুনে

ঝাঁপাইয়া পড়িতে চেষ্টা করিতেছিল। দুই তিন জন লোক তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না।

স্বামীর চিতার আগুন নিবিলে আত্মীয় স্বজনেরা যখন তাহার হাত হইতে শঙ্খ ভাঙ্গিয়া ফেলিল, কপাল হইতে সিঁদুর মুছিয়া ফেলিল তখন মেয়েটি কি কান্না! সেই কান্নায় আকাশ বাতাশ বিদির্ণ হইতেছিল। কতকালের ঘটনা। আজও যেন সেই পতি-বিয়োগ-বিধুরা বউটিকে আমি চোখে দেখিতেছি।

আরও একদিন একটি বয়সী হিন্দু মেয়েকে দাহন করিতে আনা হইল। আমারই বয়সের দুইটি ছেলে আসিয়াছে মায়ের মুখাগ্নি করিতে। তারা ভালমত বুঝিতেও পারে না, মাকে হারানো যে কি জিনিস! চিতা নিবিলে সেখানে পানি ঢালিয়া পরিষ্কার করা হইল। তারপর একজন বয়স্ক লোক ছেলেদের হাতে পাঁচটি কড়ি দিয়া তাহাদিগকে বলিত, "মা এই পাঁচ কড়ার কড়ি দিলাম। ইহা দিয়া যাহা হয় কিনিয়া খাইও। আর বাড়ি ফিরিয়া যাইও না।" তাহাই বলিয়া ছেলে দুইটি চলিয়া গেল। আর পিছনে ফিরিয়া চাহিল না। আমার বড়ই কষ্ট লাগিল। সত্য সত্যই যদি মা আবার অশরীরী পাইয়া ছেলেদের দেখিতে যান তাকে কি এমন করিয়া বারন করিয়া দিতে হয়।

শ্মশানে কতরকমের মরাই না আসিত। বড়লোকদের কেহ মরিলে সঙ্গে কীর্তনের দল গান গাহিতে গাহিতে আসিত। সেই গানের সুরে আকাশ-বাতাস কাঁদিয়া উঠিত। একটি গানের পদ এখনও আমার মনে আছে, "ও তোর মোহন বাশী ধূলায় পড়ে রইল।" বিলম্বিত লয়ের এই গানটির সুর সমস্ত শ্মশান-প্রকৃতিকে ব্যথিত করিয়া তুলিত। কতদিন গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া শ্মশান-যাত্রিদের মুখে কীর্তনের সুর শুনিয়া বুকের কোনখানটি যেন কেমন করিয়া উঠিত। এই শ্মশান-ঘাট তাই আমার একমাত্র ভয়েরই প্রতীক হইয়া রহিল না, মৃতদের করুণ কাহিনীর সহিত কীর্তনের বিলম্বিত সুর আমার বালক-মনে বড়ই গভীর করিয়া দাগ কাটিয়া গেল।

সেদিন শ্মশানে যাইতে সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিলেন, "আমি আগামী রবিবারে এখান হইতে চলিয়া যাইব।" অমনি আমার দুই চোখ

বাহিয়া ফোঁটায় ফোঁটায় পানি গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তিনি আমাকে কাছে ডাকিয়া অনেক সান্তনা দিলেন। আমি বলিলাম, "আপনি কোথায় যাইবেন?"

"সন্ন্যাসীর তা বলিতে নাই। হয়ত আবার হিমালয়ের পথে রওয়ানা হইব" তিনি উত্তর করিলেন।

এই হিমালয়ের পথে তাঁর সঙ্গী হইবার জন্য কতদিন হইতে কতভাবে আমি কৃচ্ছ্র-সাধনা করিয়া আসিতেছি। মাছ, মাংস ছাড়িয়াছি—পেঁয়াজ, রসুন ছাড়িয়াছি। শীতকালে বোচার খোঁট গায়ে দিয়া সারারাত কাটাইয়াছি। বালিশহীন বিছানায় সামান্য মাদুর পাতিয়া ঘুমাইয়াছি। আজ সন্ন্যাসী ঠাকুর কি না আমাকে ফেলিয়া একাই হিমালয়ের পথে রওয়ানা হইবেন! আমি অনুনয় করিয়া তাঁহাকে বলিলাম, "আমি আপনার সঙ্গে যাইব। আপনি যদি আমাকে ফেলিয়া যান আমি আর প্রাণে বাঁচিব না। জানেন ত বাড়িতে আমার বড় ভাই আমার উপর অকথ্য অত্যাচার করে। আমি একমাত্র শান্তি পাই আপনার এখানে আসিলে। সেই আপনি যদি চলিয়া যাইবেন, আমি কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিব?" এই বলিয়া আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। তিনিও চোখের পানি মুছিলেন। তারপর তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা! তুমি আমার সঙ্গে যাইও। পথে কিন্তু অনেক কষ্ট। তোমাকে আমি সাপের বাঘের পথে লইয়া যাইতেছি। অল্প আহার, অনাহারের পথে লইয়া যাইতেছি। একথা মনে থাকে যেন।"

দুঃখ-বিপদের পথে যে রোমাঞ্চ আছে আমার সেই বালক বয়সে তাহার আকর্ষণ আমার কাছে কম লোভনীয় নয়। বলিলাম "আমি পিছপা হইব না। আপনার সঙ্গে থাকিতে কোন বিপদ-আপদই আমাকে টলাইতে পারিবে না।"

সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিলেন, "তোমাকে ভয় জয় করিতে হইবে। কোন কিছুতেই কিন্তু ভয় পাইলে চলিবে না।"

আমি বলিলাম, "আপনি যেরূপ আদেশ করিবেন সেইরূপ করিব।"

তখনো সন্ন্যাসী ঠাকুরের যাত্রা করিবার তিনদিন মাত্র বাকী ছিল।

আমি এই তিনদিন নানাভাবে কান্নাকাটি করিয়া তাঁহার স্নেহ-প্রবণ হৃদয়ে আরও আঘাত হানিব এই ভয়েই তিনি আমাকে মিথ্যা বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন, অথবা সত্য সত্যই তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন আজ সে কথা ভাল করিয়া বলিতে পারিব না।

আর তিনদিন মাত্র বাড়ি থাকিব। তাই এই তিনদিন পিতামাতার বড়ই বাধ্য হইয়া উঠিলাম! ভাত রাঁধিতে মায়ের লাকড়ির কষ্ট। এখানে-ওখান হইতে গাছের শুকনা ডালপালা আনিয়া মাকে দেই। বাড়ির গরু দুইটিকে মাঠ হইতে ঘাস কাটিয়া আনিয়া দেই। মা ও বাজান অবাক হইয়া যান। রাত্রে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া সেই সুদূর হিমালয়ের স্বপ্ন দেখি, আমি যেন লছমন ঝোলার সেতু পার হইয়া কেদার বদরী ছাড়াইয়া অনেক—অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছি।

নির্দিষ্ট দিনে আমি টেপাখোলা রেলষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সন্ন্যাসী ঠাকুর যে গাড়ীতে উঠিলেন আমিও সেই গাড়ীতে উঠিয়া এককোণে বসিয়া রহিলাম। সন্ন্যাসী ঠাকুরের শিষ্যেরা ভক্তেরা সকলেই তাঁহাকে বিদায় দিবার জন্য ষ্টেশনে আসিয়াছেন। তাঁহারা কেহ কাঁদিতেছেন, কেহ সন্ন্যাসী ঠাকুরকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে নানা রকম অনুরোধ-উপরোধ করিতেছেন। আমি ও সন্ন্যাসী ঠাকুরের সঙ্গেই চলিয়াছি। আমার মন এক অপূর্ব আনন্দে ভরপুর।

গাড়ীর যখন প্রথম ঘন্টা বাজিল তখন সকলের দৃষ্টি আমার উপর পড়িল। জলধর দাদা মোক্তার মানুষ। আইন-কানুন জানেন। বালক বয়সে আমাকে লইয়া গেলে সন্ন্যাসী ঠাকুরকে বিপদে পড়িতে হইবে। তিনি আমাকে বলিলেন, "একি জসীম! তুমি শিগগীর নামিয়া আস, গাড়ী এখনই ছাড়িবে?" আমি বলিলাম, "আমার ত নামিবার কথা নয়। আমি সন্ন্যাসী ঠাকুরের সঙ্গে যাইব।"

সন্ন্যাসী ঠাকুর আমাকে কাছে ডাকিয়া কত বুঝাইলেন, "তুমি বড় হও। আবার আমি আসিয়া তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব! এতটুকু বয়সে তুমি কিছুতেই সেই পথের কষ্ট সহ্য করিতে পারিবে না।" আমি কিছুতেই গাড়ী হইতে নামি না। তখন দুই তিনজন শিষ্য আমাকে জোর করিয়া গাড়ী হইতে নামাইয়া দিলেন। আমি

প্লাটফর্মে নামিয়া গাড়ির ইঞ্জিনের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সন্ন্যাসী ঠাকুরকে আমি এত ভক্তি করি—ভালবাসি, তাঁর জন্য আমি কত কঠোর অত্যাচার সহ্য করি। আজ তিনিই যদি এমন করিয়া আমাকে ছাড়িয়া গেলেন তবে এ জীবনে আমার কি প্রয়োজন? সন্ন্যাসী ঠাকুরের গাড়ী যখন ছাড়িবে, আমি তার চাকার তলায় পড়িয়া আত্মহত্যা করিব। আমি গাড়ীর ইঞ্জিনের দিকে অগ্রসর হইতেছি এমন সময় তিন চারজন শিষ্য আমাকে সন্ন্যাসী ঠাকুরের নিকট ধরিয়া লইয়া গেল। তিনি আমাকে গায়ে-মুখে হাত বুলাইয়া কত সান্ত্বনা দিলেন। তখন আমার অশ্রু-সাগরে বান ডাকিয়াছে। আমি ফোঁপা-ইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। সন্ন্যাসী ঠাকুরের গাড়ী ছাড়িয়া দিল। মনে হইল আমার এত কালের আশা-আকাঙ্খা স্বপ্ন সবই যেন সেই গাড়ীর চাকার তলে পড়িয়া চুরমার হইয়া গেল। জলধর-দাদা আমাকে বলিলেন, "কাল সকালে তুমি আমার বাসায় অসিও। আমি বাবার একখানা ফটো তোমাকে দিব। সেই ফটোর দিকে চাহিয়া চাহিয়া তুমি বাবাকে জীবন্ত দেখিতে পাইবে।" সুহৃদ-দা বলিলেন, "বাবা চলিয়া গেলেন, আমরা ত রহিলাম। আমার বাসায় যখন তখন আসিও। ভাল কিছু খাবার দরকার হইলে তোমার বউদিদিকে বলিও! টাকা-পয়সার দরকার হইলে আমাকে বলিও! জসী! তুমি বড় হইয়া একজন উঁচু দরের সাধু হইবে, তখন আমাদের কথা ভুলিও না।"

পরদিন সকালে জলধর-দাদার সঙ্গে দেখা করিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুরের একখানা বাঁধানো ফটো লইয়া আসিলাম। সেই ফটো শ্মশান ঘাটে সন্ন্যাসী ঠাকুরের ঘরে টানাইয়া এক দৃষ্টিতে সেই ফটোর দিকে চাহিয়া রহিলাম। বিকাল হইলে রেল সড়ক হইতে একটি বণ্টু কুড়াইয়া আনিয়া ফটোর সামনে শিবমূর্তী বলিয়া স্থাপন করিলাম। তাহার সামনে ধূপ-ধূনা জ্বালাইয়া মনে মনে নানা প্রার্থনা করিলাম। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সদ্ভাবশতক বই হইতে একটি স্তোত্র মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছিলাম। তাহা কয়েকবার আবৃত্তি করিলাম।

তার পর বসিয়া বসিয়া মনে মনে নানা কল্পনা জল্পনা করিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "ভয়কে জয় করিতে হইবে। কোন প্রকার ভয়ই যেন তোমাকে আচ্ছন্ন করিতে না পারে।" স্থির করিলাম, এই শ্মশানঘাটে রাত্রে আসিতে সকলেই ত ভয় পায়। আচ্ছা। আমি যদি এখানে সন্ন্যাসী ঠাকুরের ঘরে রাত্র যাপন করি তবে কেমন হয়? সন্ধ্যার আগেই বাড়ি হইতে সামান্য কিছু খাইয়া সন্ন্যাসী ঠাকুরের ঘরে আসিয়া হারিকেন লণ্ঠন দুইটি পরিস্কার করিয়া জ্বালাইলাম। তারপর সেই লোহার বল্টুটির সামনে ধূপ-ধূনা জ্বালাইয়া আগের মতই প্রার্থনা করিলাম। এ কয়দিনের নানা উত্তেজনায় ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারি নাই। প্রার্থনা করিতে করিতে কখন যে ঘুমাইযা পড়িলাম টেরও পাইলাম না। সকালে পাখির ডাকে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ঘুম হইতে উঠিয়া মুখ-হাত ধুইয়া জলধর দাদার বাড়ি গেলাম। আমার শ্মশানবাসের খবর শুনিয়া রাণীদিদি আর জলধর-দাদা তাজ্জব হইলেন। সেই আট নয় বৎসরের একটি ছোট ছেলে যে একাকী শ্মশান ঘাটে রাত্র যাপন করিতে পারে ইহা সহজে অপর কেহ বিশ্বাস করিতে পারে না। কিন্তু আমি কোন দিন মিথ্যা কথা বলি না, ইহা তাঁহারা জানিতেন। আমার ভবিষ্যৎ সাধু-জীবনের প্রতিও তাঁহাদের গভীর বিশ্বাস ছিল। জলধর দাদা বলিলেন, "তুমি যদি শ্মশানে এমনি একাকী থাকিতে চাও, আমি এখান হইতে প্রতিদিন তোমার খাওয়ার ব্যবস্থা করিব।"

রাণীদিদি আমার উপর আরও খুশী হইলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর চলিয়া যাওয়ায় তিনি বড়ই ব্যথা পাইয়াছিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন, "জইসাবে! শ্মশানে বসিয়া বাবাকে ভাল করিয়া ডাকিস্। তোর ডাকে নিশ্চয় তিনি ফিরিয়া আসিবেন।"

রাণীদিদির কথাগুলি আমার মনে যেন বিদ্যুতের মত বাসা বাঁধিয়া ঝলমল করিতে লাগিল। এই দিদিটির খুশীর জন্য আমি যেন সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে পারিতাম, আগুনে লম্ফ প্রদান করিতে পারিতাম।

নাচিতে নাচিতে শ্মশানঘাটে ফিরিয়া আসিলাম। তখন শহরে কলেরায় বহুলোক মরিতেছে। সেদিন তিন চারিটি দল শ্মশানে আসিয়া মরা পোড়াইয়া গেল। দুপুর বেলা শোভারামপুরের ভিটা-বাড়ির বাগান

হইতে চুরি করিয়া তিন চার ছড়া সিঁদুরে গাছের কাঁচা আম পাড়িয়া আনিলাম। লোহার বণ্টুর সেই শিবের সামনে আমার চৌর্যবৃত্তি-আহরিত আমগুলি টানাইয়া ভোগ দিলাম। লোহার ঠাকুর এজন্য কোনই উচ্চবাচ্য করিল না। সন্ধ্যা হইলে আগের মতই ধূপ-ধূনা জ্বালাইয়া সেই ঠাকুরকে পূজা করিতে বসিলাম। কলেরার দিন বলিয়া পথে-ঘাটে লোকের আনাগোনা নাই। চারিদিক নীরব থমথম।

আগেই বলিয়াছি, সন্ন্যাসী ঠাকুরের ছোট ঘরখানার সামনে একটি উঠান ছিল। সেই উঠানের পাশে একটি দরজা। দরজার পাশে একটি দীর্ঘ বাঁশ পোতা। সেই বাঁশের আগায় একটি গেরুয়া রঙের পতাকা উড়িত। এই ঘর হইতে প্রায় দুইশত গজ দূরে শ্মশানের জল্লাদের বাড়ি। তার নাম ছিল ঝপু। সেখানে সে তাহার স্ত্রী জানকী আর ছেলে হাজারীকে লইয়া থাকিত। সন্ন্যাসী ঠাকুর বিপদে-আপদে তাহাদের ডাকিলে তাহারা আসিয়া সাড়া দিত।

রাত তখন আটটা কি নয়টা হইবে। আমি মাটিতে উবু হইয়া চৌকির উপরের লোহার বণ্টুর শিবকে ধূপ-ধূনা দিতেছি, এমন সময় উঠানের দরজার বাঁশটি ধরিয়া কে যেন বহুক্ষণ ঝাঁকুনি দিল। আমার হাত হইতে ধূপের পাত্রটি পড়িয়া গেল। ভয়ে আমার বুক ঘন ঘন কাঁপিতে লাগিল। সামনের চৌকির সঙ্গে বুক লাগাইয়া আমি সেই কাঁপুনি থামাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এমন সময় ঘরের বেড়ায় কে যেন দুই তিনটি থাপড় মারিল। আমি জানিতাম ভয় পাইয়া চীৎকার করিলে আর রক্ষা নাই। তখনই অজ্ঞান হইয়া মরিতে হইবে। তাই চীৎকার করিবার ইচ্ছা হইলেও আমি নিজেকে দমন করিলাম। ভাবিলাম, মা কালী পরীক্ষা করিবার জন্য আমাকে এরূপ ভয় দেখাইতেছেন। আমি নিশ্চয়ই ভয়কে জয় করিব।

কিন্তু ধীরে ধীরে আমার মনে সাহস ফুরাইয়া যাইতেছে। বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম; একবার সন্ন্যাসী ঠাকুরের গায়ের উপর বসিয়া কে যেন আগুনের নিশ্বাস ছাড়িয়া গিয়াছিল। সেই অশরীরী লোকটি যদি আজ আসিয়া আমার বুকের উপর চড়িয়া বসে তখন ত আমি চীৎকার না দিয়া থাকিতে পারিব না। আর চীৎকার দিলেই

ত আমার রক্ষা নাই।

এই ঘরের অদূরে ঝপু জল্লাদের বাড়ি। আমি প্রাণপণে ঝপু ঝপু করিয়া ডাকিতে লাগিলাম। কিন্তু কার ডাক কে শোনে! আমারই কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হইয়া আমার চারিদিকে আরও ভয়ের ছায়া বিস্তার করিতে লাগিল।

মনে মনে ভাবিলাম, আমি যদি এই ঘরে আজ রাত্র যাপন করি তবে আমার মরণ নিশ্চিত। আর যদি এখান হইতে বাহির হইয়া বাড়ি যাইতে চেষ্টা করি তবে পথে মরিতেও পারি, বাঁচিতেও পারি। বাহিরের ভূতটা আমাকে আক্রমণ নাও করিতে পারে, আর যদি আক্রমণ করেও, তবে মা-মা বলিয়া ভূতটার সঙ্গে এক হাত লড়াই করিয়াই মরিব। আর এ যদি স্বয়ং মা কালীই আসিয়া থাকেন তবে তাঁহার চরণে লুটাইয়া যা কিছু বর চাহিয়া লইব।

মালকোছা দিয়া শক্ত করিয়া কাপড় পরিলাম। হাতে একটা লাঠি লইলাম। হারিকেনের বাতিটি আরও একটু উস্কাইয়া দিয়া দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলাম। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া বুকে সাহস সঞ্চয় করিয়া কম্পিত হস্তে ঘরের দরজা খুলিলাম। তারপর এক হাতে লণ্ঠন অপর হাতে বাঁশের লাঠিটি লইয়া বাহিরে আসিলাম। চারিদিকে জোছনা ফুট ফুট করিতেছে। সেই জোছনার আলোতে দেখিতে পাইলাম, হাজরা গাছটির সামনে সন্ন্যাসী ঠাকুর-কথিত সেই ব্রাহ্মণ কন্যাটি নদীর দিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছে। তখন আর আমার ভয় নাই। মনে মনে ভাবিলাম, মা মা বলিয়া এই মেয়েটির পায়ে লুটাইয়া পড়িব। সে হয়ত আমাকে কোন বর দিয়া যাইবে।

আমি উঠানের দরজা পার হইয়া সেই শেওড়া গাছটির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। নিকটে আসিয়া দেখি, সেখানে একটি গাছ। ভয়ের চোটে গাছটিকে দূর হইতে সেই ব্রাহ্মণ কন্যার মত দেখিয়াছিলাম। কিন্তু গাছটির কাছে আসিয়া আমাকে নিদারুণ ভয়ে পাইল। এটি গাছ না হইয়া যদি সেই ব্রাহ্মণ কন্যাটি হইত তবে আমি এত ভয় পাইতাম না। মনের কল্পনার এই দ্রুত পরিবর্তন আমার দেহে ও মনে নিদারুণ ভয়ের সঞ্চার করিল। কিন্তু পূর্ব-বিশ্বাস মত কিছুতেই আমি চীৎকার দিব না।

কাঁপিতে কাঁপিতে বাড়ির দিকে পা বাড়াইলাম। খোদা বক্সের বাড়ির সামনে দিয়া হালট। তারপরে ফাঁকা কয়েকটা জায়গা পার হইলেই বচন মোল্লার বাড়ি। সেখান হইতে ঘন কলাগাছের মধ্য দিয়া সরু পথ। সেই পথ, আমাদের বাড়ির উত্তর দিক দিয়া চলিয়া গিয়াছে। বাড়ি আসিলে আমাকে দেখিয়া মা কতই খুশী হইলেন। সেদিন চিতই পিঠা আর গুড়ের হালুয়া তৈরী হইয়াছিল। তাহা আমাকে খাইতে দিয়া মা বলিলেন, "তুই কোথায় যাস্, আর কোথায় থাকস্? তোর চিন্তায় আমার ঘুম আসে না।" আমাকে নানা রকম অত্যাচার ও পীড়ন করিয়া অভিভাবকেরা যখন দেখিলেন, কিছুতেই আমাকে শাসনে আনিতে পারিলেন না তখন তাহারা আমার ভবিষ্যৎ বিষয়ে এক রকম হাল ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। আমি কখন কোথায় থাকি, কি করি, কেহ আর কোন খোঁজ লইতেন না।

পরদিন সকালে শ্মশানে আসিয়া যথারীতি পূজা করিয়া বাহিরে আসিয়া বসিলাম। দেখিলাম আমারই বয়সের একটি বালক সন্ন্যাসীর বেশে শ্মশানের পথ দিয়া যাইতেছে। তাহাকে কাছে ডাকিয়া আনিয়া সমাদর করিয়া বসাইলাম। পূর্বদিনের সেই চৌর্য-উপার্জিত আমগুলির কয়েকটি পাকিয়াছিল। তাহা আনিয়া আমার এই সন্ন্যাসী বন্ধুকে খাইতে দিলাম। আর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা ভাই! তুমি এই অল্প বয়সে সন্ন্যাসী হইয়াছ কেন" ছেলেটি বলিল, "বাড়িতে বসিয়া ধর্মকাজ করিতে আমার বাপ-মা আমাকে বেদম প্রহার করেন।" আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা ভাই! তোমাকে আর কে কে মারে?" ছেলেটি বলিল, "আমার বড় ভাই-ই আমাকে সব চাইতে বেশী মারেন।"

এ যে আমারই কাহিনী। আমি ছেলেটির প্রতি আরও আকৃষ্ট হইলাম। আমি বলিলাম, "ভাই! আমি যদি তোমার মত সন্ন্যাসী হই, তুমি কি আমাকে সঙ্গে লইবে?"

ছেলেটি বলিল, বেশ ত! আমরা দুই বন্ধুতে একসঙ্গে দেশে দেশে ঘুরিব।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাই! তুমি এখন খাইবে কোথায়?" সে

বলিল, "আমি সন্ন্যাসী মানুষ, যে দিবে তাহারই বাড়িতে আহার করিব।"

আমি বলিলাম, "এই পথ দিয়া বরাবর চলিয়া যাও। তিনখানা বাড়ী পার হইলেই আমার পিতা আঞ্চার উদ্দীন মোল্লার বাড়ি। সেখানে যাইযা অপেক্ষা কর। আমি অল্প সময়ের মধ্যেই ঘর-দোব পরিস্কার করিয়া আসিতেছি।" বাজী হইযা ছেলেটি আমার নির্দিষ্ট পথে রওয়ানা হইল।

তাড়াতাড়ি আমার কাজগুলি সারিয়া বাড়ি আসিলাম। আসিযা দেখি আমার নির্দেশ মত ছেলেটি আমাদের বাড়ি আসে নাই। সমস্ত পাড়া তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম, কোথাও তাহার দেখা পাইলাম না। কত জনকে তাহার কথা জিজ্ঞাসা কবিলাম। কেহই তাহার কোন সন্ধ্যান দিতে পারিল না।

শহরে যাইয়া বাণীদিদিকে সমস্ত ঘটনা বলিলাম। বাণীদিদি বলিলেন, "ওই ছেলেটির রূপ ধরিয়াই মা কালী তোকে দেখা দিয়া গেলেন। আর তুই রাত্রে শ্মশানে থাকিস না। কি হয বলা ত যায় না। তবে একথা নিশ্চয় জানিস, তোর সরল বিশ্বাসে মা কালী একদিন না একদিন তোকে দেখা দিবেনই।"

ইহার পর প্রতিদিন শ্মশানে আসিয়া পথের দিকে চাহিযা থাকি। সেই ছেলেটি যদি আসে। এবার আসিলে দুই হাতে তার পা জড়াইয়া ধরিব। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল: সেই ছেলেটি আর ফিরিয়া আসিল না।

সন্ন্যাসী ঠাকুর চলিয়া যাওয়াব পর তাঁহার বাগানের এত যত্নের ফুল গাছগুলি শুকাইয়া যাইতে লাগিল। আমি ছেলে মানুষ। কত আর পানি ঢালিতে পারিব। সেই পানি আবাব আনিতে হইত বহু পথ পার হইয়া নদী হইতে। অযত্নে ঘরের বেড়াগুলি পড়িয়া যাইতে লাগিল। সন্ন্যাসী ঠাকুরের জন্য আমার মন আকুল হইয়া উঠিল। তিনি থাকিতে যে সব কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছিলাম তাহা আরও কঠোরতর করিয়া লইলাম।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন সন্ন্যাসী ঠাকুর ফিরিয়া আসিলেন। শ্মশানের

আশ্রম আবার ভক্ত-জন মুখর হইয়া পড়িল। আমার কাহিনী আনুপূর্বক শুনিয়া তাহাতে আরও রং চং লাগাইয়া তিনি তাঁহার ভক্ত-মণ্ডলীর মধ্যে প্রচার করিতে লাগিলেন। চারিদিকে আমার ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। আমি নিজেও বিশ্বাস করিতে লাগিলাম, সাধন পথে আমি অনেকটা অগ্রসর হইয়াছি।

হানিফ মোল্লার কথা ইতিপূর্বে বলিয়াছি। তাঁহার ছোট ভাই কাঙালী মোল্লা। সেও আমার সন্ন্যাসী ঠাকুরের ভক্ত ছিল; আমারই মত মাছ, মাংস, পেয়াজ, রসুন খাইত না। সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিতেন, কালী সাধনায় সে তাঁর শিষ্যদের ছাড়াইয়া গিয়াছে। আমি কিন্তু সন্ন্যাসী ঠাকুরকে কোনদিনই তাহাকে যোগ-সাধনা শিখাইতে দেখি নাই।

ইহার দশ বার বৎসর পরে একদিন এই কাঙালী মোল্লা গল্পে গল্পে বলিল, "তুমি যে রাত্রে শ্মশানঘাটে ছিলে, তোমার সাহস কতটা পরীক্ষা করিবার জন্য আমি গেটের দরজার নিশানের বাঁশ ঝাঁকাইয়াছিলাম, আর ঘরের বেড়ায় থাপ্পর মারিয়াছিলাম।"

তাকে বলিলাম, "তবে তুমি সামনে আসিয়া পরিচয় দিয়া আমার ভয় ভাঙ্গাইলে না কেন?"

সে উত্তর করিল, "এইভাবে তোমাকে ভয় দেখাইতে যাইয়া আমি নিজেও ভয় পাইয়া গেলাম। কি জানি তুমি যদি আমাকে হঠাৎ দেখিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যাও, তখন পাড়ায় মুখ দেখাইতে পারিতাম?"

আমি বলিলাম, "চাচা! তুমি খুবই অন্যায় কাজ করিয়াছিলে। আমার মত এতটুকু বয়সের একটি ছেলে যে এক রাত শ্মশানে একা বাস করিয়াছিল এই ত তার সাহসের কত বড় পরিচয়। আবার তাহাকে ভয় দেখাইতে গিয়াছিলে কেন? আমি যদি তখন চীৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়া পরিতাম?"

চাচা বলিল, "ভাজতে! তুমি আমাকে মাপ করিয়া দাও।"

ইহার আরও কিছুকাল পরে ফরিদপুরের কাছারীতে একদিন আমার সেই বালক-সন্ন্যাসী বন্ধুকে ভিক্ষা করিতে দেখিলাম। জেরা করিয়া

জানিলাম যে, সে সত্য সত্যই ভিখারী। ছদ্মবেশী মা কালী নয়। তখন অপর লোকের প্রভাবে পড়িয়া এইসব অতি-ভৌতিক ব্যাপারে বিশ্বাস হারাইয়াছি। সে কথা পরে বলিব। সুতরাং সেই বালক সন্ন্যাসী ছদ্মবেশী কালী ঠাকুরুণ নন সেজন্য আমার মনে কোন দুঃখই হইল না।

খুব ধরিয়া পড়িলে সন্ন্যাসী ঠাকুর অসুখ-বিসুখে রোগীদিগকে নানা গাছ-গাছড়ার ঔষধ বলিয়া দিতেন। তাঁহার নিকট হাতের লেখা একখানা খাতা ছিল। তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনে নানা পথে নানা লোকের কাছে যে সব ঔষধের কথা শুনিয়াছেন, তাহার যেগুলি ফলপ্রদ হইত সেগুলি তিনি সেই খাতায় লিখিয়া রাখিতেন। এগুলি তাঁহার নিজেরও প্রয়োজনে লাগিত। পাহাড়-পর্বতে ঘুরিতে অসুখ হইলে ডাক্তার কবিরাজ পাওয়া যায় না। তখন নিজের চিকিৎসা নিজেকেই করিতে হয়। এই জন্য গুরু পরম্পরায় সন্ন্যাসীরা বহু ঔষধের গাছ-গাছড়ার খবর জানেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর তাঁর খাতাখানা দেখিয়া মাঝে মাঝে সমবেত রোগীদের দু'একটি ঔষধ দিতেন। অম্লশূলের একটি ঔষধের কথা আমার মনে আছে। আবীর, যোয়ানের গুঁড়ো, খাই-সোডা সমপরিমাণে লইয়া কলা গাছের খোলার রস তাহাতে মিশাইয়া রৌদ্রে দিতে হইবে। শুখাইলে আবার কলার খোলার রস দিয়া রৌদ্রে শুখাইয়া কড়ির চাইতে ছোট ছোট বড়ি তৈরী করিতে হইবে। এই বড়ি আহারের পর, ও শয়নের আগে নিয়মিত খাইলে অম্বলের ব্যথা সারে। হাঁপানি আমাশয়, কাশি প্রভৃতি নানা রোগের আরও অনেক ঔষধ তিনি জানিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সেই ঔষধের খাতাখানা কাহার হাতে পড়িয়াছে, জানি না। সেই খাতাখানায় তাঁহার সারা জীবনের অভিজ্ঞতা-ভরা ঔষধপত্র লেখা ছিল।

আমার ছোট ভাই নূরুদ্দীন যখন দুই-তিন মাসের, তখন তাহার খুব অসুখ হয়, পেট ফাঁপিয়া ঢোল হইয়া ওঠে। ডাক্তার বলিয়াছিলেন, তাহার আর বাঁচিবার আশা নাই। এই ভাইটিকে আমি বড়ই ভালবাসিতাম। সন্ন্যাসী ঠাকুরকে বলিলাম, "আপনি আসিয়া আমার ভাইটিকে দেখিয়া যান।" তিনি আসিয়া আমার ভাইটিকে দেখিয়া

কি সব মন্ত্র পড়িয়া ফুঁ দিলেন। আমার পিতাকে বলিলেন, "এ ছেলে মরিবে না, বাঁচিবে।" সত্য সত্যই আমার ভাই সারিয়া উঠিল।

তিনি ভাল হস্ত-রেখা পড়িতে পারিতেন। আমার হাত দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, বয়সকালে আমি খুব বড় একটা কিছু হইব। তাঁহার মত সাধু হইব, ইহাই হয়ত তাঁহার আশা ছিল। সাধু হইবার জন্য কতই না তপস্যা ও কৃচ্ছ্র সাধনা করিয়াছি। কিন্তু ভবিতব্যকে কে খণ্ডাইতে পারে? সাধু না হইয়া আমি হইলাম কবি। তাঁহার উপদেশ ছিল কোন স্ত্রীলোকের মুখের দিকে চাহিবে না। কোন সুন্দরী মেয়ের কথা ভাবিবে না। কোন মেয়েকে দেখিলে আমি তার মুখের দিকে চাহিতাম না। কিন্তু এক নজর দেখিয়াই তাহার চেহারা আমার মনে অঙ্কিত হইয়া যাইত। আমি যখন ধ্যানে বসিতাম এই চেহারাগুলি যতই না-ভাবিতে চেষ্টা করিতাম ততই তাহারা আমার ধ্যানের কালো পর্দায় আসা-যাওয়া করিত।

আমাদের শ্মশানঘাট ছাড়িয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর ফরিদপুর শহরে চৌধুরীবাড়ির কালী-তলার কাছে একটি পুরাতন বাসায় আসিয়া আশ্রয় লইলেন।

এতদিন সন্ন্যাসী ঠাকুর আমাদের গ্রামে ছিলেন বলিয়া যখন-তখন তাঁহার সঙ্গে আসিয়া দেখা করিতাম। স্কুলের পড়া নিয়মিত না করিলেও প্রতিদিন স্কুলে যাইতাম এবং পরীক্ষায় পাশও করিতাম। ছুটির সময় মাত্র তাঁহার ওখানে যাইয়া সারাদিন কাটাইতাম।

নতুন আশ্রমে আসার পর আমি সব সময় সন্ন্যাসী ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিতে পারিতাম না। একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে আমি তিনচার দিন আশ্রমে কাটাইলাম। আমার পিতা এখানে আসিয়া আমাকে খুঁজিয়া পাইলেন। এখান হইতে আমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবার সময় সন্ন্যাসী ঠাকুরকে বহু অনুযোগ দিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "আপনার ছেলে আমার এখানে আসিয়া কোন খারাপ শিক্ষা পাইতেছে না। স্কুলেও সে রীতিমত যায়। আমার এখানে আসা যদি আপনি পছন্দ না করেন, তবে আপনার ছেলেকে ঘরে ধরিয়া রাখিবেন। আমাকে বকিতেছেন কেন?"

ইহার কয়েকদিন পরেই আবার সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে রীতিমত যাওয়া-আসা করিতে লাগিলাম। যোগেশ নাম করিয়া একটি যুবক, সন্ন্যাসী ঠাকুরের ভক্ত হইয়াছিল। সে সেটেলমেণ্ট অফিসে চাকুরি করিত। একদিন সে আর আমি সন্ন্যাসীর আশ্রম হইতে দূরে একটি বট-গাছ তলায় ধ্যান করিতে গেলাম। কিছুক্ষণ ধ্যান করিয়া আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। সকালে উঠিয়া দেখি যোগেশ নদীর ধারে যাইয়া লাফ পাড়িতেছে। সেইদিন হইতে যোগেশ পাগল হইল। সকলেরই ধারণা হইল, সেই বট গাছের তলায় বসিয়া ধ্যান করার জন্যই যোগেশ পাগল হইয়াছিল। আমি যদি ঘুমাইয়া না পড়িয়া তাহার মতই ধ্যান করিতাম তবে আমিও পাগল হইতাম। পরে জানিতে পারিয়াছিলাম উজ্জলা নামে একটি মেয়েকে যোগেশ ভালবাসিত। সেই মেয়ের অন্যত্র বিবাহ হওয়ায় যোগেশ পাগল হইয়াছিল। পাগলামীর ঘোরে সে মাঝে মাঝে উজ্জ্বলা, উজ্জ্বলা বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিত।

একবার রাণীদিদি সন্ন্যাসী ঠাকুরের জন্য নিজের হাতে তৈরী করিয়া ভাল ভাল কিছু খাবার পাঠাইয়াছিলেন। যে ঘরে মিষ্টির থালা ছিল, আমি সেই ঘরে ঝাঁট দিতেছিলাম। হঠাৎ সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "তোমার ঝাঁটার ছোঁয়া ওই মিষ্টিব থালায় লাগিয়াছে।" আমি যত বলি, না লাগে নাই, তিনি তত বলেন, "লাগিয়াছে, আমি নিজের চক্ষে দেখিয়াছি। এই মিষ্টি তোমাকেই খাইতে হইবে।"

দঃখে অনুশোচনায় আমাব অন্তর ভরিয়া উঠিল। কত আগ্রহ করিয়া রাণীদিদি সন্ন্যাসী ঠাকুরের জন্য এই সব খাবার পাঠাইয়াছেন। আমি ছুঁইয়া দিয়া কত বড় অপরাধ করিয়াছি। আবার সেইগুলি যদি আমি খাই তবে বাণীদিদি কি মনে করিবেন? সন্ধ্যা বেলায় জলধর দাদা সমস্ত শুনিয়া আমাকে সেই মিষ্টি খাইতে বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুরের তেমন ছোঁয়া-ছুঁয়ীর বাছ বিচার ছিল না। কতবার তিনি আমার ছোঁয়া খাবার খাইয়াছেন। বিহারীদার বাসা হইতে মুসলমান পিয়ন যখন খাবার আনিয়া দিত তাহাও তিনি খাইয়াছেন। আমার ত মনে হয় না আমি এই মিষ্টির থালায় ঝাঁটার আঘাত করিয়াছি। এ সব কথা সন্ন্যাসী ঠাকুরকে বলিলাম। তিনি উত্তর

করিলেন, "আমি তোমার গুরু। আমার আদেশ তোমাকে পালন করা উচিত। তুমি এই মিষ্টি খাও। তোমার কল্যাণ হইবে। আর যদি আমার আদেশ পালন না কর তোমার ক্ষতি হইবে।"

সুতরাং সেই মিষ্টি খাইতে বসিলাম। নারকেলের পুর দেওয়া পুলী-পিঠা, খাঁটি ঘিয়ের ভাজা সরপুরী. সন্দেশ, পানতোয়া। প্রথমে দু'একটা যখন মুখে দিলাম তাহারা যেন গলার ভিতরে কঠিন পদক্ষেপ করিয়া আমার অনুশোচনাকে আরও বাড়াইয়া তুলিল। কিন্তু সেই খাঁটি ঘিয়ের খাবার পুনরায় মুখে দিতেই স্বাদে সুগন্ধীতে মুহূর্তের মধ্যে আমার সমস্ত অনুশোচনা কোথায় উড়াইয়া দিল। আমার খাওয়া শেষ হইলে সন্ন্যাসী ঠাকুর জলধর দাদাকে বলিলেন, "আমার শরীরটা আজ ভাল নাই। কিছুই খাইব না। ওই ছেলেটি আজ সারাদিন খায় নাই। তাই ফাঁকি দিয়া ওকে খাবারগুলি খাওয়াইলাম।"

পরদিন রাণীদিদির সঙ্গে দেখা করিয়া বলিলাম "দিদি! সন্ন্যাসী ঠাকুর কেমন ফাঁকি দিয়া খাবারগুলি আমাকে দিয়া খাওয়াইয়াছেন। আপনি না জানি কি মনে করিয়াছেন।"

অতি স্নেহের হাসি হাসিয়া রাণীদিদি বলিলেন, "তুমি যে আমার ভাই। তুমি আমার তৈরী মিষ্টিগুলি খাইয়াছ এজন্য আমি কম-খুশী হই নাই।"

দিদির এই আন্তরিকতাপূর্ণ উত্তর শুনিয়া আমার মন হইতে সমস্ত গ্লানি চলিয়া গেল।

সন্ন্যাসী ঠাকুর এখানে থাকিতে প্রায়ই আমি তাঁহার থালা-বাটি মাজিয়া দিতে নদীর ঘাটে যাইতাম। সেই ঘাটে বারবনিতারা স্নান করিতে আসিত। একদিনের ঘটনা মনে পড়িতেছে। কয়েকটি মেয়ে তাহাদের ঘরের পুরুষদের বিষয়ে আলোচনা করিতেছিল। সেই আলোচনা কখনও কখনও শ্লীলতাকে অতিক্রম করিতেছিল। তাহা শুনিয়া আমার খুব খারাপ লাগিতেছিল। কিন্তু থালাবাটিগুলি মাজিতে কিছু সময় লাগিবে। সেগুলি ফেলিয়াও যাইতে পারি না। তাই অতি বিনীত ভাবে বলিলাম, "মা জননীরা। আমি ছোট ছেলে। আমার সামনে আপনারা এমন আলোচনা করিবেন না।"

একটি মেয়ে আমার কথা শুনিয়া বলিল, "আরে ছোকরা! আমাদের আলোচনা আজ তোমার ভাল লাগিতেছে না। এমন একদিন আসিবে, যখন মেয়েদের আঁচলের বাতাস পাইবার জন্য পাগল হইয়া তাহাদের পাছে পাছে ঘুরিবে।" সেই মেয়েটির ভবিষ্যত-বাণী কি আমার জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছিল? হয়ত সকল পুরুষের জীবনেই তাহা প্রতিফলিত হইয়া থাকে।

সুহৃদদার বাড়ির নিকটের আস্তানা গোটাইয়া পরে সন্ন্যাসী ঠাকুর জলধরদার বাড়ির নিকটে আসেন। সেখান হইতে নানা জায়গা ঘুরিয়া তিনি কুমারখালির নদীর ধারে কালী-বাড়িতে যাইয়া আশ্রয় লন।

আমি সেবার বি, এ পরীক্ষা দিয়া কুমারখালি যাইয়া সন্ন্যাসী ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিলাম। ইতিমধ্যে তাহার একমাত্র ছেলে শ্রীশদার মৃত্যু হইয়াছে। যাইয়া দেখিলাম তাঁহার প্রায়ই ম্যালেরিয়া জ্বর হয়। ইহার উপর এই নিদারুণ পুত্রশোক। রোগে-শোকে তিনি অস্থিচর্মসার হইয়াছেন। এখানে বড় একটা কেহ তাঁহাকে দেখিতে আসে না। মন্ত্র-শিষ্যেরা মাঝে মাঝে যা দু'চার টাকা ডাকযোগে পাঠায় তাই দিয়া তিনি কোন মতে আহারের সংস্থান করেন। এক বৃদ্ধা মহিলা, আমাদের কৃতান্ত দিদি তাঁহার দেখাশুনা করেন।

এই যে সামান্য অর্থের সংসার তাহা সত্ত্বেও সন্ন্যাসী ঠাকুর প্রায় সের দেড়েকের মত চাউলের ভাত রাঁধাইয়া প্রতিদিন শিবা-ভোগ দিতেন। সামনের বনের মধ্যে ভাতগুলি রাখিয়া তিনি আয় আয় করিয়া ডাক দিতেন। দশ বারটা শেয়াল আসিয়া সেই ভাতগুলি খাইয়া যাইত। মনে মনে ভাবিলাম, মানুষের অকৃতজ্ঞতায় আর ছলনায় বিতৃষ্ণ হইয়া আজ বনের পশুদের সঙ্গে তিনি হয়ত মিতালী পাতাইতে চেষ্টা করিতেছেন।

বিদায়ের সময় কৃতান্ত দিদি বলিলেন, "বাবা চাপলে মাছ আর ফেঁসা মাছ খাইতে ভালবাসেন। এদেশে ওসব মাছ পাওয়া যায় না। তুমি আবার যখন আসিবে বাবার জন্য কিছু মাছ লইয়া আসিও।"

এখন আমার কালী-মাতা এবং অন্যান্য দেব-দেবীর উপর বিশ্বাস

নাই। গুরুবাদেও বিশ্বাস করি না। কিন্তু আমার বাল্য-জীবন হইতে এ পর্যন্ত সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে যে স্নেহ-মমতা পাইয়াছি সেজন্য তাঁহার প্রতি আমার মনে যে ভালবাসা ও শ্রদ্ধার ভাব গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার এক বিন্দুও ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

দেশে আসিয়া কয়েকদিন পরেই কিছু চাপলে মাছ ও ফেঁসা মাছ কিনিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুরের আশ্রমে আসিলাম। মাছগুলি দেখিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, "তোমার ভিতর দিয়া আমার শ্রীশকে আবার ফিরিয়া পাইলাম।" আমারও চোখ বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। আহারে! এই সন্ন্যাসী ঠাকুর একদিন কত বড় ঐশ্বর্যের সংসার পদাঘাতে ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন। আমাদের শ্মশান ঘাটের আশ্রমে কত বড় বড় লোকের খাদ্য-সম্ভার তিনি ফিরাইয়া দিতেন। আজ সেই তিনি সামান্য কয়টি মাছ পাইয়া এতটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন!

মাছগুলি কিছুটা পচিয়া গিয়াছিল। কৃতান্ত দিদি তাহাই অতি যত্নের সঙ্গে কুটিয়া কিছু ভাজিয়া কিছু ঝোল করিয়া চার পাঁচ রকমের পদ করিয়া রান্না করিলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর অতি তৃপ্তির সঙ্গে আহার করিলেন।

তখন আমার কিছু কবি-খ্যাতি হইয়াছে। প্রবাসী হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েকখানা পত্রিকায় আমার কিছু কিছু কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। সন্ধ্যা বেলায় আমার কয়েকটি কবিতা তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইলাম। আমার কৃতিত্ব যেন তাঁর নিজেরই। শুনিয়া তিনি বড়ই খুশী হইলেন। বারবার করিয়া আমাকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। তিনি আরও বলিলেন, "আমি ত আগেই তোমার হাত দেখিয়া ভবিষ্যত-বাণী করিয়াছিলাম, এক কালে তুমি খুব বড় হইবে। সাধু না হইয়া কবি হইলে, এই বা মন্দ কি!" তারপর তিনি তাঁহার কাগজ-পত্র খুঁজিয়া তাঁহার রচিত কয়েকটি গান আমাকে শুনাইলেন। সেই গানগুলি রাম-প্রসাদী গানের মত বাৎসল্য রসে আপ্লুত নয়। কালীমাতা তাঁহার নিকটে নায়িকা। গানগুলি আমার খুব ভাল লাগিল। কয়েকটি গানে দুঃখ জয়ের আকুতি ছিল।

যত দুঃখ পাইলাম সেই দুঃখের তীর দিয়াই
জগতের শাশত কালের দুঃখকে জয় করিব।
মা কালী! তোর গলার মুণ্ডমালা খুলিয়া ফেল
আমি দুঃখের মালা পরাইয়া দেখিব
তোকে কেমন দেখায়।

দুই তিন দিন সন্ন্যাসী ঠাকুরের আশ্রমে কাটাইয়া ফিরিয়া আসিলাম। বিদায়ের দিন তিনি বলিলেন, "আমার খবর লইও। যদি বাঁচিয়া না থাকি আমার কথা মনে রাখিও।"

ইহার পরে আর সন্ন্যাসী ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হয় নাই। তিনি আমাকে তাঁর খবর লইতে বলিয়াছিলেন। সেই খবরও আমি লইতে পারি নাই। সন্ন্যাসী ঠাকুর কিছুদিন পরে ফরিদপুর জেলার বাহিরবাগ নামক স্থানে চলিয়া যান। সেখানে যাইতে হইলে প্রায় তিরিশ মাইল পথ হাঁটিয়া যাইতে হয়।

একবার খবর পাইলাম সন্ন্যাসী ঠাকুর দেহত্যাগ করিয়াছেন। আমার বালক-কালের এত বড় সহানুধ্যায়ীর এইভাবে জীবন-নাট্যের অবসান হইল। কৃতান্ত দিদির মুখে শুনিয়াছি শেষ জীবনে তিনি বড়ই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। একদিন তিনি দিদিকে বলিলেন, "আজ আমার যাইবার সময় হইয়াছে। শীঘ্র আমাকে আসন করিয়া বসাইয়া দাও।" কৃতান্ত দিদি দুই তিনটি বালিশ পেছনে দিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুরকে বসাইয়া দিলেন। তিনি আসনে বসিয়া নানা রকম যোগ-সাধনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার দেহ মাঝে মাঝে শূন্য হইয়া উপরে উঠিতেছিল। তারপর তিনি মাটিতে নামিয়া আসিয়া কি যেন মন্ত্র পাঠ করিলেন। তারপর চির নীরব হইয়া গেলেন। মাথায় হাত দিয়া দেখিলাম ব্রহ্মরন্ধ্র ফাটা। গ্রামের সব লোক ডাকিয়া আনিয়া বাবাকে সেইখানে সমাধিস্থ করিলাম।"

এই কাহিনীর কতকটা সত্য আর কতকটা ভক্ত-হৃদয়ের কল্পনায় মিশিয়া আছে।

কৃতান্ত দিদি বাঁচিয়া থাকিতে মাঝে মাঝে আমাকে দেখিতে আমাদের বাড়িতে আসিতেন। যেবারই আসিয়াছেন আমি তাঁহাকেই পায়ের

বাবৎ যৎকিঞ্চিত সাহায্য করিয়াছি। ভাইবোনে বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা সন্ন্যাসী ঠাকুরের জীবন-কাহিনী লইয়া আলোচনা করিয়াছি। সেবার শুনিলাম, কৃতান্ত দিদিও দেহত্যাগ করিয়াছেন।

সন্ন্যাসী ঠাকুরের এই সুদীর্ঘ কাহিনী শুনিয়া কার কি উপকার হইবে জানি না। তিনি যে পথের পথিক ছিলেন এখন আমি সে পথের পথিক নই। তাঁহার দেবতা ও সাধন-প্রণালীতেও আজ আমার আস্থা নাই। তাঁহার সঙ্গ পাইয়া আমার প্রথম জীবনের যে দিনগুলি কাটিয়াছিল সেই কৃচ্ছ্র-সাধনা, অভিভাবকদের অত্যাচার হাসিমুখে উড়াইয়া দেওয়া, ইহা আমার জীবনের কোন কাজে আসিয়াছে কিনা আজ ভাল করিয়া নির্ণয় করিতে পারি না। তবে অভিজ্ঞতার মূল্য আছে। শৈশব কালের সেই কৃচ্ছ্র সাধনা অনাগত জীবনে পৃথিবীর বহু প্রলোভন হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছে।

কোন কিছু ত্যাগ করিতে আজ আমাকে অপরের মত বেগ পাইতে হয় না। তাহা ছাড়া ছোট বেলায় হিন্দু সমাজের দেব-দেবী ও সাধন-প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম, তাহা আমার কাব্য-সৃষ্টিতে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। এ দেশের সাহিত্য শুধুমাত্র হিন্দুর সাহিত্য হইবে না, পৃথক করিয়া মুসলমানের সাহিত্যও হইবে না। হিন্দু মুসলমান এক ভাষায় কথা বলে বলিয়া এ দেশের সাহিত্য হইবে হিন্দু-মুসলমানের সাহিত্য। যাঁহারা পৃথক করিয়া সাহিত্য রচনা করিবেন তাঁহারা বেশী দিন টিকিবেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ সাহিত্যের যে সার্বজনীনতা জগতকে আকর্ষণ করে সেই স্থানে কোন সাম্প্রদায়ীক মনোবৃত্তি প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। আমার সাহিত্য সৃষ্টিতে এই সার্বজনীনতা যদি কিছু ঘটিয়া থাকে তাহা এই সন্ন্যাসী ঠাকুরেরই দান।

আমি যখন কলিকাতায় এম. এ পড়িতে আসিলাম তখন খবর পাইলাম রাণীদিদিরা ফরিদপুরের বাস উঠাইয়া কালীঘাটে আসিয়া রহিয়াছেন। ঠিকানা লইয়া একদিন রাণীদিদিকে দেখিতে গেলাম। আমার সেই স্নেহময়ী রাণীদিদি। বালক-কালের কল্পনা লইয়া এই দিদিটিকে কতই না আপনার জন ভাবিতাম। তাঁর কাছে যে স্নেহ-

মমতা পাইয়াছি, তাহা আমার শিশু-জীবনকে কত ভাবেই না আকৃষ্ট করিয়া তুলিত। অনেক খোঁজাখুঁজির পর রাণীদিদির বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বাসা ত নয় একখানা মাত্র ঘর। সেই ঘরে যেন একটি দেবী-প্রতিমা বসিয়া আছেন। মুখের শ্রীতে আবছা মলিনতার দাগ পড়িয়াছে। কিন্তু সেই হাসিটি আগের মতই আছে। ঘরের মধ্যে রাণীদিদির পূজার ঠাকুর। কলসীতে জল। কোথায় আমাকে বসিতে দিবেন। ঘরের সামনে শান বাঁধান সামান্য একটু জায়গা। সেখানেই একটি মাদুর পাতিয়া আমাকে বসিতে বলিলেন। বসিয়া বসিয়া রাণীদিদির সঙ্গে আবার সেই সন্ন্যাসী ঠাকুরের গল্প। মত পরিবর্তন করিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুরের সকল শিক্ষা-দীক্ষা ছাড়িয়াছি। কিন্তু রাণীদিদি আর তাঁর স্বামী তাঁহার সব কিছু শিক্ষা-দীক্ষা আজও নিজেদের জীবনে প্রতিদিনের কাজে জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছেন। এ-কথা সে-কথার পরে তাঁহাদের বর্তমান অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। দাদা আলিপুরের কোর্টে যাইয়া বসিয়া থাকেন। কোন মামলায় আসামীর জামিনের প্রয়োজন হইলে দাদা তাহার হইয়া জামিন-নামায় দস্তখত করেন। ইহাতে যা সামান্য আয় হয় তাহাতে ভাল করিয়া সংসার চলে না। ফরিদপুরে থাকিতে রাণীদিদিদের সংসারে কোন অভাব ছিল না। কেন তাঁহারা দেশ ছাড়িয়া এই বান্ধবহীন শহরে এত অনাটনের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন কিছুতেই ভাবিয়া পাইলাম না।

কথা বলিতে বলিতে জলধর দাদা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্প্রতি দাদার জামিন নেওয়া একটি আসামী কোর্টে হাজির হয় নাই। কোর্ট দাদার কাছে জামিনের টাকা তলব করিয়াছেন।

দাদা বলিলেন, ভাইটি! রাগ করিও না। তোমাদের মুসলমান জাতিটিই খারাপ। এই কোর্টের হাকিম মুসলমান। আরও তিন বার এইরূপ তিনজন আসামী কোর্টে হাজির হয় নাই। সেই তিন বার সে আমাকে মাফ করিয়াছে। কিন্তু এবার এত অনুনয়-বিনয় করিলাম, বেটা কিছুতেই আমাকে জামিনের টাকা হইতে মুক্তি দিল না। দেখ ত! তুমি নি তোমার জাত-ভাইকে বলিয়া কহিয়া এবারের মত আমাকে মাফ দেওয়াইতে পার? নহিলে আমাকে জেলে যাইতে হইবে।"

মনে মনে ভাবিলাম, তিনবার যে মুসলমান হাকিমটি দাদাকে এই ভাবে মাফ করিয়াছেন, এবার মাপ না করায় তিনি ত খারাপই, সেই সঙ্গে তাঁহার মুসলমান জাতও দাদার কাছে খারাপ বলিয়া মনে হইতেছে। অত্যাধিক দারিদ্র্য মানুষের মনকে যে কত সংকীর্ণ করিয়া দেয় দাদার এই উক্তিটি তাহার প্রমাণ। তখন আমার মন কিছুটা মুসলিম লীগ ভাবাপন্ন। তবু দাদার এই কথার কোনই প্রতিবাদ করিলাম না। প্রতিবাদ করিলেই বা কি হইবে? এত বয়সে দাদার মতের কি পরিবর্তন করাইতে পারিব? দাদার কাছে এক সময়ে যে স্নেহ-মমতা পাইয়াছি তাহার বিনিময়ে দাদার এই সমালোচনটুকুও হজম করিলাম। আমার যতদূর মনে পড়ে, সেই মুসলমান হাকিমকে বলিয়া কহিয়া সেবারের মতও দাদাকে জামিনের টাকা হইতে রেহাই দেওয়াইয়াছিলাম। তখন দাদা সেই হাকিমের প্রতি এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার মত পরিবর্তন করিয়াছিলেন।

কলিকাতা আসিয়া রাণীদিদির একটি ছেলে হইয়াছে। বার তের বৎসর বয়স। ছেলেটি স্কুলে যায়। কিছু কিছু কবিতাও লেখে। আমি তাহাকে খুব উৎসাহ দিলাম।

ইহার পরে কোন কোন রবিবারে আমি নিকটস্থ বাজার হইতে ভালমত মাছ-তরকারী কিনিয়া রাণীদিদির অতিথি হইতাম। হাতে করিয়া কিছু দিতে গেলে হয়ত লইবেন না। তাই বাজার করিবার এই কৌশল। আমার আনা মাছ-তরকারী পরিপাটী করিয়া রাঁধিয়া রাণীদিদি আমাকে খাওয়াইতেন। হোষ্টেলের একঘেয়ে খাবার হইতে মাঝে মাঝে রাণীদিদির বাসায় যাইয়া গৃহ-সুখের আস্বাদ পাইতাম।

ইহার কিছু দিন পরে দাদা মারা গেলে রাণীদিদিরা এই বাসা ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যান। অনেক চেষ্টা করিয়াও আর রাণীদিদিদের ঠিকানা পাই নাই। শুনিয়াছি পিতার মৃত্যুর পর রাণীদিদির ছেলে অল্প বয়সে পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া কোন ইলেকট্রিক অফিসে সামান্য বেতনে চাকুরি লয়।

সন্ন্যাসী ঠাকুর ও তাঁর ভক্তমণ্ডলীর কাহিনী এখানেই শেষ করিলাম। কিন্তু যে চরিত্রগুলি আমার জীবনের রঙ্গমঞ্চে নিয়ত যাওয়া-

আশা করিতেছে তাহাদের কাহিনী কি শেষ হইতে পারে? আজও আপদে-বিপদে সেই সন্ন্যাসী ঠাকুরের সৌম্য মূর্তিখানি ভাবিতে আমার বেশ ভাল লাগে। অনেক সময় ধ্যান-নয়নে দেখিতে পাই, সুদূর বন্ধুর হিমালয়ের পথ—সেই বদরিনারায়ণ—লছমন ঝোলা পার হইয়া আজানুলম্বিত-বাহু গৌরমূর্তি এক সন্ন্যাসী ঠাকুর হাঁটিয়া চলিয়াছেন মানস-সরোবরের পথে। সেই রাণীদিদি, তার দুইজন অল্প বয়সী জা আর আমার বৌদিদি সুহৃদদার স্ত্রী এরাও যেন সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছেন।

অধ্যাপক এস, সি, সেন

ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে আসিলেন এক জার্মান ফেরত প্রফেসর। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের লোক। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা লোকের মুখে মুখে। এমন পণ্ডিত ব্যক্তির সঙ্গে যদি পরিচয় করিতে পারিতাম! কিন্তু কি করিয়া পরিচিত হইব ভাবিয়া কুল পাই না। একদিন তিনি স্থানীয় ব্রাহ্ম-মন্দিরে বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতাটি আমার খুব ভাল লাগিল। আমি যথাসম্ভব তাঁর ভাষার অনুকরণ করিয়া বক্তৃতাটির অনুলিখন তৈরী করিলাম। তারপর একদিন তার বাসায় যাইয়া লেখাটি তাঁহাকে দেখাইলাম। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতার সবকিছু আমার পক্ষে লেখা সম্ভবপর ছিল না। তখন আমি নবম শ্রেণীর ছাত্র। কিন্তু তাঁর বক্তৃতা যে আমাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল ইহাতে তিনি বড়ই খুশী হইলেন। আমার লেখাটি তিনি আদ্যপান্ত পড়িয়া যে যে স্থানে আমার শ্রুতি-লিখনে ভুল হইয়াছিল তাহা সংশোধনের নির্দেশ দিলেন। এই উপলক্ষ্যে দুই তিন দিন তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার সুযোগ পাইলাম। একদিন তাঁহাকে আমার কবিতার খাতাখানি দেখাইলাম। তিনি কবিতা পড়িয়া বড়ই খুশী হইলেন। তাঁহার বন্ধু-বান্ধবের সামনেও আমার দুই একটি কবিতা নিজে আবৃত্তি করিয়া শোনাইলেন। এখন হইতে আমি নূতন কোন কবিতা লিখিয়াই তাঁহাকে দেখাইতে লাগিলাম।

মাঝে মাঝে তিনি আমার সঙ্গে নানা রকম ধর্ম্মমত লইয়া আলাপ করিতেন। আমি তখনও সন্ন্যাসী ঠাকুরের প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই। কালী, দুর্গা, শিব প্রভৃতি সকল হিন্দু দেব-দেবীর প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাস। তিনি যখন কথা বলিতে বলিতে আমার এই সকল অন্ধবিশ্বাসের উপর খড়্গাঘাত করিতেন, আমি বড়ই ব্যথা পাইতাম। প্রাণপণে তাঁহার যুক্তির প্রতিবাদ করিতাম। কিন্তু বাড়ি আসিয়া তাঁহার যুক্তিগুলি আমাকে পাইয়া বসিত। তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়ায় শহরের কয়েকজন ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হইল। তাঁহারা আমাকে ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে প্রকাশিত বইগুলি পড়িতে দিতেন। এইভাবে কেশব সেনের জীবনী, রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী, অজিত কুমার চক্রবর্ত্তীর মহর্ষী দেবেন্দ্র নাথের জীবনী, জগদীশ বাবুর গৌরাঙ্গ লীলামৃত, গিরিশ বসুর তাপসমালা, কেশব সেনের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা প্রভৃতি পুস্তকগুলি পড়িয়া ফেলিলাম।

আমার মন হইতে ধীরে ধীরে হিন্দু দেব-দেবী অন্তর্হিত হইতে লাগিল। মিঃ সেন আমাকে সঙ্গে লইয়া মাঝে মাঝে নির্জন স্থানে বেড়াইতে যাইতেন। সেখানে বসিয়া তিনি প্রার্থনা করিতেন। আমি তাঁর সেই প্রার্থনায় যোগ দিতাম।

স্থানীয় ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য শশীভূষণ মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে আমার আগেই পরিচয় হইয়াছিল। পূর্বে আমার কবিতায় অসমান-মিল থাকিত। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের কবিতায় যুক্তবর্ণকে আমি এক অক্ষর ধরিতাম। সেই জন্য আমার কবিতা কোন মাসিক পত্রে ছাপা হইত না। শশীবাবু আমার কবিতার খাতাখানি পড়িয়া এই বিষয়ে আমার ভুলগুলি ধরাইয়া দিলেন। তাঁহার নির্দেশ অনুসারে নূতন কবিতা লিখিয়া আনিয়া তাঁহাকে দেখাইতাম। তিনি নিজে কবি ছিলেন না। কিন্তু কবিতার সুক্ষাতিসুক্ষ্ম ছন্দের ত্রুটি তিনি ধরিয়া দিতে পারিতেন। ইহার পরে আমার একটি কবিতা প্রবাসীতে ছাপা হইল। প্রবাসীর পাতা উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে তিনি বলিলেন, "প্রবাসী যখন তোমার কবিতা ছাপাইয়াছে এখন হইতে তুমি কবি বলিয়া স্বীকৃতি পাইলে।"

শশীবাবুর স্ত্রী নির্মলাদি ভাল গান গাহিতে পারিতেন। সেকালে ভদ্র-

সমাজের মেয়েরা তেমন গান বাজনায় যোগ দেয় নাই। আমরা ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনায় যাইতাম নির্মলাদির গান শুনিতে। উপাসনার ফাঁকে ফাঁকে নির্মলাদি রবীন্দ্রনাথের সন্ত-রচিত ধর্ম-সঙ্গীতগুলি গাহিতেন। বার বার শশীবাবুকে কবিতা দেখাইতে যাইয়া নির্মলা দিদির সঙ্গেও পরিচয় হইল। তিনি আমাকে বড়ই স্নেহ করিতেন। শশীবাবু নবম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করিয়াছেন কিন্তু ইংরেজীতে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। সেই জন্য সাহেবরা তাঁহাকে বড়ই পছন্দ করিতেন, সামান্য কেরানীর কাজ হইতে উন্নতি করিয়া তিনি সেরেস্তাদার পর্যন্ত হইয়াছিলেন। তিনি সর্বদা ইংরেজদের মত পোষাক পরিতে ভালবাসিতেন। প্রতিদিন Statesman পত্রিকা পড়িতেন। Statcman-এ বিজ্ঞাপন পড়িয়া কলিকাতার White way laid law-র বাড়ি হইতে মাঝে মাঝে তিনি এটা-ওটা কিনিয়া আনাইতেন। সেই সব পার্শেল তিনি খুব গৌরবের সঙ্গে খুলিতেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ও তিনি বিলাতী বস্ত্র বর্জন করেন নাই। তাঁহাকে যদি কেহ সাহেব বলিত তিনি গৌরব বোধ করিতেন। নির্মলাদির একটি বোন মাঝে মাঝে আসিয়া কিছুদিন তাঁহার সঙ্গে থাকিত। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের মেয়েটি। পাতলা ছিপছিপে একহারা চেহারা। আমার সঙ্গে কথা বলিত না। কিন্তু তাহাকে দেখিতে আমার বেশ ভাল লাগিত। শশীবাবু বলিতেন, "জসীম! বড় হইয়া তুমি আমাদের ব্রাহ্ম-ধর্ম গ্রহণ করিও।"

এই মেয়েটিকে অকালে যক্ষ্মা রোগে ধরিল। চিকিৎসার জন্য তাহাকে কলিকাতা লইয়া যাওয়া হইল। একদিন দিদি বলিলেন, "সেখানে তার সেবা শুশ্রূষার ভাল ব্যবস্থা হইতেছে না।" আমি বলিলাম, "আমি কলিকাতা যাইয়া তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিতে প্রস্তুত আছি।" দিদি শশীবাবুর সঙ্গে কি পরামর্শ করিলেন। আমার কলিকাতা যাওয়া হইল না। অল্পদিনের মধ্যেই মেয়েটির মৃত্যু সংবাদ আসিল।

ব্রাহ্ম-সমাজের একটি বক্তৃতা লইয়া মিঃ সেনের সঙ্গে শশীবাবুর মত-বিরোধ হইল। তখন হইতে মিঃ সেন কয়েকজন লোক লইয়া একটি বাড়িতে প্রতি রবিবারে উপাসনা করিতেন। আমি নিয়মিত এই উপাসনায় যোগ দিতাম। তখনকার ব্রাহ্ম-সমাজের লোকেরা বড়ই

সত্যাশ্রয়ী ছিলেন। জীবন গেলেও মিথ্যা কথা কহিতেন না। তাঁহারা যাহাকে যে কথা বলিতেন প্রাণপণে তাহা রক্ষা করিতেন। হিন্দু সমাজের আচার-ব্যবহার লইয়া ব্রাহ্মরা তীব্র সমালোচনা করিতেন। তাহাদের ছুঁৎমার্গ, জাতি-ভেদ, ধর্মান্ধতা, পৌত্তলিকতার প্রতি তাঁহারা যুক্তির তীব্র কষাঘাত করিতেন। আমার খুব ভাল লাগিত। ইতিপূর্বে হিন্দু সমাজের সঙ্গে মিশিতে যাইয়া তাহাদের ধর্মান্ধতা ও ছুঁৎমার্গের জন্য বহুবার মনে আঘাত পাইয়াছি, তাঁহাদের সমালোচনা আমার সেই ক্ষতস্থানে পেলব স্পর্শ মাখাইয়া দিত।

আমাদের মুসলিম ধর্মমত লইয়া তাহারা বিশেষ সমালোচনা করিতেন না। একমাত্র বলিতেন, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) শেষ পয়গাম্বর নহেন। তিনি মানুষ ছিলেন। সেইজন্য তাঁহার জীবনেও হয়ত কোন অসম্পূর্ণতা ছিল। আমি তাহা বিশ্বাস করিতাম না। শিশুকালে মনসুর মৌলবী সাহেবের নিকট যে ইসলামী প্রভাবে মানুষ হইয়াছিলাম তাহা ধীরে ধীরে আমার মধ্যে প্রকট হইতে লাগিল।

জেলা স্কুলে পড়িবার সময় আমাদের মুসলিম ছাত্রের সংখ্যা ছিল মাত্র বিশ-ত্রিশ জনের মত। এই ছাত্রদলকে লইয়া আমরা মুসলিম ছাত্র-সমিতি নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়াছিলাম। সামান্য চাঁদা সংগ্রহ করিয়া আমরা একটি ক্ষুদ্র পাঠাগারও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম। এই পাঠাগারে তখনকার মুসলিম সাহিত্যিকদের রচিত বইগুলি সংগৃহীত হইয়াছিল। প্রতি রবিবারে আমাদের সভার অধিবেশন বসিত। ছাত্রেরা বড় আসিতে চাহিত না। বাড়ি বাড়ি যাইয়া আমি তাহাদের ডাকিয়া আনিতাম। মৌলবী তমীজ উদ্দীন সাহেব ছিলেন আমাদের সভাপতি। তিনি অধিকাংশ সভায়ই উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিতেন। একবার তিনি বলিয়াছিলেন, "একা জসীমের চেষ্টায়ই মুসলিম ছাত্র-সভা জীবন্ত হইয়া আছে।"

এই ছাত্র-সভার তরফ হইতে একবার আমরা মিঃ সেনকে বক্তৃতা করিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। বহুদিন এন্সাইক্লোপিডিয়া ও অন্যান্য গ্রন্থ ঘাঁটিয়া তিনি যে সারগর্ভ বক্তৃতাটি দিয়াছিলেন, শহরের হিন্দু-মুসলমান সকলেই উহার তারিফ করিয়াছিলেন। আমি মনে মনে ভাবিতেছিলাম,

তাঁহার এই সুনাম যেন আমারই সুনাম। কারণ আমিই তাঁহাকে আমাদের ছাত্র-সভায় বক্তৃতা করিতে রাজী করাইয়াছিলাম।

মিঃ সেন নিজে খুব সুন্দর কবিতা লিখিতে পারিতেন। দেশী-বিদেশী বহু কবিতা তিনি ভাষান্তরিত করিয়াছিলেন। সেগুলি তিনি আমাকে পড়িয়া শোনাইতেন। আগে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়িয়া বুঝিতে পারিতাম না। গীতাঞ্জলী, বলাকা প্রভৃতি বই হইতে বহু কবিতা পড়িয়া তিনি আমাকে বুঝাইয়া দিতেন। তাঁহার কাছে একখানা 'ওয়ার্ডস ওয়ার্থের' কবিতা সংকলন ছিল। তিনি তাহা হইতেও আমাকে মাঝে মাঝে পড়িয়া শোনাইতেন। স্কুলের ছুটি হইলেই আমি তাঁহার বাসায় যাইতাম। সেখানে সামান্য কিছু নাস্তা খাইয়া তাঁহার সঙ্গে মাঠে বেড়াইতে বাহির হইতাম। একদিন তিনি আমাকে বলিলেন, "দেখ, এখানে কোথাও সন্ধ্যা বেলায় আরতীর বাজনা হয়? বহুদিন আরতীর বাজনা শুনি না। ছোটকালে শুনিতাম। তারপর বিদেশে যাইয়া আর শুনি নাই।" আমি বলিলাম, "এখানে কালী-বাড়িতে রোজ সন্ধ্যায় আরতীর বাজনা হয়।" তিনি বলিলেন, "কালী-বাড়িতে জীবহত্যা হয়। সেখানে যাইতে ইচ্ছা করে না।"

মিঃ সেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার খাতা দেখিতেন। এই পরীক্ষার খাতা দেখিয়া তিনি আমাকে দিয়া রেলষ্টেশনে পাঠাইতেন কলিকাতায় পার্শেল করিতে। পার্শেলে যাহা লাগিত তা হইতেও কিছু বেশী টাকা তিনি আমার সঙ্গে দিতেন। একবার সেই খাতা পার্শেল করিয়া আট আনার পয়সা আমার পকেটে আছে। এমন সময় দেখিতে পাইলাম একটি লোক সুন্দর গুড়ের সন্দেশ বিক্রী করিতে আসিয়াছে। ক্ষুধাও তখন বেশ লাগিয়াছে। আমি একটা একটা করিয়া আট আনার সন্দেশই খাইয়া ফেলিলাম। তারপর বেশ অনুতাপ হইল। কেন এরূপ করিলাম? এই আট আনার পয়সা আমি কোথা হইতে দিব? বাড়িতে যাইয়া অনেক চেষ্টা করিলাম বাজানের নিকট হইতে পয়সা লইতে কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারিলাম না।

পরদিন মিঃ সেনের সঙ্গে দেখা করিতে তিনি পয়সার হিসাব চাহিলেন। হিসাব দিতে আমি বলিলাম, "আট আনার পয়সা আমি খরচ করিয়া

ফেলিয়াছি। পরে আপনাকে দিব।" তিনি বলিলেন, "পয়সা তোমাকে ফেরত দিতে হইবে না। কিন্তু কি ভাবে খরচ করিয়াছ আমাকে বল।" আমি তখন সকল কথা প্রকাশ করিলাম। তিনি আমাকে অতি স্নেহের সঙ্গে বলিলেন, "তোমার ভালর জন্যই আমি বলিতেছি, এভাবে সন্দেশ খাওয়া তোমার উচিত হয় নাই।" আমি সরমে মরিয়া গেলাম। সামান্য আট আনার পয়সাই তখন আমার জীবনে কত মহার্ঘ ছিল।

লক্ষ্ণৌ শীয়া কলেজে চাকরি পাইয়া মিঃ সেন চলিয়া গেলেন। তাঁহার বিদায়ের দিন আমি অজস্র কাঁদিয়াছিলাম। ১৯৩১ সনে একবার লক্ষ্ণৌ যাইয়া কয়েকদিন তাঁহার সঙ্গে কাটাইয়া আসিলাম। তিনি কত স্নেহের সঙ্গেই না আমাকে গ্রহণ করিলেন। তখন আমার দুইখানা কবিতার বই বাহির হইয়াছে। লোকের সুখ্যাতিও পাইয়াছি। আমার এই সুখ্যাতি যেন তাঁহারই কৃতিত্ব। খুঁটিয়া খুঁটিয়া তিনি আমাব সবকিছু সাহিত্য-প্রচেষ্টা জানিয়া লইলেন। তখন তিনি শীয়া কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। তাঁহার মেয়েটির নাম মনে নাই। তিনি আমার আহার-বিহারে বিশেষ যত্ন লইয়াছিলেন।

ইহার ১৪ বৎসর পরে মিঃ সেনের সঙ্গে দেখা হইল দিল্লীতে। শীয়া কলেজের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মত-বিরোধের জন্য তাঁহার চাকরিটি গিয়াছে। আর্থিক দুর্গতি এবং ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া তিনি ছেলের সঙ্গে দিল্লীতে বাস করিতেছেন। জন্মান্তববাদ প্রমাণ করিয়া তিনি একটি মোটা কেতাব লিখিয়াছেন। একদিন তিনি আমার বহু মতবাদ গড়িয়া দিয়াছেন। তাঁহার প্রতিটি কথা আমি বেদ-বাক্যের মত সমর্থন করিয়াছি। আজ পরিণত বয়সে তাঁহার জন্মান্তরবাদের সমর্থন করিতে পারিলাম না। অনেক আলোচনার পর তিনি বলিলেন, "ঈশ্বর যদি তোমার ভিতরে এ বিষয়ে বিশ্বাস না গড়িয়া থাকেন তবে যুক্তি-তর্কে কি তাহা করা যায়?" বহুদিনের ব্যবধানে আমার মতবাদ যে তাঁহাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে এজন্য তিনি বিস্মিত হইলেন। দুঃখিত হইলেন কিনা জানি না। তাঁহাকে সালাম জানাইয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। আর যে তাঁহার সঙ্গে দেখা হইবে না তাহা কে জানিত? আমার জীবনে মিঃ সেনের সঙ্গে পরিচিতি একটি মস্তবড় ঘটনা। আমার বহু মতবাদের পিছনে মিঃ সেন জীবন্ত হইয়া আছেন।

ফরিদপুর জেলা স্কুলে

আমি যখন ফরিদপুর হিতৈষী স্কুলের চতুর্থ শ্রেণী হইতে পঞ্চম শ্রেণীতে উঠিলাম, আমার পিতা আমাকে ফরিদপুর জেলা স্কুলে ভর্তি করিতে লইয়া গেলেন। সেখানে খোঁজ লইয়া জানিলেন, মাত্র সাতটি সিট খালি আছে। তাহার জন্য প্রায় একশত ছেলে দরখাস্ত করিয়াছে। সুতরাং সেখানে ভর্তি হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই।

তখনকার দিনে ফরিদপুরের মুসলমানদের একচ্ছত্র নেতা ছিলেন খান বাহাদুর গনি মিঞা সাহেব। মোক্তারী করিয়া তিনি প্রচুর আয় করিতেন। তাঁহার কোনই অহঙ্কার ছিল না। যে তাঁহার কাছে কোন কাজের জন্য যাইত তাহাকেই তিনি সাহায্য করিতেন। তিনি নিজে ইংরেজী জানিতেন না। চাকরী-বাকরীর জন্য যে কেহ তাঁহার নিকট যাইত,—সার্টিফিকেটের জন্য যাইত, তাহাকেই তিনি বলিয়া দিতেন, তোমার যা যা প্রশংসা করার দরকার ভাল কাউকে দিয়া ইংরেজীতে লেখাইয়া আন। আমি দস্তখত করিয়া দিব।" এইসব কাজে তিনি আপন-পর জ্ঞান করিতেন না। তিনি বলিতেন, "হিন্দুদের মত মুসলমানদের ত উচ্চপদে অধিষ্ঠিত বহুলোকের সঙ্গে পরিচয় নাই। তাই আমার কাছে আসিলে আমি চক্ষু মুদিয়া তাহাদের সার্টিফিকেটে দস্তখত দেই।"

আমার পিতা গনি মিঞা সাহেবকে যাইয়া ধরিলেন, "যেমন করিয়াই হউক আমার ছেলেকে ভর্তি করিয়া দিতে হইবে।" সে বছর তিনি তাঁহার নিজের ছেলেকেও জেলা স্কুলে ভর্তি করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। আমার পিতার মত আরও চারজন অভিভাবক তাঁহাদের নিজ নিজ পুত্রকে জেলা স্কুলে ভর্তি করাইবার জন্য গনি মিঞা সাহেবকে যাইয়া ধরিলেন।

গনি মিঞা সাহেব একটি কাগজে সকলের নাম লিখিয়া আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের এজলাসে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

তিনি সাহেবকে বলিলেন, "সরকারী স্কুলের শতকরা ৯৫ জন ছাত্রই হিন্দু। আমার এই ছয়জন ছাত্রকে স্কুলে ভর্তি করার হুকুম দিন।" ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই লিষ্টের উপর স্কুলের হেডমাষ্টারকে লিখলেন, "ইহাদিগকে ভর্তি কর।"

এই কাগজ লইয়া গনি মিঞা সাহেব স্কুলের হেড্‌মাষ্টারের সঙ্গে দেখা করিলেন। তখনকার দিনে জেলা স্কুলের হেড্‌মাষ্টার ছিলেন শ্রীঈশান চন্দ্র সেন; তুখড় হেড্‌মাষ্টার হিসাবে তাঁহার খুব নামডাক ছিল। গনি মিঞা সাহেবের হাতের কাগজখানা পড়িয়া তাঁহার চক্ষু ত চড়কগাছ। এত হিন্দু ছাত্র ফেলিয়া মলিন বসন-পরা আমাদের মত কয়েকজন অপগণ্ড মুসলিম ছাত্রকে তিনি ভর্তি করিবেন। প্রথমে তিনি গনি মিঞা সাহেবকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, "ছেলেরা সকলেই একসঙ্গে পরীক্ষা দিক। যারা যারা ভাল পারিবে তাহাদিগকে ভর্তি করিব।" গনি মিঞা সাহেব বলিলেন, "আমার গোটা মুসলিম সমাজ অজ্ঞানতার অন্ধকারে পড়িয়া আছে। ছাত্র বেতনে যাহা আদায় হয় তাহা মাত্র এই স্কুলের দুই তিন মাসের খরচ। বাকী টাকার অর্দ্ধেকেরও বেশী দেয় আমার মুসলমান ভাইরা নানা রকম ট্যাক্স আর খাজনা বাবদে। কিন্তু এই স্কুল হইতে কোন প্রতিদানই তাহারা পায় না। আপনারা হিন্দুরা অগ্রসর জাতি। আমাদিগকে আপনাদের টানিয়া তুলিতে হইবে। এইভাবে প্রতিযোগীতায় জয়ী হইয়া যদি মুসলমান ছাত্রদিগকে ভর্তি হইতে হয় তবে দুইশত বৎসরেও তাহারা আপনাদের সমান হইতে পারিবে না।"

হেড্‌মাষ্টার মহাশয় তখন গনি মিঞা সাহেবের হাতখানি ধরিয়া বলিলেন. "দেখুন খান বাহাদুর সাহেব! এক কাজ করি সাতটি মাত্র সিট খালি আছে। চারটি হিন্দু ছাত্র ভর্তি করি আর আপনার লিষ্ট হইতে তিনটি মুসলমান ছাত্রকে লই।"

গনি মিঞা সাহেব অনড়। তিনি বলিলেন, "ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ছয়টি মুসলমান ছাত্রকেই ভর্তি করিতে আদেশ দিয়াছেন। আপনার যদি সাহস থাকে তাঁহার আদেশ অমান্য করুন।"

"কি বলেন খান বাহাদুর! আদেশ অমান্যের কথা ত আমি বলিতেছি না। আমরা একটি আপোষে আসিতে চাহিয়াছিলাম। তা আপনি যখন

বলিতেছেন, ছয়জনকেই লইব।"

গনি মিঞা সাহেব চলিয়া গেলেন। হেডমাষ্টার মহাশয় আমাকে আর আমার ভাই নেহাজউদ্দীনকে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া একটি খাতায় উত্তর লিখিতে বলিলেন। খাবাপ হাতের লেখার জন্য আজ পর্যন্তও আমি প্রসিদ্ধ। প্রশ্নের উত্তর লেখা হইলে হেড্‌মাষ্টার নেহাজউদ্দীনের খাতা পড়িয়া তাহাকে ভর্তির উপযুক্ত বলিয়া স্থির করিলেন। আমাব খাতাখানায় একটু নজব দিয়াই তিনি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। আমার পিতাকে বলিলেন, "আপনার কোন ছেলেই পড়াশুনাব কাজের না। একে ফিরাইয়া লইয়া যান। ভর্তি করিতে পারিব না।" ইতিপূর্বে আমার বড়ভাই এই স্কুলে ভর্তি হইয়া সপ্তম শ্রেণীতে উঠিয়াই পড়াশুনা ছাড়িযা দিয়াছিলেন, হেড্‌মাষ্টারেব তাহা মনে আছে। আমার পিতা কত অনুনয়-বিনয় করিলেন। হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের মতেব পরিবর্তন হইল না। তারপব অনেকক্ষণ পরে হযত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুমের কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি আমাকে আবার কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাহাব যথাযথ উত্তর দিতে পারিলাম। তিনি আমাকে ভর্তি করিয়া লইলেন।

পরদিন ক্লাশে আসিয়া বসিলাম। সন্ন্যাসীর ভক্ত হইয়া আমি পায়ে জুতা পরিতাম না। পাড়হীন সাদা কাপড় পরিতাম। ক্লাশের ছাত্রবা প্রায় সকলেই শহরবাসী। অনেকেবই পিতার অবস্থা ভাল। রঙ-বেরঙের জামা পরিযা, নানা রকমের জুতা পায়ে দিয়া তাহারা স্কুলে আসিত। আমাকে তাহারা গ্রাম্য-ভূতের মতই মনে করিল। আমি কাহারও কাছে যাইয়া বসিলে সে অন্যত্র যাইয়া বসে। শত চেষ্টা করিয়াও কাহারও সঙ্গে ভাব জমাইতে পারি না। আমার ইচ্ছা হইত ক্লাশের যে ফার্ষ্ট হয় তাহার সঙ্গে ভাব করি। তাহার সঙ্গে ভাব হইলে তাহার নিকট হইতে ক্লাশের পড়াটা ভাল করিয়া শিখিয়া লইব। ছুটির পর কতদিন তাহার বাড়ি পর্যন্ত গিয়াছি। সে আমার সঙ্গে একটিও কথা বলে নাই। ক্লাশের বন্ধুদের অবহেলায় নিজের প্রতিও আমার মনে একটি অবহেলার ভাব আসিল। ক্লাশের অন্যান্য ছেলেরা যেমন সদাচঞ্চল হইয়া ঘুরিত ফিরিত, আমি অতি সঙ্কোচে পিছনের বেঞ্চে আমার চাচাত ভাই

নেহাজউদ্দীনের সঙ্গে জড়সড় হইয়া বসিয়া থাকিতাম। শিক্ষকেরা অন্যান্য ছাত্রদের লইয়া কত হাসি-তামাসা করিতেন। এটা ওটা প্রশ্ন করিতেন। আমাদিগকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিতেন না।

কিছুদিন পরে জোরের সঙ্গে ক্লাশের পড়াশুনা আরম্ভ হইল। শিক্ষকদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সঙ্গে উপর নীচ হওয়ার প্রথা প্রবর্তিত হইল। অঙ্কে, বাংলায়, ইতিহাসে, ভূগোলে আমি ভাল পড়া বলিতে পারিতাম। ধীরে ধীরে আমি সামনের বেঞ্চের দিকে আসিতে লাগিলাম। ইংরেজীর ক্লাশে আবার নামিয়া যাইতে লাগিলাম। অঙ্কের ক্লাশে কোন কোন দিন প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতাম। আমার দুই পাশের ভাগ্যবানদের ছেলেরা আমার ছোঁয়া বাঁচাইয়া যথেষ্ট ফাঁক রাখিয়া সরিয়া বসিত।

ভাল করিয়া ইংরেজী বই পড়িবার জন্য আমার খুবই ইচ্ছা হইত। অর্থ পুস্তক দেখিয়া ইংরেজী পড়া তৈরী করিতাম। সেই অর্থ-পুস্তকে বাংলায় ইংরেজী উচ্চারণ লেখা থাকিত। 'Hidden' শব্দের পাশে বাংলায় লেখা থাকিত 'হিডন'। 'Horse' শব্দের পাশে বাংলায় লেখা থাকিত 'হর্ষ'। বাড়িতে কেহই ইংরেজী জানিত না। অর্থ-পুস্তক দেখিয়া এই ভাবে ইংরেজী উচ্চারণ শিখিয়া ক্লাশে যখন পড়িতাম শিক্ষক ছাত্র সকলে মিলিয়া আমাকে উপহাস করিত। আমাদের বাড়িতে তখনও হারিকেন লণ্ঠনের প্রচলন হয় নাই। কেরোসিনের কুপী জ্বালাইয়া পড়াশুনা করিতে হইত। কোন রকম চেয়ার টেবিল ছিল না। আমার পিতার বই-পুস্তক রাখিবার একখানা সুন্দর ফুলচাং আমাদের ঘরের চালার সঙ্গে লটকানো ছিল। তাহার উপর আমার বই-পুস্তক রাখিতাম। ঘরের মেঝেয় মাদুরের উপর বসিয়া পড়াশুনা করিতাম।

আমাদের ক্লাশে একদিন রাজবাড়ির রাজপুত্র আসিয়া ভর্তি হইল। তাহার সঙ্গে ভাব করিবার জন্য ক্লাশের ছেলেদের কি কাড়াকাড়ি! আমারও ইচ্ছা হইত রাজপুত্রের সঙ্গে আলাপ করি। কিন্তু অন্যান্য ছেলেদের ব্যূহ ভেদ করিয়া তাহার নিকটস্থ হইতে পারিতাম না। আমাদের ক্লাশে পড়িত ধীরেন্দ্র নামে একটি ছাত্র। স্থানীয় গভর্নমেণ্ট উকিলের পুত্র। এই সুদর্শন বালকটি ছিল বড়ই নিরহঙ্কার আর মিশুক।

পড়াশুনায়ও সে ছিল ভাল। অন্যান্য ছেলেদের মত সে আমাকে অবহেলা করিত না। শিক্ষক মহাশয়েরা যা যা নোট দিতেন, সে তাহা অতি সুনিপুণ করিয়া লিখিয়া রাখিত। একদিন সেই নোট আনিবার জন্য তাহাদের বাড়ি গেলাম। আমাকে বাহিরে দাঁড় করাইয়া ধীরেন বাড়ির ভিতর চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে একজন বর্ষিয়সী মহিলা আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা! তুমি ওখানে দাঁড়াইয়া আছ কেন?

আমি বলিলাম, "ধীরেন আমার সহপাঠী। তাহার কাছে নোটখাতা লইতে আসিয়াছি।"

তিনি সস্নেহে বলিলেন, 'তবে তুমি বাহিরে দাঁড়াইয়া আছ কেন? ভিতরে আসিয়া বস।" এই বলিয়া তিনি আমাকে বৈঠকখানার ফরাসে লইয়া বসাইলেন।

আমার নাম কি? বাড়ি কোথায়? বাড়িতে কে কে আছেন, বাবা কি করেন প্রভৃতি নানা প্রশ্ন করিয়া আমার যাহা কিছু তিনি জানিয়া লইলেন। ইতিমধ্যে ধীরেন আসিয়া তাহার নোটখাতাটি আমাকে দিয়া গেল। বিদায়ের সময় ধীরেনের মা আমাকে বলিয়া দিলেন, 'তুমি আমার ধীরেনের বন্ধু। যখন খুশী আমাদের বাসায আসিবে। কোন সঙ্কোচ করিবে না।"

ফিরিবার পথে বার বার এই মহিলাটির কথা মনে পড়িতে লাগিল। মনে হইল এমন আপনার জন বুঝি কেহ আমার নাই। সেদিন এমন কিছু তিনি আমাকে বলেন নাই যার জন্য এত করিয়া তাঁহাকে মনে পড়িবে। শুধুমাত্র বলিয়াছিলেন, "যখন খুশী তুমি আমার এখানে আসিও?" এই সামান্য কথার জন্য কেহ কাহারো প্রতি আকৃষ্ট হয় না। পরিণামে যে এই মহিলাটি আমার জীবনে এক অভূতপূর্ব স্নেহময়ী মাতৃরূপে আবির্ভূতা হইবেন তাঁহার দর্শনে আমার অবচেতন মনের কোন কন্দরে হয়ত তাহারই একটু ছোঁয়া লাগিয়াছিল। বাড়ী যাইবার সমস্ত পথ যেন নাচনের-নূপুর হইয়া আমার পায়ে বাজিতে লাগিল। ইহার পরে কারণে-অকারণে বহুবার ধীরেনদের বাড়িতে গিয়াছি। একদিন মাঠ হইতে সরষে শাক তুলিয়া আনিয়া ধীরেনের মাকে দিলাম।

এই সামান্য উপহার পাইয়া তিনি যে খুশী হইলেন, আমার সুদীর্ঘ জীবনে কত জনকে কত কিছু দিয়া কোনদিন কাহাকেও তেমন খুশী করিতে পারি নাই। ইহার পর কবে হইতে যে তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিলাম তাহা আজ মনে নাই।

এবার হইতে ক্লাশে ধীরেন আমার সঙ্গে আরও মিশিতে লাগিল। আমার পড়াশুনা দেখাইয়া দিতে লাগিল। আমি শিক্ষকের কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলে সে বড়ই খুশী হইয়া উঠিত। এ যেন তাহারই কৃতিত্ব। ক্লাশের উপর-নীচ অনুসারে কোন কোন দিন আমরা পাশাপাশি বসিতাম। তখন আমাদের মনে বড়ই আনন্দ হইত। আমরা পরস্পরে যে কতই গল্প করিতাম, এজন্য মাঝে মাঝে শিক্ষকের ধমকানি খাইতে হইত।

তখনকার দিনে সপ্তাহে দুই ঘণ্টা করিয়া ড্রইং শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। একদিন আমরা সকলে লতাপাতা আঁকিতাম। অপরদিন হিন্দু ছেলেরা মানুষ ও নানা প্রকার জীবজন্তু আঁকিত। জীবজন্তুর ছবি আঁকিলে মুসলমান ছেলেদের ধর্ম নষ্ট হয় এই মিথ্যা ধর্মের গোড়ামী কে আবিষ্কার করিয়াছিল জানি না। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া সাহিত্য, সঙ্গীত ও চিত্রাঙ্কন বিদ্যায় আমরা মুসলমানেরা যে দেওলিয়া-খাতায় নাম লেখাইয়াছি তাহা এই সব গোড়ামীর ফল।

যে ঘণ্টায় হিন্দু ছেলেরা জীবজন্তুর ছবি আঁকিত সে সময় আমরা মৌলবী সাহেবের কাছে উর্দু ভাষা শিক্ষা করিতাম। সেই শিক্ষার কোন প্রণালী ছিল না। মৌলবী সাহেব একখানা উর্দু কিতাব দেখিয়া পড়া দিয়া দিতেন। পরদিন পড়া না পারিলে বেদম প্রহার করিতেন। উর্দু বর্ণমালা শিক্ষা করা বড়ই কঠিন। শব্দের এক এক স্থানে একই অক্ষর বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে। তাহা ভালমত শিখাইবার ধৈর্য মৌলবী সাহেবের ছিল না। তাঁহার ক্লাশে আসিলে তিনি আমাদিগকে টুপী পরিয়া আসিতে বলিতেন। তখনকার দিনে প্রতি ক্লাশে চার পাঁচ-জন করিয়া মুসলমান ছাত্র ছিলাম। এক মৌলবী সাহেব আর ড্রিল মাষ্টার সাহেব ছাড়া স্কুলে আর কোন মুসলমান শিক্ষক ছিলেন না। এই হিন্দু অধ্যুষিত বিদ্যালয়ে একেই ত মুসলমান ছাত্রদের সঙ্গে হিন্দু

ছেলেরা ভালমত মিশিত না, তাহার উপর টুপী মাথায় পরিলে নানা রকম ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত। আমরা অনেকেই টুপী মাথায় দেওয়াটা অতীব-লজ্জাজনক বলিয়া মনে করিতাম। তাই মৌলবী সাহেবের আদেশ পাইয়াও টুপী পরিয়া স্কুলে আসিতাম না। এই জন্য মৌলবী সাহেব বেত দিয়া মাথায় বাড়ি মারিতেন। সেই আঘাতে মাঝে মাঝে মাথার স্থানে স্থানে ফুলিয়া যাইত। ছোটদের মাথায় মারিলে তাহাদের ভবিষ্যত মেধা শক্তি যে কত অবনতি হয় তাহা হয়তো তিনি জানিতেন বলিয়াই সব চাইতে ক্ষতিকর স্থানেই আঘাত করিতেন। শিক্ষকতার কাজে আসিয়া ছাত্র দিগকে তিনি শুধু ঠেঙ্গাইতে শিখিয়াছিলেন। ভালবাসিয়া, আদর করিয়া নিজের কথাটিকে যদি তিনি বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন তবে হয়তো তাহার সুফল ফলিত। এই মৌলবী সাহেব পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়িতেন, আর গভীর রাত্রে জাগিয়া নাকি আল্লার এবাদত-বন্দেগীও করিতেন; কিন্তু এই তপস্যার কোন ফলই তাঁহার জীবনে প্রতিফলিত হয় নাই। ধর্ম যখন রুটিন মাফিক প্রথা হইয়া জীবনে অভ্যস্ত হইয়া যায় তখন তাহা হইতে কোন উপকারই পাওয়া যায় না। যদি পাওয়া যাইত তবে মৌলবী সাহেব ভালবাসিয়া আমাদের ধর্মের কথাটি বুঝাতেন। কেন আমরা টুপী পরি না তাহা জানিতে চেষ্টা করিতেন। মৌলবী সাহেবের অত্যাচারে অতীষ্ঠ হইয়া আমরা খলিফার দোকান হইতে তিন পয়সা দিয়া কিস্তি টুপী কিনিয়া আনিয়া পকেটে রাখিলাম। তাঁহার ক্লাশে যাইবার সময় সেই টুপী মাথায় দিতাম। ক্লাশ শেষ হইলে আবার মাথা হইতে খুলিয়া পকেটে পুরিতাম, যেন হিন্দু ছাত্রেরা দেখিয়া না ফেলে। আমাদের ক্লাশের কয়েকটা ছেলে আগেই বাড়ি হইতে উর্দূ বর্ণমালা শিখিয়া ফেলিয়াছিল। আমরা দুই তিনজন যাহারা বাড়িতে শিখি নাই, তাহাদিগকে বর্ণমালা শিখাইবার পরিশ্রম করিয়া মৌলবী সাহেব সময়ের অপব্যয় করিতেন না। প্রতিদিন তিনি আমাদিগকে নিয়মিত পড়া দিয়া দিতেন। পড়া পারিতাম না। সেইজন্য মৌলবী সাহেব আমাকে বেদম প্রহার করিতেন। তাঁহার প্রতি ধীরে ধীরে আমার মন বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিতেছিল। আমাকেও তিনি দুই চক্ষে দেখিতে

পারিতেন না। সপ্তম শ্রেণীতে উঠিয়া আমি আরবীর পরিবর্তে সংস্কৃত লইলাম। এই মৌলবী সাহেবের অত্যাচারে আমার স্কুল-জীবন মুসলিম কৃষ্টি ও তমদ্দুনের ধারা হইতে বঞ্চিত হইল।

পঞ্চম শ্রেণীতে পড়িতে বিধুভূষণ ভট্টাচার্য নামে আমাদের ক্লাশে একজন নতুন শিক্ষক আসিলেন। তিনি এত সুন্দর করিয়া পড়াইতেন। গ্রামার ও ব্যাকরণের নিয়মগুলি তিনি বোর্ডে ছবি আঁকিয়া পানির মত বুঝাইয়া দিতেন। ইংরেজীতে আমি খুব কাঁচা ছিলাম। মাসে দুই টাকা মাত্র বেতন লইয়া তিনি আমাকে প্রাইভেট পড়াইতে রাজী হইয়াছিলেন। স্কুলের ছুটি হইলে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁহার বাসায় যাইয়া পড়াশুনা করিতাম। তখনকার দিনে অনেক হিজিবিজি কবিতা লিখিয়া তাঁহাকে দেখাইতাম। তিনি পড়িয়া খুব তারিফ করিতেন। বার্ষিক পরীক্ষা দিয়া আমি প্রমোশন পাইয়া ষষ্ঠ শ্রেণীতে উঠিলাম। আমার চাচাত ভাই নেহাজউদ্দীন পাশ করিতে পারিল না। এই ফেল করিবার ফলে সে স্কুলে আসা বন্ধ করিল। তাহাকে স্কুলে আসিবার জন্য তাহার পিতাও তেমন আগ্রহ দেখাইলেন না। আমার চাচাত ভাইটি যদিও পড়াশুনা আর করিল না, উপস্থিত-বুদ্ধির ব্যাপারে সে চিরকালই আমাকে পরাজিত করিত। মুখে মুখে হিসাব করিতে তাহার মত আমাদের গাঁয়ে একজনও ছিল না।

ষষ্ঠ শ্রেণীতে উঠিলেই আমাদের বাংলা পড়াইতে আসিলেন বাবু যোগেন্দ্র নাথ সেন মহাশয়। কথা-বার্তায় সামান্য চট্টগ্রামের টান তাঁহার ছিল। কিন্তু বাংলা পড়াইতে যাইয়া বাংলা সাহিত্যের প্রতি তিনি তাঁর ছাত্রদের মনে একটি গভীর অনুরাগ জাগাইয়া তুলিতে পারিতেন। ব্যাকরণের কঠিন তথ্যগুলি তিনি পানির মত করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। তাঁহার ক্লাশে পড়িয়া আমি বাংলা সাহিত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগী হইয়া পড়িলাম। পণ্ডিত মহাশয়ের এক ভাই আমার সহপাঠী ছিল। ছুটির দিনে পণ্ডিত মহাশয়ের বাসায় যাইয়া আমি পড়াশুনা করিতাম। অবসর সময় তাঁহার বাড়ির আম গাছে উঠিয়া পাকা আম পাড়িতাম, জামরুল গাছে উঠিয়া এ ডাল ও-ডাল ভাঙ্গিতাম। পণ্ডিত মহাশয় কিছুই বলিতেন না।

আমার সুদীর্ঘ জীবনে যত ভাল ভাল শিক্ষক দেখিয়াছি এই পণ্ডিত মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। অনেক বিদ্যা তিনি জানিতেন না; কিন্তু যেটুকু তিনি জানিতেন তাহা তিনি ছাত্রদের মনে ভরিয়া দিতে পারিতেন।

এই পণ্ডিত মহাশয়ের অতিথি হইয়া আসিলেন খিরোদ বাবু। ইনি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের ভাব-শিষ্য ছিলেন।

খবর পাইয়া একদিন এই কবির সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। আমার জীবনে একজন কবি দর্শন এই প্রথম। মনে মনে তাঁহার প্রতি যে সব কল্পনা আরোপ করিয়াছিলাম তাহাতে আমি ভাবিয়াছিলাম একজন সত্যকার কবি যেন কেমন হইবেন! তাঁর লম্বা চুল থাকিবে। ক্ষণেক কাঁদিবেন, ক্ষণেক হাসিবেন। কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য হইলাম। আমাদেব শিক্ষক মহাশযের মতই তিনি একজন সাধারণ মানুষ। কবি বলিয়া কে চিনিবে? আমাকে তিনি অতি আদরের সঙ্গে গ্রহণ করিলেন। আমার কবিতার খাতাখানি পড়িয়া স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়া দিলেন। ইহার পর প্রায়ই পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিতে যাইতাম। বিকাল হইলে তাঁহার সঙ্গে মাঠে বেড়াইতে বাহির হইতাম। আলীপুরের মোড়ে ছোট গাঙের তীরে বসিয়া দুইজনে অস্তগামী সূর্যের শোভা নিরীক্ষণ করিতাম। ছোট্ট নদীটির ওপারে মেঘে মেঘে নানা রঙের নক্সা আঁকিয়া সূর্য অস্ত যাইত। তারপর রঙ আর রঙ, অর্ধেক আকাশ ভরিয়া রঙের উপর রঙের ঢেউ খেলিত। তারই কিছুটা নদীর জলে পড়িত। চাহিয়া চাহিয়া বুকের ভিতরে কি যেন উদাসীনতা অনুভব করিতাম।

ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়িতে ধীরেন আমাকে খুব সাহায্য করিত। স্কুলে বাড়ির কাজ করিয়া না আসিলে তাহার খাতা হইতে টুকিয়া লইতে দিত। কিন্তু সপ্তম শ্রেণীতে উঠিয়া আমরা দুই সেক্সনে পৃথক হইয়া গেলাম। ধীরেন গেল 'বি' সেক্সনে, আমি রহিলাম 'এ' সেক্‌সনে। আমি বহু চেষ্টা করিলাম 'বি' সেক্‌সনে যাইতে। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষেরা আমাকে 'বি' সেক্‌সনে বদলী করিলেন না। ইহাতে আমার পড়াশুনা খুবই খারাপ হইয়া পড়িল।

সপ্তম শ্রেণীতে উঠিয়া মোলবী সাহেবের হাত হইতে উদ্ধার পাইতে

আমি আরবীর পরিবর্তে সংস্কৃত লইলাম। সংস্কৃত পড়িলে ভাল বাঙলা লিখিতে পারিব ইহাই আমার সংস্কৃত পড়ার অন্যতম কারণ। আরবী অথবা পারসী লইলে মুসলিম সংস্কৃতির যেটুকুর সঙ্গে সেই বয়সে আমার পরিচিতি হইত সংস্কৃত লইয়া তাহা হইতে বঞ্চিত হইলাম। ইহার জন্য সেই মৌলবী সাহেবই দায়ী। এই ক্লাশে উঠিলে বাবু বসন্ত কুমার দাস নামে একজন শিক্ষক আসিলেন। তিনি আমাদিগকে ভূগোল, ইতিহাস ও ইংরেজী পড়াইতেন। তিনি ঢাকা Teacher s Training College হইতে বি, টি পাশ করিয়া আসিয়াছিলেন। সেই প্রতিষ্ঠান হইতে আধুনিক শিক্ষার বিষয়ে যাহা যাহা শিখিয়া আসিয়াছিলেন তাহা তিনি প্রতিদিনের শিক্ষকতায় প্রয়োগ করিতেন। এতদিন আমরা ইতিহাস, ভূগোল বাংলায় পড়িতাম। এবার হইতে ইংরেজীতে পড়িতে আরম্ভ করিলাম।

আমরা যাহাতে মুখে মুখে ইংরেজী বানাইয়া বলিতে পারি, প্রথমে তিনি আমাদিগকে সেই শিক্ষা দিলেন। ক্লাশে আমিই ছিলাম সব চাইতে ইংরেজীতে কাঁচা। তাই তিনি আমাকেই সব চাইতে বেশী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন। তিনি বলিতেন, "জসীম উদ্দীনকে যদি শিখাইতে পারি তবে ক্লাশে সব ছেলেকে শেখানো যাইবে।"

প্রতিদিন ক্লাশে আসিয়াই যে ঘণ্টায় যাহা শিক্ষনীয় তাহার point গুলি তিনি বোর্ডে লিখিয়া দিতেন। সেই point গুলি বিস্তৃত করিয়া দুই তিনবার আমাদিগকে বলিয়া দিতেন। তারপর আরম্ভ হইত প্রশ্ন করিবার পালা। আমাকেই বেশী উত্তর দিতে হইত। ভালমত উত্তর না দিতে পারিলে তিনি অসন্তুষ্ট হইতেন না। আমি যাহাতে সঠিক উত্তর দিতে পারি সে জন্য তিনি আমাকে সাহায্য করিতেন। আমার ইংরেজী ভুল হইলে তাহা সংশোধন করিয়া সেই কথা আমাকে দিয়া আবার বলাইতেন। তিনি ছোটদের জন্য উমা, বনলতা প্রভৃতি দুই তিনখানা বই লিখিয়াছিলেন। তাহা কলিকাতার সিটি লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

যোগেনবাবু পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার কি যেন রেষারেষী ভাব ছিল। একদিন তিনি আমাকে বলিলেন, "ওই যোগেন পণ্ডিত আমাকে ঈর্ষা করে। জান ভারতবর্ষ, প্রবাসীতে আমার বই-এর বিজ্ঞাপন বাহির হয়। এই সব পত্রিকা ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি নানা দেশে যায়।

সেই দেশের লোক আমার সাহিত্য-খ্যাতি জানিতে পারে। এই যোগেন পণ্ডিতের চৌদ্দপুরুষেরও ভাগ্য নাই এমন খ্যাতি লাভ করে।" যোগেন বাবু পণ্ডিত মহাশয়কেও আমি ভক্তি করিতাম। সে জন্য তাঁহার সঙ্গে বসন্ত বাবু মাষ্টার মহাশয়ের গুণের তারতম্য কতটা করিয়াছিলাম মনে নাই। কিন্তু ইংলণ্ড, আমেরিকায় যাঁহার সাহিত্য-খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সেই নররূপী শিক্ষক দেবতাটির প্রতি আমার মনের কল্পনা সেই লণ্ডন, আমেরিকা ছাড়াইয়াও অনেক দূরে ব্যাপ্ত হইত।

প্রায়ই মাষ্টার মহাশয়ের বাড়ি যাইতাম। বই-এর নাম অনুসারে ফুলের মত ফুটফুটে তাঁহার দু'টি মেয়ের নাম রাখিয়াছিলেন উমা আর বনলতা। একজন চার বৎসরের আর একজন ছয় বৎসরের। এই মেয়ে দুইটি আসিয়া পিতার সঙ্গে নানা আবদার করিয়া এটা ওটা চাহিত। আমার খুব ভাল লাগিত! বসন্তবাবুর স্ত্রী শিল্পকার্যে সুদক্ষ ছিলেন। নারকেল কাটিয়া নানা রকম ছবির মত করিয়া চিনির রসে ভিজাইয়া তিনি এক রকম খাবার তৈরী করিতেন। একবার মাষ্টার মহাশয় আমাকে এই খাবার খাওয়াইয়াছিলেন। তাঁহার স্বাদ আজও মনে করিতে পারিতেছি। বসন্ত বাবু "নবীন আলোক" নামে একখানা গল্পের বই লিখিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া তিনি রঘুনাথ গোস্বামী কৃত 'হংস-দূত' নামক পুস্তকখানি বাংলায় কবিতাকারে অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাহার একটি লাইন আজও আমার মনে আছে:

হরিতাল-দ্যুতিহর রূপ-মনোহর
জবা-পুষ্পসম-রম্য তল চরণের।

তাঁহার আদেশে এই বই আমি ট্রেনের যাত্রীদের মধ্যে বিক্রী করিয়া দিতাম। মাঝে মাঝে তাঁহার বাসায় যাইয়া পড়া বুঝিয়া লইতাম; আর কল্পনা করিতাম, কবে আমি বসন্ত বাবুর মত লেখক হইতে পারিব। নির্জন স্থানে বসিয়া মনে মনে তাঁহাকে ধ্যান করিতাম আর ভাবিতাম এরূপ করিতে করিতে একদিন তাঁহার সমস্ত গুণপনা আমার মধ্যে প্রবর্তিত হইবে। বসন্ত বাবু ছিলেন জাতিতে ক্ষৌরকার। সেই জন্য বর্ণহিন্দু ছাত্রেরা তাঁহাকে লইয়া নানারূপ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত। পরীক্ষার হলে তিনি ছাত্রদের পকেট অনুসন্ধান করিয়া নকল ধরাইয়া দিতেন। একবার তিনি

একটি হিন্দু-ছাত্রের পকেট অনুসন্ধান করিতে গিয়াছেন, তাহার পকেট হইতে এক টুকরা কাগজ বাহির হইল। তাহাতে লেখা ছিল বাজারে নাপিত খরচ এক আনা। ইহা লইয়া হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে কিছুদিন নানা রকমের ঠাট্টা-বিদ্রূপ চলিল। আমরা মুসলমান ছাত্রেরা বড়ই মনঃক্ষুণ্ণ হইলাম! আমাদের মধ্যে জাতিভেদ নাই। একজন শিক্ষককে এইভাবে অপদস্থ করা হিন্দু ছেলেদের পক্ষে খুবই অন্যায় হইয়াছিল।

বসন্ত বাবু পরীক্ষার হলে ছাত্রদের নকল ধরাইয়া দিতেন বলিয়া এক দল ছাত্র তাঁহার প্রতি বড়ই বিরূপ হইয়া উঠিল। তাহারা বসন্ত বাবুর নামে যা তা লিখিয়া দেয়ালে টাঙাইয়া দিতে লাগিল। একবার আমি এরূপ একটি লেখা কাছারীর কাছে জেলখানার দেয়ালে টাঙানো দেখিতে পাইলাম। মনে মনে চিন্তা করিলাম এই লেখা পড়িয়া সকলে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষককে কতই না খারাপ মনে করিবে। তাই অতি সাবধানে সেই কাগজখানা তুলিয়া আনিয়া বসন্ত বাবুকে দিলাম। ভাবিয়াছিলাম, এই লেখাটি পাইয়া তিনি আমার গুরুভক্তি দেখিয়া আমাকে কতই না তারিফ করিবেন। কিন্তু লেখাটি হাতে লইয়া তিনি কেমন গম্ভীর হইয়া গেলেন। স্কুলের টিফিনের সময় অপর শিক্ষক রমনী বাবু আমাকে একটি নির্জন ঘরে ডাকাইয়া লইয়া ধমকের সুরে নানা রকম প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। আমিই যে উহা কাউকে দিয়া লেখাইয়া আনিয়া বসন্ত বাবুকে দিয়াছি তাহাই তিনি বিশ্বাস করিলেন এবং ইহার পরিণাম যে কি ভয়ঙ্কর তাহাও তিনি আমাকে সমঝাইয়া দিলেন।

সেদিন রাত্রে আর ঘুম আসিল না। যে শিক্ষককে আমি এত করিয়া ভক্তি করি সেই বসন্তবাবুই কিনা আমাকে এমন গর্হিত কাজে সন্দেহ করিলেন। নিজে প্রশ্ন করিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়াছেন বলিয়া অপরকে দিয়া আমাকে প্রশ্ন করাইয়াছেন! সমস্ত পৃথিবীর উপর আমার অবিশ্বাস হইতে লাগিল। আমার অন্তরের শিক্ষক-দেবতা আজ ধূলিতে নামিয়া গেলেন।

ইহার পরে এখানে ওখানে আরও বহু প্রকার দেয়াল-লিপি প্রকাশিত হইতে লাগিল। তাহাতে লেখাছিল বসন্ত বাবু ক্লাশের সুন্দর ছেলেদের বেশী নম্বর দেন, বড়লোকের ছেলেদের বেশী খাতির করেন ইত্যাদি, ইত্যাদি।

একদিন আমার নামে এক নোটিশ আসিল! শহরের পুলিশ সাহেব আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। স্কুলের ঢেঙ্গা গোছের আরও সাত আটটি ছেলের নামেও এরূপ নোটিশ আসিল। নির্দিষ্ট দিনে হেড্‌মাষ্টার মহাশয় আমাদিগকে লইয়া পুলিশ সাহেবের বাসায় চলিলেন। আমরা ত ভয়ে কাঁপিতে লাগিলাম। আমাদের জীবনের ভবিষ্যত আজই চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। পুলিশের খাতায় যখন নাম উঠিল, ইহা আর কখনো মুছিবে না। আমার এত শ্রদ্ধার শিক্ষক মহাশয় বিনা অপরাধে আমার উপর এই শাস্তির ব্যবস্থা করিলেন।

একটি কামরায় আমাদিগকে বসাইয়া হেডমাষ্টার মহাশয় অনেকক্ষণ পুলিশ সাহেবের সঙ্গে কি আলাপ-আলোচনা করিলেন। এই সময়টা আমাদের কিছুতেই কাটিতেছিল না। হেডমাষ্টারের সঙ্গে আলোচনা করিয়া পুলিশ সাহেব আমাদিগকে জেলেই পাঠাইবেন অথবা অন্য কোন শাস্তির ব্যবস্থা করিবেন আমরা এইরূপ জল্পনা-কল্পনা করিতেছি, এমন সময় পুলিশ সাহেব আমাদের সামনে আসিয়া ইংরেজীতে বলিলেন, 'স্কুলের শিক্ষকের নামে এরূপ দেয়াল-পত্র রচনা করা খুবই খারাপ কাজ। তোমরাই যে এ কাজ করিয়াছ তাহা না-ও হইতে পারে, ভবিষ্যতে এরূপ দেয়াল-পত্রের প্রতি পুলিশের নজর রহিল। যে এ কাজ করিবে তাহাকে ধরিয়া কঠিন শাস্তি দেওয়া হইবে। তোমরা এরূপ লোককে ধরিয়া দিতে চেষ্টা করিবে। তোমাদের ডাকিয়া আনিয়া কষ্ট দিলাম। এজন্য আমি বড়ই দুঃখিত। তোমরা যার যার বাড়ী যাইয়া পড়াশুনা কর।' পূর্বেই বলিয়াছি আমার জীবনে নিরপরাধে বহুবার শাস্তি পাইয়াছি। এটাও তাহারই আর একটি দৃষ্টান্ত। ইহার পরে বসন্ত বাবুর বাসায় যাওয়া ছাড়িয়া দিলাম। তাঁহার বাসায় গেলে তিনি সস্নেহে ক্লাশের পড়া শিখাইয়া দিতেন, আমার আজে-বাজে কবিতাগুলি পড়িয়া উৎসাহ দিতেন, এই সুযোগের জন্য মন সর্বদা আকুলি-বিকুলি করিত।

সেবার ফরিদপুরে মনমোহন থিয়েটার আসিল। আমার ত বেশী পয়সা ছিল না। সকলের নিম্নের আট আনা দামের একখানা টিকিট ক্রয় করিয়া থিয়েটার দেখিতে গেলাম। ড্রপসিনের সময় আমার এক বন্ধুর খোঁজে ভিতর দিয়া সেকেণ্ড ক্লাশে গেলাম। বন্ধুকে পাইয়া সেখানকার

গেট দিয়া বাহির হইয়া আসিতে আমাকে সেকেণ্ড ক্লাশের গেট-পাশ দেওয়া হইল। সেই পাশ লইয়া আমি ফোর্থ ক্লাশের গেটে ঢুকিব, অমনি বসন্ত বাবু থাপা দিয়া আমার হাত ধরিয়া ফেলিলেন : "তুমি ফোর্থ ক্লাশের সিট কিনিয়া সেকেণ্ড ক্লাশের পাশ লইয়া আসিলে কিরূপে? নিশ্চয়ই তুমি সেখানে যাইতে চেষ্টা করিয়াছিলে। তোমাকে সাধু বলিয়া জানিতাম। কিন্তু আজ তুমি বেশ সাধুতার পরিচয়ই দিলে।" আমি সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে খুলিয়া বলিলাম। তিনি তাহা বিশ্বাস করিলেন না! থিয়েটারের পরবর্তী সময় আমার কাছে বিষে বিষময় হইয়া উঠিল।

পরদিন সমস্ত ক্লাশের সামনে তিনি বলিলেন, "এই ছেলেটি সাধুর শিষ্য। আমরাও তাহাকে সাধু বলিয়া জানিতাম। তোমরা শুনিয়া রাখ এই সাধুর কীর্তি। কাল সে ফোর্থ ক্লাশের টিকেট লইয়া সেকেণ্ড ক্লাশে ঢুকিতে গিয়াছিল।" আমি মরমে মরিয়া গেলাম। এটিও আমার জীবনে নিরপরাধে শাস্তি পাওয়ার আর একটি দৃষ্টান্ত।

ইহার বহু বৎসর পরে আবার বসন্ত বাবুর সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। তিনি তখন দিনাজপুর জেলা স্কুলের হেড্‌মাষ্টার। আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ হইতে দিনাজপুরে গ্রাম্যগান সংগ্রহ করিতে গিয়াছি। তখন আমার কবিতা নানা মাসিক পত্রে ছাপা হয়। আমাকে দেখিয়া তিনি বড়ই খুশী হইলেন। একদিন বাসায় নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন। তাঁহার ছোট দুইটি মেয়ে সেই বনলতা আর উমার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "তাহারা এখন এতটুকু নাই। বিবাহিতা হইয়া তাহারা এখন শ্বশুর বাড়িতে।" তিনি আমাকে একদিন তাঁর ছাত্রদের সামনে আমার জীবনের বিষয়ে বক্তৃতা করিতে বলিলেন। কি কারণে যেন বক্তৃতা দেওয়া হইল না।

ইহার বহু বৎসর পরে একবার তিনি তাঁহার ছেলেকে আমার কাছে পাঠাইয়াছিলেন। পত্রে তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন, আমি যেন চেষ্টা তদ্বির করিয়া তাহার জন্য একটি চাকরির বন্দোবস্ত করিয়া দেই। তাহাকে সঙ্গে লইয়া এ-অফিসে সে-অফিসে কত ঘুরিলাম। কিন্তু আমার মত সামান্য ব্যক্তির অনুরোধে কে তাঁহাকে চাকরি দিবে? কয়েকদিন কলি-কাতায় থাকিয়া ছেলেটি চলিয়া গেল। আজ মাষ্টার মহাশয়ের কথা

\

মনে পড়িয়া আমার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইতেছে। তিনি আমাকে ভুল বুঝিয়া যে শাস্তি দিয়াছেন সেজন্য ত তাঁব কোন দোষ নাই। আর সে সব কথা ত কবেই ভুলিয়া গিয়াছি। তাঁর ক্লাশে তিনি এমন সুন্দর করিয়া পড়াইতেন, তাঁর কাছে যে অযাচিত স্নেহ-মমতা পাইয়াছি, আমার সেকালের লেখাগুলি পড়িযা তিনি যে উৎসাহ দিতেন, এ সব কথা ভাবিয়া আমার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়। আবার যদি তাঁর ক্লাশে যাইয়া বসিতে পারিতাম; আবার যদি তাঁর সেই ছোট্ট বাড়িখানায় যাইয়া তাঁহার সামনে আমাব সেকালেব কবিতার খাতাখানি মেলিয়া ধরিতে পারিতাম, তাঁর সেই ফুটফুটে ছোট্ট মেয়ে দুইটি বনলতা আর উমা আসিয়া আবার যদি তাঁর কোল ঘেঁসিয়া এটা ওটা আব্দাব করিত, তবে যে কতই ভাল লাগিত। কিন্তু সব ভাল লাগাই ত জীবনে চিরস্থায়ী হইয়া থাকে না। শুধুমাত্র কল্পনাব জগতে সেই সব ঘটনাকে মেলিযা ধরিযা কিঞ্চিত সুখ অনুভব করা যায়। ইহাই কি কম সৌভাগ্য।

স্কুলের পথে

স্কুল হইতে আমার বাড়ি ছিল আডাই মাইল দূরে। সেখান হইতে নয়টার সময় খাইয়া স্কুলে রওয়ানা হইতাম। স্কুলের ছুটি হইত চারিটার সময়! দারুণ ক্ষুধায় তখন পেটে আগুন জ্বলিতে থাকিত। বই-পত্র বগলে করিয়া বাড়ির পথে রওয়ানা হইতাম। আমার ক্লাশের সহপাঠীদের প্রায় সকলেরই বাড়ি শহরে। তাহারা পাঁচ দশ মিনিটে বাড়ি যাইয়া নাস্তা খাইয়া স্কুলের মাঠে খেলিতে আসিত। যেদিন খেলার মাঠে বড় খেলা থাকিত তাহারা সেখানে যাইয়া খেলা দেখিত। সেই খেলা দেখার কি অপূর্ব মাদকতা! যেদিন ঈশান স্কুলের সাথে আমাদের জেলা স্কুলের খেলা হইত সেদিন আমি স্কুলের ছুটির পর বই পত্র বগলে করিয়া খেলা দেখিতে যাইতাম। খেলার উত্তেজনায় ক্ষুধার কথা মনে থাকিত না। কিন্তু খেলার শেষে যখন সেই আড়াই মাইল পথ হাঁটিয়া বাড়ি ফিরিতাম তখন দারুণ ক্ষুধায় নিজের মাংস নিজে চিবাইয়া খাইতে ইচ্ছা করিত।

বাড়ি যাইবার পথে কতদিন দেখিয়াছি রাস্তার পাশে কোথাও ছুতোর মিস্ত্রি নৌকা গড়াইতেছে। বাটালের আঘাতে নানা মাপের কাঠ কাটিয়া নৌকার সঙ্গে লাগাইতেছে। বাইশ দিয়া কাঠ চাঁছিয়া সমান করিতেছে। বাইশের আগায় চাঁছিগুলি নাচিতে নাচিতে মিস্ত্রির পায়ের কাছে আসিয়া জড় হইতেছে। সেই মসৃণ কাঠের উপর মিস্ত্রি বাটাল দিয়া নানা নক্সা আঁকিতেছে। মিস্ত্রির হাতের অস্ত্রগুলির সঙ্গে যেন কাঠের কত কালের পরিচিতি। মিস্ত্রি যে রূপে কাঠকে রূপ দিতে চায় আপন ইচ্ছায় কাঠ সেই রূপে রূপান্তরিত হয়। ইহা দেখিতে আমার বড়ই ভাল লাগিত। দারুণ ক্ষুধার কথা ভুলিয়া যাইতাম। পথের পাশে দাঁড়াইয়া মিস্ত্রির কাজ দেখিতাম। কাঠ যে রেন্দার আঘাতে ঘসিয়া ঘসিয়া কাটিতেছে, সেই ঘসা যেন আমি আমার বুকে অনুভব করিতাম।

বাটালের সাহায্যে কাঠ কাটিবার সময় আমার বুকের ভিতর যেন কেমন স্পন্দন অনুভব করিতাম। আজও কোথাও কোন মিস্ত্রির কাঠ-কাটা দেখিলে আমি সেই স্পন্দন অনুভব করি।

এমনি করিয়া বহুক্ষণ দেরী করিয়া আবার বাড়ির পথে রওয়ানা হইতাম। কোন কোন দিন পথের মধ্যে কোন দোকানের সামনে বান্দর-ওয়ালা বান্দর নাচায়, বৈরাগী বৈষ্টমী একতারা বাজাইয়া গান করে। এমনি কত রকমের আকর্ষণ। শহরে মাঝে মাঝে বড় রকমের খেলা হয়। ঢাকা হইতে খেলার দল আসিয়া ফরিদপুরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে। কলিকাতা হইতে বড় বড় বক্তারা আসিয়া বক্তৃতা করেন। শহরের ছেলেরা বাড়ি হইতে খাইয়া আসিয়া ম্যাচ খেলা দেখে, বক্তৃতা শোনে। আমি অভুক্ত অবস্থায় বই-খাতা বগলে করিয়া খেলার মাঠে যাই। বক্তৃতা শুনি। তারপর বাড়ি ফিরিবার পথে ক্ষুধায় পেট জ্বলিতে থাকে। অনেক বলিয়া কহিয়া কালে ভদ্রে যেদিন পিতার নিকট হইতে একটি পয়সা আনিতে পারিতাম, তাই দিয়া মুদির দোকান হইতে এক পয়সার চিড়া আর একটু ফাউ চিনি লইয়া খাইতে খাইতে বাড়ির পথে রওয়ানা হইতাম। যেদিন মুদি চিড়ার সঙ্গে একটু ফাউ চিনি দিত না সেদিন এক পয়সার ছোলা ভাজা কিনিয়া চিবাইতে চিবাইতে বাড়ি যাইতাম। ছোলা ভাজা বা চিড়া খাইতে অনেকক্ষণ লাগিত। ততক্ষণে বাড়ি আসিয়া পৌঁছিয়া যাইতাম।

ফরিদপুর কাছারীতে একটি লোক ভাল নারকেলের বরফি বিক্রয় করিত। সেই নারকেলের বরফি খাইতে যেন কেমন? একদিন দারুণ ক্ষুধার সময় নিজের পাঠ্য-বই বাঁধা দিয়া দুই আনার বরফি কিনিয়া খাইলাম। কিন্তু কোথায় পাইব পয়সা? কি করিয়া ধার শোধ করিব? কাছারীর পথে আর যাই না। বহুদিন পরে বাড়ি হইতে কোন জিনিস বাজারে বিক্রি করিয়া দুই আনা সংগ্রহ করিয়া দোকানীর নিকটে গেলাম। দোকানী বলিল, "তোমার দেখা না পাইয়া বইগুলি ছিঁড়িয়া ঠোঙা তৈরী করিয়াছি।" আমি মাথায় হাত দিয়া বসিলাম। বই না হইলে আমি কেমন করিয়া পরীক্ষার পড়া করিব? কয়েকদিন পর আমার বই পত্রের অনুসন্ধান করিতে আসিয়া আমার পিতা এই বই খোয়ানোর কাহিনী জানিতে পারিলেন। তিনি আমাকে অনেক বকাবকি করিয়া বইগুলি আবার কিনিয়া দিলেন।

বাড়ি আসিয়া প্রায়ই ডাল-ভাত অথবা শাক-ভাত খাইতাম। সন্ন্যাসীর ভক্ত হইয়া সেই যে আমি মাছ-মাংস পেঁয়াজ-রসুন খাওয়া ছাড়িয়া দিলাম এখনও সেই কৃচ্ছ্র সাধনা চলিতেছে। ডাল সিদ্ধ হইলে তাহাতে লবণ, মরিচ মিশাইয়া ঘুঁটিয়া মা তাহার খানিকটা আমার জন্য রাখিয়া দিতেন। বাকিটাতে পেঁয়াজ, রসুন মিশাইয়া আর আর সকলের জন্য ডাল রান্না করিতেন। সারাদিন পর বাড়ি আসিয়া খাওয়ার পরে সাত রাজ্যের ঘুম আসিয়া আমাকে পাইয়া বসিত। তবু পাঠ্য বইগুলি সামনে মেলিয়া ভাল ছেলের মতই পড়িতে বসিতাম। কখন যে ঘুমাইয়া পড়িতাম টেরও পাইতাম না। ভোর না হইতেই আমার পিতা আমাকে জাগাইয়া দিয়া নামাজ পড়িতে বসিতেন। মুখ হাত ধুইয়া এক সাজি মুড়ি চিবাইয়া বই খুলিয়া বসিতাম। সকালে মাত্র ঘণ্টা দুই সময় আছে। তার পরেই স্কুলে যাইতে হইবে। রাত্রে পড়া করি নাই। অত অল্প সময়ের মধ্যে সব পড়া তৈরী হইত না। বাড়িতে করনীয় অঙ্কগুলিও করা হইত না। ট্রানস্লেশনও লেখা হইত না। নয়টা বাজিতেই স্নান খাওয়া সারিয়া স্কুলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতাম। আমাদের বাড়ি হইতে শহরে যাওয়ার রাস্তায় বর্ষার দিনে হাঁটু সমান কাদা হইত। সেই কাদা ঠেলিয়া দুই মাইল পথ। তারপর শহরের পাকা রাস্তা। ছাতি ছিল না। বৃষ্টি-

বাদলের দিনে জামা-কাপড় ভিজিয়া যাইত। সেই ভিজা জামা-কাপড় গায়েই শুকাইত। চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রখর রৌদ্রে এত পথ হাঁটিয়াই স্কুলে যাওয়া-আসা করিতাম। এ জন্য কেহই আমার প্রতি এতটুকুও সহানুভূতি দেখাইত না। আমার ফুপাত ভাই মোহন মোল্লার বাড়ি ছিল শহর হইতে পাঁচ মাইল দূরে রঘুয়াপাড়া গ্রামে। সেখান হইতে তাহার ছেলে কমিরুদ্দীন রোজ স্কুলে আসিত। তাহাদের বাড়িতে একটি ছেলে জায়গীর থাকিত। সেও অতদূর হইতে স্কুলে আসিত। এ ছেলেটির নাম ছিল লতিফ। খুব গরীব লোকের ছেলে। পড়াশুনা করিবার কি তার আগ্রহ! প্রতিদিন দশ মাইল রাস্তা স্কুলের পথে আসা যাওয়া করিয়া তাহার অতটুকু বালক-জীবনের সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হইয়া যাইত। কিন্তু তবু পড়া ছাড়িত না। আমি কমিরুদ্দীন আর লতিফ তিনজনে বসিয়া কত রকম আলাপ-আলোচনাই না করিতাম। লতিফ বলিত, "দেখ ভাই! স্কুলের পড়া না পারিলে মাষ্টারেরা আমাকে মারেন। পরীক্ষায় ফেল করিলে অভিভাবকেরা গাল দেন। কিন্তু কেহই আমাকে পড়া শিখাইয়া দেন না। যদি শহরে থাকিতে পারিতাম, ক্লাশের ভাল ছাত্রদের বাড়ি যাইয়া পড়া শিখিয়া লইতাম। এতদূরে থাকিয়া তাহাও পারি না। কিন্তু পড়িয়া আমাকে পাশ করিতেই হইবে। লেখাপড়া জানিয়া যাঁহারা বড় বড় চাকরি পাইয়া নানা সুযোগ-সুবিধা অধিকার করিয়াছেন, আমাকে তাঁহাদের সমকক্ষ হইতে হইবে।"

কেরোসিনের কুপী জ্বালাইয়া লতিফ রাত বারোটা পর্যন্ত পড়িত। কিন্তু পড়িলে কি হইবে? যে ভুলের জন্য সে গত বৎসর ফেল করিয়াছিল, সেই ভুলই সে বার বার পড়িয়া অভ্যাস করিত। আগামী বৎসর ফেল করিতে তাহার কোনই বেগ পাইতে হইত না। এমনি করিয়া কয়েক বৎসর ফেল করিয়া লতিফ যে কোথায় চলিয়া গেল আজ ভাল করিয়া মনে পড়িতেছে না।

কমিরুদ্দীনও কয়েকবার ফেল করিয়া পড়া ছাড়িয়া দিল। আজ মনে পড়িতেছে, আমার পিতা হিতৈষী স্কুলে মাষ্টারী লইলেন, তিনি আমাদের গ্রামের বহু ছেলেকে আনিয়া স্কুলে ভর্তি করিয়া দিয়াছিলেন। বরান খাঁ, ইসমাইল, ফইজদ্দীন মোল্লা, ভুমুরদ্দী এই কয়জনের নাম মনে পড়িতেছে।

ইহারা সকলেই কৃষাণ-ঘরের ছেলে। স্কুলের অধিকাংশ ছাত্রই ছিল শহরের। তাহাদের পিতা-মাতা লেখাপড়া জানিত। স্কুলে মাষ্টার পড়া দিয়া দিলে বাড়িতে যাইয়া অভিভাবকদের সাহায্য সেই পড়া তৈরী করিয়া স্কুলে আসিত। আর গ্রামের ছেলেরা সন্ধ্যাবেলায় কেরোসিনের কুপী জ্বালাইয়া বই-পত্র খুলিয়া বসিয়া থাকিত। কিন্তু কে তাহাদিগকে পড়া শিখাইয়া দিবে? পুস্তকে-লিখিত সেই অজানা বিদ্যার সঙ্গে বহুক্ষণ বৃথা লড়াই করিয়া তাহারা ঘুমাইয়া পড়িত। তাহারা যে চেষ্টা করিয়াও পড়া তৈরী করিতে পারে নাই স্কুলের কেহই তাহা বুঝিত না। প্রতিদিন বেঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া, নিল ডাউন, হাফ নিল ডাউন হইয়া শিক্ষকদের বেত্রাঘাত খাইয়া তাহাদের স্কুল-জীবন গ্রাম্য-মৌলবী সাহেব বর্ণিত দোজখের মত মনে হইত। এইভাবে বহু লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করিয়া একে একে তাহারা সকলেই পড়া ছাড়িয়া দিল। আজও গ্রাম-দেশের কোন পাঠশালা বা স্কুলে গেলে এই দৃশ্যই সকলের আগে আমার চোখে পড়ে। প্রত্যেক অবৈতনিক পাঠশালার শিশুশ্রেণীতে কমসে কম ষাট/সত্তরজন ছাত্র ভর্তি হয়। এই ছাত্র সংখ্যা ধীরে ধীরে কমিতে কমিতে পঞ্চম শ্রেণীতে আসিয়া সাত/আটজনে পরিণত হয়। ইহার কারণ অনুপযুক্ত শিক্ষকেরা শিশুশ্রেণীর ছাত্রদের ভালমত পড়াইতে জানে না। বাঙলা ভাষায় যুক্ত বর্ণসমেত প্রায় সাড়ে পাঁচশত বর্ণমালা। ইসলামী শিক্ষার প্রতি অতি আগ্রহের জন্য বহু প্রাথমিক বিদ্যালয়েই আরবী অথবা উর্দু বর্ণমালা শিক্ষা দেওয়া হয়। আগেই বলিয়াছি আরবী বর্ণমালা শব্দের এক এক স্থানে এক এক রূপ গ্রহণ করে। সেই জন্য প্রায় দুইশত বর্ণমালা না শিখিলে উর্দু পড়া যায় না। তাহা ছাড়া উর্দু পুস্তকে আকার-উকার থাকে না বলিয়া এই ভাষা জানা না থাকিলে অথবা কাহারও সাহায্য না লইলে উর্দু পুস্তক পড়া যায় না।

বর্তমান শিক্ষা প্রণালীতে বর্ণমালা শিখাইবার যে সব নতুন নতুন নিয়ম আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা পাঠশালার শিক্ষকেরা জানে না। কেহ কেহ জানিলেও ছাত্রদিগকে শিখাইতে সেই সব প্রণালী অবলম্বন করেন না। তাঁহারা ছাত্রদিগকে পড়া দিয়া দেন। পড়া না পারিলে তাহাদের প্রতি নানা প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা করেন। শুধুমাত্র বর্ণমালার অত্যাচারেই

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি হইতে প্রতি বৎসর শতকরা নব্বইজন ছাত্র স্কুল হইতে বাহির হইয়া যায়। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আমাদের রাষ্ট্র প্রতি বৎসর কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেন। এই টাকাটা আসে গ্রাম্য চাষীদের দেয় শিক্ষাকর হইতে। যাহারা এই ব্যয় বহন করে তাহাদের ছেলেরা অধিকাংশই ইহার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হয়। এই অবিচার আর কত দিন চলিবে? আমাদের প্রস্তাব, প্রাইমারী স্কুলগুলিতে বাঙলা ছাড়া আর কোন ভাষাই যেন শিক্ষা দেওয়া না হয়। ধর্মীয় শিক্ষার জন্য যেন বাঙলা ভাষাই ব্যবহার করা হয়। আর বর্ণমালা শিখাইতে শিক্ষকেরা যাহাতে আধুনিক শিক্ষা প্রণালী গ্রহণ করেন, কর্তৃপক্ষ যেন সেইদিকে নজর দেন।

যাক এ সব কথা। এত অসুবিধার মধ্যেও আমার কিন্তু পড়িবার খুব ইচ্ছা হইত। কিন্তু কে আমাকে পড়াইয়া দিবে? আমার পিতা ইংরেজী জানিতেন না। ইংরেজীতেই আমি সব চাইতে কাঁচা। জেলা স্কুলে যাইয়া ভাল ভাল ছেলেদের সঙ্গে মিশিবার চেষ্টা করিতাম। গ্রীষ্মের ছুটির সময় মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিতাম, আমিও তাহাদের মত পরীক্ষায় ভাল পাশ করিব। গ্রীষ্মের ছুটির সময় প্রতিদিন চৌদ্দ পনর ঘণ্টা করিয়া পড়িবার রুটিন তৈরী করিয়া লইতাম। ভাবিতাম এইভাবে যদি একমাস পড়িতে পারি তবে আমিও ক্লাশে প্রথম হইতে পারিব। কিন্তু আম গাছে আম পাকিয়া লাল হইত। পাখির বাসায় নতুন ছানা চিঁচিঁ করিত। ছোট গাঙের পুলের ধারে সমবয়সীরা বড়শী দিয়া বামমাছ ধরিত। এ সব আকর্ষণ আমার মনটিকে সেই রুটিনের ছোট্ট কুঠুরীগুলি হইতে কাড়িয়া আনিত। ছুটি ফুরাইয়া গেলে মাথায় হাত দিয়া বসিতাম! হায় হায় কি করিয়াছি! এই এক মাসে যা কিছু পড়া ছিল তাও যে ভুল হইয়া গিয়াছে। স্কুল খুলিলে আবার ভাল ছেলেদের সঙ্গে মিশিতে চেষ্টা করিতাম।

ধীরেনদের বাসায়

আমার জামা কাপড় ভাল ছিল না। পিতা খলিফাদের দোকান হইতে একটি মাত্র পকেটওয়ালা যে জামা কিনিয়া দিতেন, তাহা অন্যান্য ছাত্রদের হাল-ফ্যাশনের জামার পাশে একেবারে বেমানান দেখাইত। সেই সঙ্গে আমিও বেমানান হইয়া অন্যান্য ছাত্রদের মধ্যে একটা অবাঞ্ছিত ব্যক্তির মত অতি জড়সড় হইয়া থাকিতাম। তাই ক্লাশের ভাল ছেলেরা দূরে থাক কোন ছাত্রই আমার সঙ্গে মিশিত না। একমাত্র ধীরেন আমার সঙ্গে মিশিত। আমার হাতের লেখা ভাল ছিল না। আমি খুব আস্তে আস্তে লিখিতাম। ক্লাশের নোট টুকিয়া লইতে শিক্ষকেরা যে শ্রুতিলেখন দিতেন তাহাও আমি টুকিয়া লইতে পারিতাম না। ধীরেন তাহার নোট খাতাগুলি আমাকে দিত। সেই খাতা হইতে বাড়ি বসিয়া আমি নোট টুকিয়া লইতাম। এইজন্য প্রায়ই ধীরেনদের বাসায় যাওয়া উপলক্ষে কি করিয়া ধীরেনের মার সঙ্গে পরিচিত হইলাম তাহা পূর্বে বলিয়াছি।

এই ভদ্রমহিলা বড়ই স্নেহশীলা ছিলেন। একটু বেশী কথা বলিতেন। তাঁর সেই বেশী কথার আমি মনযোগী শ্রোতা ছিলাম। তাহা ছাড়া তাঁর ছেলের বন্ধু বলিয়া তিনি আমাকে ছেলের মতই ভালবাসিতেন। একবার গ্রীষ্মের ছুটির সময় আমি তাঁহাকে বলিলাম, "মা! বাড়ি বসিয়া আমার পড়াশুনা হয় না, আপনি যদি অনুমতি করেন, ছুটির কয়টি দিন আপনাদের এখানে থাকিয়া পড়াশুনা করিব। প্রতিদিন বাড়ি হইতেই আমি খাইয়া আসিব। সেজন্য আপনাকে কিছু করিতে হইবে না।" তিনি বলিলেন, "বেশ ত! আমার ছেলের সঙ্গে আসিয়া তুমি পড়াশুনা করিও।"

বই-পত্র লইয়া ধীরেনদের বাড়িতে আসিলাম। রাত্রে এখানে থাকিয়া পড়াশুনা করিতাম। সকালে এগারোটা বারোটার সময় বাড়ি যাইয়া খাওয়া-দাওয়া করিতাম। আবার সন্ধ্যার আগে খাইয়া এখানে আসিতাম।

আমি বালিশহীন বিছানায় শয়ন করিতাম। সুতরাং ধীরেনদের তক্তাপোষের উপর শুইয়া রাত্রে ঘুমাইতাম। আমার নিজস্ব কোন বিছানাপত্রের প্রয়োজন হইত না।

রাত্রে শুইবার আগে আসন করিয়া বসিয়া সন্ন্যাসীর নিকট শেখা সাধন-প্রণালীগুলি অভ্যাস করিতাম। ইহাতে বাড়ির সকলেই আমার প্রতি আকৃষ্ট হইত। ধীরেনের এক খুড়াত ভাই ছিলেন শ্রীমনমোহন বন্দোপাধ্যায়। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করিতেন। আমার পড়া বলিয়া দিতেন। ধীরেনদের বাসায় আসিয়া যে যে বিষয়ে আমি কাঁচা ছিলাম গ্রীষ্মের ছুটির একমাসে তাহা শিখিয়া ফেলিলাম।

ধীবেনদের বাড়িতে বাঙলা বই-এর খুব ভাল একটি লাইব্রেরী ছিল। এখানে হিতবাদী প্রকাশিত একখানা রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী ছিল। পড়ার অবসরে সেই পুস্তকখানা আমি পড়িয়া শেষ করিলাম। তারপর মোহিত মোহন সম্পাদিত রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী পড়িলাম। সব বুঝিতে পারিতাম না। কিন্তু ভাল লাগিত। ধীরেনের দাদারা ভাল কবিতা আবৃতি করিতে পারিতেন, বিশেষ করিয়া ধীরেনের বড় দাদা শ্রীইন্দ্রমোহন বন্দোপাধ্যায়। তিনি মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের বই হইতে আবৃত্তি করিতেন। পুরাতন ভৃত্য, বধু, সোনার তরী, দুই বিঘা জমি প্রভৃতি কবিতাগুলি তিনি অতি সুন্দরভাবে আবৃত্তি করিতেন। মাঝে মাঝে থিয়েটারের বই হইতে অংশ বিশেষ য়্যাক্ট করিযা শুনাইতেন। সেই পড়ার কোন তুলনা মেলে না। মাঝে মাঝে তিনি সেকস্‌পিয়রের নাটক হইতেও অংশ বিশেষ পড়িয়া শুনাইতেন। তিনি খুব রাগী মানুষ ছিলেন। কাছে ভিড়িবার উপায় ছিল না। কিন্তু তিনি যখন কবিতা বা নাটকের অংশ বিশেষ আবৃত্তি করিতেন তখন তিনি আমার অন্তরের অন্তরঙ্গ হইয়া পড়িতেন।

বাড়ি যাইয়া পদ্মার তীরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার সেই আবৃত্তির অংশগুলির অনুকরণ করিতাম। সঙ্গে বই থাকিত না। ইচ্ছামত বানাইয়া বানাইয়া ইন্দ্রদাদার মত আবৃত্তি করিতে চেষ্টা করিতাম। ইহাতে আমার বাঙলা উচ্চারণের সমস্ত জড়তা কাটিয়া গেল।

আমাদের পড়াশুনা শেষ হইলে ধীরেনের খুড়াত ভাই রাসমোহন দাদা নভেল পড়িয়া শুনাইতেন। মন্ত্রশক্তি, দিদি, শরৎচন্দ্রের 'দত্তা' প্রভৃতি

বহু বই আমরা এইভাবে রাত জাগিয়া উপভোগ করিয়াছিলাম।

ধীরেনের বাবা খুব অল্প খরচে সংসার চালাইবার পক্ষপাতি ছিলেন। তিনি প্রতি সপ্তাহের খরচের জন্য একটি নির্দিষ্ট অর্থ ধীরেনের মায়ের হাতে দিতেন। মা আবার সেখান হইতে কিছু বাঁচাইয়া জমা করিতেন। প্রতি সপ্তাহে কতটা কেরোসিন তৈল ব্যবহার হইবে তাহা তিনি পরিমাণ করিয়া লইতেন।

ধীরেন আর তাহার দাদারা উপর তলায় থাকিত। রাসমোহন দাদা নীচের তলায় থাকিতেন। আমরা যখন অনেক রাত্রে নভেল পড়িতাম মা পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া আমাদিগকে নভেল পড়িতে দেখিয়া আমাদের হারিকেন বাতিটি নিবাইয়া দিয়া যাইতেন, তখন হয়ত নভেলের নায়িকা এমন একটি অবস্থার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, তারপর কি হইবে জানিবার জন্য আমরা নিঃশ্বাস পর্যন্ত বন্ধ করিয়া আছি। মা বাতি নিবাইয়া দিলে তাঁকে দেখাইয়া দেখাইয়া আমরা শুইয়া পড়িয়া কৃত্রিম নাক ডাকাইতাম। তিনি অনেকক্ষণ আড়ালে থাকিয়া তাহা নিরীক্ষণ করিয়া উপরে চলিয়া যাইতেন। তখন আমরা ধীরে ধীরে দেয়াশলাই জ্বালাইয়া হারিকেন ধরাইতাম। তারপর রাসমোহন দাদা আবার পড়া আরম্ভ করিতেন। এইভাবে কোন কোন সময় আমরা সারারাত জাগিয়া নভেল পড়িতাম।

মা সংসারের খরচ হইতে বাঁচাইয়া অনেক টাকা জমাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি খুবই সরলপ্রাণা মহিলা ছিলেন। কেহ আসিয়া মা বলিয়া ডাকিলে তিনি গলিয়া যাইতেন। আনন্দী নামে এক গাড়োয়ান মার নিকট হইতে গাড়ী ও ঘোড়া কিনিবার জন্য ছয়শত টাকা ধার লয়। সেই টাকা মা আর ফিরিয়া পান নাই। এরূপ বহু সন্তানের অত্যাচারে মায়ের সঞ্চিত অর্থ সবই ফুরাইয়া যাইত। মা কয়েকদিন তাহাদের গালমন্দ করিতেন। তাহারা এ-পাড়ার ধার দিয়াও যাইত না। মা আবার কঠোরতর ভাবে সংসারের খরচ কমাইয়া টাকা সঞ্চয় করিতেন। এই মা'টি আমাকে বড়ই ভালবাসিতেন। সামান্য সামান্য কয়েকটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। তাতেই বুঝা যাইবে তিনি এই পরের ছেলেটিকে কতই ভালবাসিতেন। বাড়িতে পূজা-পার্বণে যে বিশেষ খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হইত এমন নয়। তবুও সেখানে সামান্য কিছু উপচারের ব্যবস্থা হইলে

মা আমাকে তাহার ভাগ দিতেন। সেবার কি একটা পূজার সময় বাজার হইতে কয়েকটি রসগোল্লা আনা হইয়াছিল। ছেলে-মেয়েরা প্রত্যেকেই একটা করিয়া রসগোল্লা পাইল। আমার রসগোল্লাটি আমাকে দিবার জন্য মায়ের মনে ছিল না।

আমি তখন শুইয়া আধঘুমে। বাতি জ্বালাইয়া রাসমোহন দাদা পড়িতেছেন। মা আসিয়া রাসমোহন দাদাকে বলিলেন, "সবাইকে মিষ্টি দেওয়া হইয়াছে, সাধুকে দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। ওকে ডাক দিয়া দাও।" ঘুমন্ত কাউকে ডাক দেওয়া পাপ। নিজে সেই পাপ না করিয়া মা রাসমোহন দাদাকে দিয়া সেই পাপ করাইতে চাহিলেন। রাসমোহন দাদা বলিলেন, "ও ঘুমাইয়া আছে। ওকে ডাক দিয়া ঘুম ভাঙাইয়া কাজ নাই।" মা বলিলেন, "না। না! রাসমোহন! এই মিষ্টিটা ওকে না দিলে আমার সারারাত ঘুম হইবে না।" আমি শুইয়া শুইয়া সবই শুনিতেছিলাম। রাসমোহন দাদা দুই এক ডাক দিতেই আমি উঠিয়া বসিলাম। মা অতি স্নেহের সঙ্গে একটি রসগোল্লা আমার হাতে দিলেন।

মিষ্টিটি খাইয়া শুইয়া শুইয়া কত কথাই ভাবিতে লাগিলাম। সেই সামান্য একটি রসগোল্লার কিই বা দাম। কিন্তু ইহার ভিতর দিয়া মায়ের যে মমতাবোধের পরিচয় পাইলাম তাহা আমাকে আকুল করিয়া তুলিল। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, এই মায়ের যে-কোন আদেশের জন্য আমি জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারি। প্রতিদিন সন্ধ্যার আগে বাড়ি হইতে খাইয়া আসিতাম। যেদিন মুষলধারে বৃষ্টি হইত, বাড়ি যাইতে পারিতাম না; মা আমাকে ডাকিয়া বলিতেন, "সাধু! আজ তুমি আমাদের এখানে খাইবে।"

আমি কোনদিনই রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করি নাই। একবার মায়ের এক মেয়ের কলেরা হইল। মেয়েটির বয়স ছয়-সাত বৎসর। খুব সম্ভব তার নাম ছিল বেলা। সেবা-সমিতির বেরতীদাদা, অমিয়দাদা আসিলেন রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করিতে। আমিও তাহাদের সঙ্গে লাগিয়া গেলাম! কাহারও বাড়িতে কোন লোকের সেবা-শুশ্রূষা করিতে মেথরের কাজ হইতে আরম্ভ করিয়া রোগীর ঔষধ-পথ্য খাওয়ান পর্যন্ত সব সেবা-সমিতির সভ্যদিগকেই করিতে হইত। কলেরা রোগী দশ-পনর মিনিট অন্তর

পায়খানা করে, বমি করে। তাহা কখনো নেকড়ায় ধরিয়া কখনো হাতে ধরিয়া আমরা সাফ করিয়া দিতাম। মাঝে মাঝে পার রেকটাল সেলাইন দিতে হইত। এই কাজে রেবতীদাদা খুবই পারদর্শী ছিলেন। সেবা-সমিতির কাজ করিতে করিতে পরে তিনি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার হইয়া ছিলেন। তখনকার দিনে কুলীন হিন্দু সমাজে মেয়ের প্রতি তত দরদ ছিল না। এই সুন্দর মেয়েটির অসুখে তাহার ভাই-বোন মাতা-পিতা কেহই সেবা করিতে আসিল না। তাহারা কেহ রোগীর সেবা করিতেও জানিত না। কলেরা রোগীকে সেবা করা আরও বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। এইজন্য বাড়ির লোকেরা রোগিণীর স্পর্শ বাঁচাইয়া দূরে দূরে থাকিতেন। মেয়ের বাবা দিনে তিন চারবার আসিয়া রোগিণীর খোঁজ-খবর লইতেন। তিনি ডাক্তারকে বলিতেন, "যত টাকা লাগে আমি দিব। আমার বেলাকে ভাল করিয়া দাও।" মা এ কাজে ও-কাজে অবসর পাইলেই আসিয়া খবর লইতেন, "আমার বেলা কেমন আছে?" কিন্তু মেয়েকে স্পর্শ করিতেন না! রাত্রে শুইতে যাইবার আগে মেয়ের বিছানার সামনে দাঁড়াইয়া গলায় কাপড় লইয়া বলিতেন, "মা কালী! তোমার সামনে জোড়া-পাঁঠা বলি দিব। আমার বেলাকে ভাল করিয়া দাও।" তারপর বার বার মা কালীকে প্রণাম করিয়া উপর তলায় চলিয়া যাইতেন। আমরা এই জোড়া-পাঁঠা বলি দেওয়ার ব্যাপার লইয়া অনেক হাসি-তামাসা করিতাম। অমিয়দাদা বলিতেন, "মেয়ে ভাল হইয়া উঠিলে মা কালী নিশ্চয়ই এই জোড়া-পাঁঠা পাইবেন না!"

সারারাত জাগিয়া আমরা বেলার দেখাশুনা করিতাম। মাঝে মাঝে তাহার হিক্কা উঠিত। নাড়ি বন্ধ হইয়া যাইত। হাত-পা ঠাণ্ডা হইত। আমরা আগুনে নেকড়া গরম করিয়া তাহার হাত পা সেঁকিয়া দিতাম। রোগিণীর অবস্থা খুব খারাপ দেখিলে অটল ডাক্তারকে পাশের ঘর হইতে ডাকিয়া আনিতাম। তিনি রোগিণীর চিকিৎসার জন্য বাড়ির কর্তা কর্তৃক নিয়োজিত হইয়াছিলেন।

এইরূপে চার-পাঁচদিন দারুণ রোগের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করিয়া বেলা ভাল হইয়া উঠিল। অমিয়দাদার কথাই ঠিক। এতদিনও বোধ হয় এ-বাড়ি হইতে কালী-মাতার জোড়া-পাঁঠা পাওয়া মুলতবী আছে।

বেলা সারিয়া গেলে এই বাড়িতে আমি সকলের আরও প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িলাম। মা বার বার বলিতেন, "সাধু! তোমার সেবায়ই আমার বেলাকে ফিরিয়া পাইয়াছি।" ইহার পর এই বাড়িতে কাহারও কোন অসুখ হইলে আমি তাহার সেবার ভার গ্রহণ করিতাম।

মা বড়ই শুচিবাইগ্রস্ত মেয়ে ছিলেন। চৌকির এক কোণে আমি বসিয়া আছি। অন্য কোণে তাহার এক ছেলে যদি মাকে হঠাৎ ছুঁইয়া দিত তিনি রাগিয়া বলিয়া উঠিতেন, "তুই মুচি মোছলমান ছুঁইয়া আমার গায়ে হাত দিলি। এখনই আমাকে স্নান করিতে হইবে।" এই কথা শুনিয়া আমার বুকের মধ্যে ছ্যাঁত করিয়া উঠিত। মানুষকে মানুষ এমন ভাবে অপমান করিতে পারে! একবার মাঘ মাসে রাত দশটার সময় তাঁহার একটি ছেলে এইভাবে তাঁকে ছুঁইয়া দিল। তিনি তাহাকে নানা ভাবে গাল পাড়িতে পাড়িতে সেই শীতের রাত্রে স্নান করিয়া আসিলেন। লজ্জায় অপমানে আমি মরমে মরিয়া গেলাম। একবার মনে হইল, এখনই বই-পত্র লইয়া এখান হইতে চলিয়া যাই। কিন্তু চলিয়া যাইব কোথায়? পদ্মায় আমাদের বাড়ি ভাঙ্গিয়াছে। অপরের বাড়ির একখানা মাত্র ঘরে আমার মা-বাবা ভাই-বোনেরা কোন রকমে জড়সড় হইয়া থাকেন। সেখানে পড়িব কোথায় বসিয়া? এই বাড়িতে সভ্যতা, কৃষ্টি। এখানে থাকিলে পড়াশুনা ভাল হয়। লেখাপড়া শিখিয়া আমি বড় হইব। দেশ-জোড়া নামকরা কবি হইব। এই অপমানের অগ্নি-দাহনে পুড়িয়া আমি জীবনকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিব। মনে মনে মহৎ লোকদের নাম জপ করি। প্রথম-জীবনে আমার চাইতেও কত অপমান তাঁহাদের সহ্য করিতে হইয়াছে।

এই ভদ্রমহিলা ছিলেন কলিকাতার মেয়ে। তাঁর দেশে হয়ত মুচি মোছলমান কথাটি একসঙ্গে ব্যবহৃত হইত। সেই অভ্যাস মতই তিনি উহা বলিতেন। প্রথা হিসাবে ছোঁয়াছুঁয়ির কঠোরতা তিনি মানিতেন সত্য কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি মুসলমানদের ঘৃণা করিতেন না। তাঁহার স্বাভাবিক স্নেহপ্রবন মাতৃ-হৃদয় এত ছোঁয়াছুঁয়ি সত্বেও আমার মত আরও কয়েকটি মুসলমান ছেলেকে আপন করিয়া লইয়াছিল। আজকাল ছোঁয়া-ছুঁয়ি মানে না এরূপ বহু হিন্দুর মধ্যে যে কঠোর সাম্প্রদায়িকতা দেখা

যায় তখনকার দিনে এই ছুতমার্গগ্রস্ত হিন্দুদের মধ্যে তাহা ছিল না। বাহিরের এই নানারকমের প্রথা ও .নিষেধের বেড়া ভাঙ্গিয়া মাঝে মাঝে কাহারও কাহারও স্নেহ-মমতা শত ধারায় অপরের প্রতি প্রবাহিত হইত। আমার এই মা'টি তাঁহাদেরই একজন ছিলেন।

কেন জানি না, সেদিন আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, নিজের সেবা-যত্ন দিয়া এই মহিলাটিকে শুধু আমি ছুতমার্গ হইতে মুক্ত করিব না। একদিন তিনি আমার হাতে খাদ্য পর্যন্ত গ্রহণ করিবেন।

সেই সুযোগ পাইতে বেশী দিন দেরী হইল না। একবার মায়ের খুব জ্বর হইল। যে ঘরে মা থাকিতেন সে ঘরে আমার যাওয়া নিষেধ ছিল। আমি দরজার সামনে বসিয়া মায়ের কাতরানী শুনিতাম।

তিনি ঘরের মেঝেয় শয়ন করিতেন। উপরে পালঙ্কের উপর তাঁর স্বামী শ্রীশবাবু থাকিতেন। তিনি মোটেই ছুতমার্গ মানিতেন না। একদিন তিনি আমাকে দরজার সামনে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন, "সাধু! তুমি ভিতরে আস। দরজার কাছে বসিয়া আছ কেন?" সেদিন হইতে আমি ভিতরে যাইবার হুকুম পাইলাম। আমি মায়ের পাশে বসিয়া একখানা হাত-পাখা লইয়া মাকে বাতাস করিতে লাগিলাম।

এ-বাড়িতে অসুখে-বিসুখে কেহ কাহাকে বড় একটা দেখাশুনা করিত না। তাঁহার এই অসুখে ছেলে-মেয়েরা কেহই মায়ের কাছে আসিয়া সেবা-শুশ্রূষা করিল না। জ্বরের ঘোরে মা আমাকে দেখিতে পাইয়া বড়ই খুশী হইলেন। আমাকে বলিলেন, "সাধু! তুমি আসিয়াছ। আমার মাথাটা ভীষণ ধরিয়াছে। তুমি একটু টিপিয়া দাও।" আমি মায়ের মাথাটা আস্তে আস্তে টিপিয়া দিতে লাগিলাম। ইতিপূর্বে সেবা-সমিতির বন্ধুদের সঙ্গে আরও বহু রোগীর সেবা করিয়া সেবার হাত আমার বেশ পাকা হইয়া উঠিয়াছিল। দক্ষ হাতে মাথা টিপিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই মায়ের মাথা ব্যথা সারাইয়া দিলাম।

রাত্রে মায়ের বিছানার পাশে বসিয়া আছি। দারুণ জ্বরের ঘোরে মা কাঁপিতেছেন। আর ঘন ঘন পিপাসা হইতেছে। এতদিন তিনি উঠিয়া কলসী হইতে পানি গড়াইয়া লইতে পারিতেন। আজ আর পারিতেছেন না। মা আমাকে বলিলেন, "বাবা সাধু! তুই আমার পরজনমের ছেলে

ছিলি। অথবা আমিই তোর মেয়ে ছিলাম। তোর হাতে জল খাইলে আমার জাতি যাইবে না। তুই কলসী হইতে জল ঢালিয়া আমার মুখে দে।" আমি নিকটের কলসী হইতে পানি ঢালিয়া মায়ের মুখে দিলাম। টেম্পারেচর লইয়া দেখিলাম, জ্বর ১০৫—এ উঠিয়াছে। বালতি ভরিয়া পানি আনিয়া মায়ের মাথা ধোয়াইয়া দিলাম। তারপর নেকড়া ভিজাইয়া মাথায় জলপট্টি দিতে লাগিলাম।

পরদিন হইতে রোগিণীর যাহা যাহা কাজ– ঔষধ খাওয়ানো, মাথা ধোয়ানো সবকিছু আমার উপর পড়িল। সকালে ঠাকুর বাটি ভরিয়া বার্লি আনিয়া দিল। মা বলিলেন, "বাবা! তোর হাতে যখন জল খাইয়াছি তখন বার্লি খাইলে আর কি ক্ষতি হইবে?" আমি বার্লির বাটি আনিয়া চামচে করিয়া ধীরে ধীরে মাকে খাওয়াইয়া দিতে লাগিলাম। সাত-আট দিন পরে মা ভাল হইয়া উঠিলেন। তারপর চার-পাঁচ দিন কাটিয়া গেল। যে চৌকিতে বসিয়া আমরা পড়াশুনা করিতাম, সেই চৌকিতে বসিয়া মাঝে মাঝে তিনি আসিয়া আমাদের সঙ্গে গল্প-গুজব করিতেন। ভাবিলাম, তাঁর ছোঁয়াছুঁয়ির বাছবিচার বুঝি কাটিল। একদিন স্নান করিয়া আসিয়া চার পাঁচটি তুলসী পাতা মাথায় দিয়া মা আসিয়া আমাকে বলিলেন, "সাধু! আজ আমি স্নান করিয়া আসিয়াছি। এখন হইতে তুমি আর আমাকে ছুঁইবে না।"

কিন্তু এরপর হইতে আর তাঁহাকে ছোঁয়াছুঁয়ির অত বাছবিচার করিতে দেখি নাই।

ধীরেনের বাবা ছিলেন একজন অসামান্য ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন রাসভারী মানুষ। বাড়ির চাকরটি হইতে আরম্ভ করিয়া গৃহিণী পর্যন্ত তাঁহার ভয়ে সর্বদা থরহরি কম্পিত হইত। তিনি কখনো কাহারও প্রতি রাগা-রাগি করিতেন না। কাউকে কখনো মারধরও করিতেন না। তবু কেন যে অত লোক তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিত বুঝিতে পারি নাই। চোখ দুইটি ছিল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড, আজানুলম্বিত বাহু, দীর্ঘ দেহ, গায়ের বর্ণ উজ্জ্বল গৌর। এই চোখ দুইটির এমনি শক্তি ছিল যে, যখন যাহার দিকে চাহিতেন সে-ই ভয়ে দুরু দুরু করিয়া কাঁপিত। আমরা নীচের তলায় পড়াশুনা করিতাম। তিনি উপরের তলায় থাকিতেন। কোনদিন আমরা পড়াশুনা

ছাড়িয়া গল্প-গুজব করিতেছি, টের পাইয়া তিনি নীরব পায়ে উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিতেন। তাঁহার আগমনের বার্তা আগে হইতেই চাকরদের মারফৎ অথবা বাড়ির গৃহিণীর মারফৎ আমাদের কাছে আসিয়া পৌঁছিত। আমরা তাড়াতাড়ি যার যার বই লইয়া জোরে জোরে পড়িতে আরম্ভ করিতাম। তিনি নীরবে আসিয়া আলমারী হইতে কয়েকটি আইন-পুস্তক নাড়িয়া চাড়িয়া আবার উপরে চলিয়া যাইতেন। এই সময়টা আমাদের সকলের বুক ভয়ে টিপ টিপ করিত। তারপর আমরা আর গল্প-গুজব করিতে সাহস করিতাম না। তাঁহার শাসনের ধারাটি এই রকমের ছিল। বাড়ির গৃহিণী সাংসারিক প্রয়োজনে স্বামীর নিকট যাইতে সামনের ঘরের কালীর ছবিখানার সামনে গলবস্ত্র হইয়া বারবার প্রার্থনা করিয়া তবে রওয়ানা হইতেন।

কত বছর আমি এ-বাড়িতে আনাগোনা করিয়াছি। কোনদিন তাঁকে কাহারো সহিত গাল-গল্প করিতে দেখি নাই—কোনদিন কাহারো সহিত হাসি-তামাসা করিতে দেখি নাই। ছেলে-মেয়েদেরও কোনদিন কোলে লইয়া আদর করিতে দেখি নাই। পান-তামাক কোন প্রকার নেশাই তাঁহার ছিল না। বাড়িতে সামান্য একটু জিনিসেরও তিনি অপব্যয় দেখিতে পারিতেন না। যেমন পোষাক-পরিচ্ছদ না হইলে ভদ্র সমাজে চলা যায় না, তেমন পোষাক-পরিচ্ছদই তিনি তাঁর ছেলে-মেয়েদের কিনিয়া দিতেন। তিনি ফরিদপুর জেলার ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ছিলেন। কিন্তু কি ছেলে-মেয়েদের জন্য, কি নিজের জন্য কোথাও তিনি ব্যয় বাহুল্য পছন্দ করিতেন না। সন্ধ্যাবেলায় তিনি কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবের সাথে বেড়াইতে যাইতেন। তখন কি আলাপ হইত জানি না। মাঝে মাঝে তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনায় যোগ দিতেন। তিনি গভর্ণমেণ্টের উকিল ছিলেন। কয়েকটি আলমারী ভর্তি অসংখ্য আইন-পুস্তক শোভা পাইত। সেই পুস্তকগুলি তিনি তন্ন তন্ন করিয়া পড়িতেন। উপর তলায় তিনি শয়ন করিতেন। নিচের তলায় থাকিত তাঁর আইন-পুস্তকগুলি। গভীর রাত্রে প্রায়ই দেখিতাম তিনি মোমবাতি জ্বালাইয়া উপর তলা হইতে নিচে নামিয়া আসিতেন। সাত আটখানা আইন-পুস্তক কাঁধে বগলে করিয়া তিনি আবার উপরে চলিয়া যাইতেন। মাঝে মাঝে তিনি

সারা রাত্র জাগিয়া আইন-পুস্তক অধ্যয়ন করিতেন। তাই মামলায় তাঁর তুখড় বুদ্ধির কাছে অন্যান্য উকিলেরা পারিয়া উঠিতেন না।

পুলিশ ইন্‌সপেক্টরেরা কাহারও বিরুদ্ধে মিথ্যা মোকদ্দমা সাজাইয়া আনিলে তাহার প্রতি তিনি মারমুখী হইতেন। একবার এক ইন্‌স-পেক্টর কোন মামলায় গভর্ণমেণ্ট পক্ষীয় সাক্ষীদিগকে তাঁহার বাড়িতে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। সেই ইন্‌সপেক্টরকে তিনি এমনই ধমকাইয়া-ছিলেন যে তাহার জীবনে বোধ হয় সে এমন ধমক খায় নাই। তিনি বলিতেন, "যাহা সত্য, সাক্ষীরা তাহাই আদালতে বলিবে। সাক্ষী-দিগকে কি বলিতে হইবে তাহা শিখাইয়া দিবার জন্য তিনি গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত হন নাই।"

তাঁহার বাড়িতে প্রায়ই দুইজন করিয়া ছাত্র আহার ও বাসস্থান পাইত। তাহারা ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের পড়াইত। দূর সম্পর্কীয় ভাইপোরাও কেহ কেহ তাঁহার বাড়িতে থাকিতেন।

তাঁহাকে কখনো কাহারো জন্য শোক করিতে দেখি নাই। এক-বার তাঁর একটি ছোট মেয়ে মরিয়া গেল। তখনও তাঁহার চোখে এক ফোঁটা জল দেখিলাম না। তাঁহার প্রথম-পক্ষীয় স্ত্রীর একটি মেয়ে ছিল। কি কারণে যেন তিনি সেই মেয়ের কোন খোঁজ লইতেন না। সেই মেয়েটির যেদিন মৃত্যু সংবাদ আসিল, সেদিন বাড়ির সবাই খুব শঙ্কিত হইল; এই সংবাদ পাইয়া তিনি কি করিবেন। টেলিগ্রামটি হাতে পাইয়া কিছুক্ষণ তিনি গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন। এই চির-গম্ভীর লোকটির মনে সেদিন কি হইতেছিল, সেই গভীর সমুদ্র তল-দেশের কোন খবরই কেহ পাইল না।

এই বিরাট ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন লোকটির কোন বন্ধু ছিল না। ছেলে-মেয়ে আত্মীয়-স্বজনে ঘর ভর্তি থাকিলেও তাঁহার যেন কেহ ছিল না। সবাই তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিত। কিন্তু একমাত্র ধীরেনের মেজদিদি পঙ্কজিনী তাঁকে এতটুকুও ভয় করিয়া চলিতেন না। তখনকার দিনে আমি কি-ই বা কবিতা লিখিয়াছি। কতবার পঙ্কজিনী দিদি (সেজদি) আমার কোন কবিতা সুন্দর করিয়া লিখিয়া লইয়া তাঁর বাবাকে পড়িয়া শুনাইয়াছেন। তিনি আমাকে ডাকিয়া লইয়া সস্নেহে বলিয়াছেন, "বেশ

হইয়াছে, ভাল হইয়াছে।" এত বড় রাশভারী মানুষ, জীবনে বোধ হয় আর কাহারও এমন করিয়া তারিফ করেন নাই। সেই অল্প বয়সে কবিতা রচনায় এই বিরাট ব্যক্তিটির তারিফ পাইয়া যত ভাল লাগিয়াছে, জীবনে বহু সাহিত্যিক সুনাম পাইয়াও তত ভাল লাগে নাই।

শ্রীশবাবুর মেজো ছেলে কিরণদাদা আমাকে বড়ই ভালবাসিতেন। ছেলেবেলা হইতেই তিনি সাধু-সন্ন্যাসীতে অনুরক্ত ছিলেন। আমাকে সঙ্গে করিয়া তিনি তেতালার চিলে-কোঠার ঘরে বসিয়া ধ্যান-ধারণা করিতেন। কতদিন সেখানে সারারাত ভরিয়া আমরা নানা রকম ধর্ম-পুস্তক পড়িয়াছি। সেকালে স্কুল কলেজের ছেলেদের মধ্যে বিশেষ করিয়া হিন্দু ছেলেদের মধ্যে ধর্ম-কর্মের প্রতি বড়ই আকর্ষণ দেখা যাইত। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের সবে তিরোধান হইয়াছে। দেশে বিপ্লবীদের মধ্যে গীতা ও অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রের আলোচনা হইতেছে। তাহা ছাড়া সেই সময়ে ফরিদপুরে জগদ্বন্ধু ঠাকুর বারো বৎসর ধরিয়া একখানা বদ্ধদ্বার ঘরের মধ্যে বসিয়া সাধনা করিতেছেন। তাঁহার শিষ্যেরা নানা রকম ধর্ম-পুস্তক প্রণয়ন করিয়া ছাত্রদের মধ্যে প্রচার করিতেছেন। এই সকলের প্রভাব কিরণদাদার উপর বিশেষভাবে পড়িয়াছিল। তিনি আমাকে নানা উপদেশ দিয়া তাঁহার মনের মত করিয়া গড়িয়া লইতে চেষ্টা করিতেন। তেতালার সেই ছাদে আমি তাঁহার সঙ্গে ধ্যান-ধারণা করিয়া সময় কাটাই, আর অবসর মত পড়াশুনাও করি।

এমন সময় কিরণদাদার ভগ্নীপতি সুরেনবাবু আসিয়া বাদ সাধিলেন। তিনি তাঁর শাশুড়িকে বলিলেন, "জসীম উদ্দীন মুসলমান। সে উপর-তলার ঘরে থাকিবে আর আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান থাকিব নিচের তলায়, ইহা কখনই হইতে পারিবে না। তাহা ছাড়া সে আপনাদের চৌকিতে বসে। সেই চৌকিতে আমাকেও বসিতে হয়। এরূপ অনাচার চলিতে থাকিলে আর আমি শ্বশুর বাড়িতে আসিব না।"

সুতরাং আমাকে এই বাড়ি হইতে চলিয়া আসিতে হইল। ছুটি-ছাটার দিনে যে সেখানে যাইয়া আমার বন্ধু ধীরেনের সঙ্গে পড়াশুনা করিব তাহারও কোন উপায় রহিল না। পড়াশুনা ত দাঁড়াইয়া

দাঁড়াইয়া করা যায় না। কিন্তু সেই বাড়িতে যাইয়া বাসব কোথায়? তাঁহাদের চৌকিতেও বসা নিষেধ হইল। এতদিন আমি মাত্র গ্রীষ্ম ও পূজার ছুটিতে এই বাড়িতে আসিয়া পড়াশুনা করিতাম। স্কুল চলার সময় বাড়িতেই থাকিতাম।

শ্রীশবাবুর বড় জামাতার আপত্তির জন্যই আমাকে তাঁহার বাড়ি হইতে চলিয়া আসিতে হইল। কিন্তু বাড়ির সকলেই আমাকে আগের মতই স্নেহ করিতেন। তাঁহারা কেহ কেহ আমার চলিয়া আসাতে খুবই মর্মাহত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেকালে কুলীন-ঘরের জামাতাকে অসন্তুষ্ট করিতে কেহই সাহস পাইলেন না। আমি যে জামাতার আপত্তির জন্য তাঁহাদের বাড়ি হইতে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলাম তাহা বাড়ির-কর্তা শ্রীশবাবু জানিতেন না।

পূজার ছুটি শেষ হইয়া গেল। পরীক্ষার আর মাত্র এক মাস বাকী। আমার মোটেই পড়াশুনা হইতেছে না। একদিন ধীরেনের কাছে আমার অবস্থা জানাইলাম। ধীরেন আমাকে পরামর্শ দিল, "তুমি একটি মাদুর আর একটি বাক্স কিনিয়া আন। সেই বাক্সের উপর বসিয়া আমাদের চৌকিটাকে টেবিলের মত করিয়া পড়াশুনা করিবে, আর রাত্রে তোমার মাদুরে ঘুমাইবে।"

ধীরেনের এই পরামর্শ মত আমি একটি বাক্স আর একটি মাদুর কিনিয়া আনিয়া আবার শ্রীশবাবুর বাসায় আসিয়া পড়াশুনা করিতে লাগিলাম। ধীরে ধীরে শীতকাল আসিয়া পড়িল। পড়ার ঘরের মেঝেয় শানের উপর মাদুর বিছাইয়া সামান্য একটি কম্বল গায়ে দিয়া আমি শীতে ঠির ঠির করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ঘুমাইয়া পরিতাম।

একদিন অনেক রাত্রে কি একটা আইন-পুস্তক লইতে ধীরেনের বাবা শ্রীশবাবু নিচে আসিয়া আমাকে মাটিতে শুইয়া থাকিতে দেখিলেন। পরদিন তিনি মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের এতগুলি চৌকি থাকিতে সাধু কেন মাটিতে শুইয়া ঘুমায়? এই শীতের রাত্রে মাটিতে শুইয়া ওর ত নিউমোনিয়া হইবে।" মা তাঁহাকে বড় জামাতা সুরেন-বাবুর আপত্তির সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। শ্রীশবাবু অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তবে সাধুকে ওদের পড়ার-ঘরের পাশে

আমার কাছারীঘরের ফরাসে শুইতে বলিয়া দিও।"

মাকে আর বলিতে হইল না। তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, "আজ হইতে রাত্রে তুমি আমার ফরাসে শয়ন করিবে।"

এই বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার ঘটা বিশেষ ছিল না। মাঝে মাঝে শ্রীশবাবু ফেরিওয়ালা কশাইদের নিকট হইতে মাংস কিনিতেন। সেদিন মাকে বলিয়া দিতেন, "আজ সাধু আমাদের এখানে যেন খায়।" বাড়িতে কোনদিন হাঁসের ডিম রান্না হইলেও তিনি আমাকে খাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতেন।

শহরের সব লোকে বলিত, শ্রীশবাবুর মত এমন কৃপণ লোক কেহই নাই। ফরিদপুর লোন অফিসের মজুত প্রায় সমস্ত টাকাই শ্রীশবাবুর। কিন্তু তিনি খরচ করেন না। তিনি লোকদের দেখাইয়া কাউকে কিছু দান করিতেন না। দূর সম্পর্কের গরীব আত্মীয়েরা মাঝে মাঝে সাহায্য চাহিয়া তাঁহার নিকট পত্র লিখিত। সপ্তাহে অন্ততঃ দুই তিনদিন তিনি পাঁচ টাকা, দশ টাকা, বিশ টাকা করিয়া মনিঅর্ডার করিতেন। এই টাকা কাহারা পাইত, বাড়ির কেহই তাহার সন্ধান জানিত না! সেই অগণিত সাহায্যপ্রাপ্ত লোকদের মত তাঁহার এই গোপন দানও চিরকালই লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া যাইত।

শুনিয়াছি, ছাত্র-বয়সে তিনি নানা অভাব-অভিযোগের মধ্য দিয়া নিজেকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। সেই জন্যই বোধ হয় পরিণত বয়সে তিনি সাংসারিক খরচ-পত্রের বিষয়ে খুব মিতব্যয়িতা অবলম্বন করিতেন।

ছেলেদের মধ্যে কিরণদাদা তাঁর বড় প্রিয়পাত্র ছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে তিনি ফিলোসফিতে অনার্সে ফার্স্টক্লাস পাইয়াছিলেন। এই ছেলেটিকে লইয়া শ্রীশবাবু মনে মনে অনেক আকাশ-কুসুম রচনা করিতেন। কিন্তু মানুষ যাহা ভাবে তাহা হয় না! কলিকাতায় অধ্যয়নের সময় মাঝে মাঝে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনে যাতায়াত করিতেন। একদিন হঠাৎ সেখানে যাইয়া তিনি সন্ন্যাসী হইয়া বসিলেন। সন্ন্যাসীদের আপনজনের প্রতি মায়া করিতে নাই। মায়ের কান্দন, বাপের কান্দন কোন দিকেই তিনি ভ্রূক্ষেপ করিলেন না।

আগেই বলিয়াছি, এই গম্ভীর প্রকৃতির লোকটিকে আমি কোনদিন কোন দুঃখে নত হইতে দেখি নাই। কোন আনন্দে মশগুল হইতেও দেখি নাই। মহা মহীরুহের মত সাংসারিক সমস্ত ঝড়-ঝঞ্ঝা আপদ-বিপদের মধ্যে তিনি অচল-অটল ভাবে দণ্ডায়মান থাকিতেন। সবাই তাঁহাকে ভয় করিত। তিনি কাহাকেও ভয় করিতেন না। তাঁহার নিকটে অনুগ্রহ প্রার্থীরা আসিয়া তাঁহাকে ভক্তি করিত, তিনি কাহারও অনুগ্রহ প্রার্থী ছিলেন না—তিনি কাহাকেও ভক্তি করিতেন না। এই বিরাট পুরুষটিকে দেখিয়া আমার মনে হইত, এই লোকটি যেন আর কোনখানের। আমাদের হাসি-তামাসা, দুঃখ-বেদনাভরা পৃথিবীর ইনি যেন কেহ নন।

কিন্তু কিরণদাদার সন্ন্যাসী হওয়ার পর হতেই তিনি একেবারে ভাঙিয়া পড়িলেন। দুই দুইটি মেয়ের মৃত্যুতে যাঁর চক্ষু হইতে এক-ফোঁটা অশ্রু পড়ে নাই, আজ তিনি বালকের মত কাঁদিয়া আকুল হইলেন। চোখের জলে বুক ভাসাইয়া যাকে দেখেন তারই গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলেন, "আমার কিরণকে আনিয়া দাও।" এই খবর হয়ত কিরণদাদার কাছেও পৌঁছিত কিন্তু সেই নির্মম একদিনও সেদিকে ফিরিয়া তাকাইলেন না। শুনিয়াছি রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরা পরের দুঃখে জীবন উৎসর্গ করেন। কিন্তু নিজের পিতা-মাতার দুঃখ যে ছেলে বুঝিল না, পরের দুঃখ সে কেমন করিয়া অনুভব করিবে, ইহা আজও আমার বোধের অগম্য। কিরণদাদার সঙ্গে আবার যদি দেখা হয়, এই প্রশ্ন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিব।

এই আঘাতে ধীরে ধীরে শ্রীশবাবু ভাঙিয়া পড়িলেন। ছেলেরা তাঁহাকে পুরী লইয়া গেল। কিন্তু স্বাস্থ্য আর তাঁহার ফিরিল না। একদিন সেই মহা মহীরুহ মাটিতে ভাঙিয়া পড়িল। মরিবার আগে তিনি একটি উইল করিয়া গিয়াছিলেন। পিতৃহারা তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র রাসমোহনদাদা তাঁহার বাড়িতে থাকিয়া পড়াশুনা করিতেন। নিজের ছেলেদের মত তাঁকেও তিনি তাঁর সম্পত্তির সমান ভাগী করিয়া উইল লিখিয়া দিয়া গেলেন।

মনাদা

শ্রীশবাবুর বাসায় থাকিতে তাঁহার দূর সম্পর্কের ভাইপো মনীন্দ্র-মোহন বন্দোপাধ্যায় মহাশয় চাকরির উমেদারী করিতে সেখানে আসিয়া উঠিলেন। বাড়ির অন্যান্য ছেলেমেয়েদের মত তাঁকেও আমি মনাদা বলিয়া ডাকিতাম। মনাদা আমাকে বড়ই স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। তাঁর একটু একটু লিখিবার অভ্যাস ছিল। তিনি আমার লেখাগুলি পড়িয়া আমাকে খুবই উৎসাহ দিতেন। শেষ রাত্রে মনাদা উঠিয়া সেতার বাজাইতেন। খুব যে তিনি ভাল বাজাইতেন এমন নয়; কিন্তু তখন-কার কিশোর-বয়সের মনে সেই সেতারের সুর অমৃত বর্ষণ করিত। মনে হইত, এমন বাজাইতে বুঝি পৃথিবীর আর কেহ পারে না। শেষরাত্রে মনাদার সেতার বাজনার ঝঙ্কারে ঘুম ভাঙিয়া যাইত। বিছানায় থাকিয়া অনেকক্ষণ সেই বাজনার সঙ্গে আধোঘুমের স্বপ্ন-মিশ্রিত করিয়া চুপ করিয়া শুইয়া থাকিতাম। তারপর উঠিয়া আসিয়া মনাদার পার্শ্বে বসিতাম। মনাদা তখন সেতার বাজাইতে বাজাইতে গান ধরিতেন ঃ

কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব
তোমারি রসাল নন্দনে।

তখনকার দিনে রবীন্দ্রনাথের গান তত প্রচলিত হয় নাই। রজনী সেনই মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের মন আকর্ষণ করিয়া আছেন।

মনাদার এই গানের অন্তর্নিহিত ভাব বুঝিবার বয়স তখনও আমার হয় নাই। কেবলই মনে হইত মরুভূমির মধ্যে বসিয়া একটি লোক বলিতেছে ঃ কখন আমি স্বর্গের রসাল নন্দনে যাইতে পারিব। সেখানে দুঃখ নাই, বিষাদ নাই। শুধুই আনন্দ।

প্রতিদিনই মনাদা এই একই গান গাহিতেন। এ গান যতই শুনি-তাম ততই আমার ভাল লাগিত। তার চাইতেও ভাল লাগিত মনাদার

সেতার বাজনা। বাজনা শুনিতে শুনিতে আমার মনে হইত, একটি খুব সুন্দর মেয়ে সেই সেতারের বাজনার তালে তালে মহাশূন্যের উপর নাচিয়া বেড়াইতেছে। সূর্য উঠিলে মনাদা উঠিয়া যাইতেন। আমি বসিয়া বসিয়া সেই সুন্দর মেয়েটিকে ধ্যান করিতাম।

মনাদা শুধু গান গাহিয়া আর সেতার বাজাইয়াই আমার কিশোর-মনটিকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন না; যেখানে যাহা কিছু দেখিয়া আসি-তেন তাহা তিনি সুন্দর হাস্য-রসে মিশাইয়া বলিতে পারিতেন। মাঝে মাঝে বাড়ির সকল ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে একত্রিত হইয়া সেই সব কাহিনী শুনিয়া আমরা হাসিয়া আকাশ-বাতাস ফাটাইতাম। একবার মনাদা ধীরেনের মেজদিদি মৃনালিনী দেবীর শ্বশুর বাড়িতে তিনদিনের জন্য বেড়াইতে যান। ফিরিয়া আসিলে আমরা সকলে ধরিলাম, "মনাদা! এবারের ভ্রমণে কি কি ঘটিল বলেন।" এ-কাজের ও-কাজের বাহানা করিয়া তিনি আমাদিগকে দুই তিনদিন ঘুরাইলেন। পরে এক-দিন রাত্রকালে মনাদাকে বিশেষ করিয়া ধরিলাম, "আজ আপনার ভ্রমণ কাহিনী না বলিলেই নয়।"

একটু কাশিয়া মনাদা তাঁর ভ্রমণ কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন. মেজদি, সেজদি পাশে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলেন। সেই বাটকেমারী গ্রামে যাইতে কি করিয়া নৌকা ভাড়া করিলেন, নৌকার মাঝিদেব সঙ্গে কি ভাবে দর-দস্তুর করিলেন, তারপর বাড়ি পৌঁছিলে বাড়ির কর্তা মেজদির শ্বশুর বৈষয়িক মানুষ, মনাদাকে পরীক্ষা করিবার জন্য কি ভাবে কথা বলিলেন, সব কিছু অনুকবণ করিয়া মনাদা আমাদিগকে শুনাইলেন। তারপর খাইবার সময় তিনি পিঁড়িতে বসিয়া আছেন, কি ভাবে বাড়ির গৃহিণী এক একটি জিনিস আনিয়া দিতেছেন, তখন মনাদার মনে কি ভাব জাগিতেছে, এই সব মনাদা এমনই হাস্য-কৌতুক মিশাইয়া বলিলেন যে, হাসিতে হাসিতে আমাদের পেট ব্যথা হইয়া গেল।

আমি যেমন মনাদাকে ভালবাসিতাম, শ্রদ্ধা করিতাম, মনাদাও আমাকে তেমনি ভালবাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি আমার সেই বয়সের কবিতাগুলি আমার সাহিত্য-জীবনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ মনে মনে

পোষণ করিতেন। সে কথা তিনি আমার অগোচরে বাড়ির অন্যান্য লোকদের নিকটেও বলিতেন।

সেবার পদ্মা নদীতে ভীষণ ভাঙন ধরিল। আমাদের গ্রামের মরা নদীর ওপারে চরকেষ্টপুর—তারপর সালদার চর—তারও অনেক দূরে ছিল পদ্মা নদী। সেই পদ্মা নদীর কত কাহিনী আমরা শুনিতাম মুরুব্বীদের মুখে। আমার পিতা একবার নটা-ঘাস আনিতে পদ্মা নদীর ওপারে গিয়াছিলেন। তারপর মাঝ নদীতে আসিয়া নৌকা ডুবিয়া গেল। ভাসিতে ভাসিতে তাঁহারা যাইয়া উঠিলেন নটাখোলার চরে। সেখানে পরনের কাপড় ছিঁড়িয়া নটা-ঘাসের ডাঁটার সঙ্গে ফর্‌রা বাঁধিলেন, দূর হইতে কোন নৌকার মাঝি এই বিপদ সংকেত দেখিয়া যদি তাঁহাদের সাহায্য করিতে আসে। এই কাহিনী আগেই বলিয়াছি।

সেই পদ্মা নদীতে এবার ভাঙন ধরিল। নটাখোলা, সালতার চর ভাঙিয়া এবার পদ্মা নদী চরকেষ্টপুর আসিয়া পৌঁছিল। আমাদের বাড়ি হইতে বড় বড় ষ্টীমারের শিঙা দেখা যাইতে লাগিল। মাঝে মাঝে আমরা জলী পাইঙ্গার বিল পার হইয়া পদ্মা নদী দেখিতে যাইতাম। পরের বর্ষায় মাধবদিয়া ভাঙিয়া চরকেষ্টপুর গ্রাম পার হইয়া পদ্মা নদী বাড়ির সামনের মরা নদীতে আসিয়া মিশিল। পদ্মার সে কি শুষানী। রাত্রে ঘুম হইতে জাগিয়া শুনিতাম ঢেউ-এর পর ঢেউ কুলে আসিয়া আঘাত করিতেছে—আর শোঁ শোঁ শোঁ শব্দ হইতেছে।

সকালে নদীর ধারে আসিয়া দাঁড়াই। ঘূর্ণীগুলি গোল চক্র হইয়া পারে আসিয়া আঘাত করে। প্রথমে পারের নিচের মাটি ধুইয়া যায়। তারপর একটি ভীষণ শব্দ করিয়া গাছ-গাছালিসহ অনেকখানি জমি নদীতে হুমড়ি খাইয়া ভাঙিয়া পড়ে। দলে দলে নদী-তীরের বাসিন্দারা ঘর-বাড়ি ভাঙিয়া দূরবর্তী স্থানে বাঁশের পেলা দিয়া চালাগুলি আটকাইয়া রাখিতেছে। তাহারই তলায় ছেলে-মেয়ে-পরিবার লইয়া তাহারা ঘর-সংসার পাতিয়াছে। সেখানে বসিয়া বসিয়া তাহারা কোন অজানা চরের নতুন বসতি বিস্তারের স্বপ্ন দেখিতেছে। দূরে—বহুদূরে কোথায় নতুন চর পড়িবে। সেখানে যাইয়া আবার তাহারা গ্রাম

রচনা করিবে। আবার বালুর উপর শ্যামল শস্য খেতের আল্‌পনা রচনা করিবে। পদ্মার ভাঙনের কাছে পরাজিত হইলে চলিবে না। কোথায় কোন দূরে উড়ানীর চর, তাহাও ছাড়াইয়া সাড়ার চর—যেখানে সাড়ার পুল। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের পরম তেলেসমাতি, এই বড় পদ্মার উপরে বাঁধ গড়িয়াছে। মোড়ল আসিয়া খবর বলিয়াছে—সেইখানে যাইয়া তাহারা নতুন গ্রাম গড়িবে। পেটে ভাত নাই—পরনে কাপড় নাই—তবু তাহারা আশা-শূন্য হয় না। ভাই-ভাস্তে, বন্ধু-স্বজন, প্রতিবেশী, আত্মীয় সকলে মিলিয়া জল্পনা-কল্পনা করে।

পদ্মা কিন্তু চুপ করিয়া থাকে না। মরা গাঙের ওপারে চরকেষ্টপুর ভাঙিয়া সতর খাদা, আলীপুর, গোবিন্দপুর পর্যন্ত বহু গ্রাম পদ্মার জলে ভাসিয়া গেল। গ্রামের শত বৎসরের বটগাছটি—কত কালের কত ঘটনার সাক্ষ্য হইয়া উন্নত শিরে দাঁড়াইয়াছিল, যার তলে আসিয়া শ্রান্ত পথিকেরা শীতল বাতাসে বিশ্রাম করিত, যাহার শাখায় নানা রকমের পাখিরা আসিয়া আশ্রয় লইত; সেই বটগাছটিও একদিন হুমড়ি খাইয়া পদ্মার বুকে ভাঙিয়া পড়িল। ভাঙন এখন এতই দ্রুত আরম্ভ হইল যে, গ্রামবাসিরা অনেকেই যার যার ঘর-বাড়ি সরাইয়া লইবার অবসর পাইল না। সাধারণতঃ এরূপ ব্যবস্থায় তাহারা একে অপরের সাহায্যে আগাইয়া আসে। কিন্তু সকলেরই আজ এক অবস্থা। কাহার সাহায্য কে করে! কাহার ঘর-বাড়ি কে সরাইয়া দেয়! যাহাদের পয়সা আছে তাহারা অধিক মূল্যে জন খাটাইয়া ঘর বাড়ি সরাইয়া লয়। গরীব লোকদের ঘর-বাড়ি নদীর জলে ভাসিয়া যায়। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাঁহারা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে।

ক্রমে ক্রমে আলিম মোল্লার আম-বাগান, শ্মশান-ঘাটার শেওড়া-তলা, লক্ষ্মীপুরের কুরিদের সুপারি-নারিকেল বনে ঘেরা দালান কোঠা, সতর খাদার মিঞাজান মোল্লার চৌচালা বাড়ি পদ্মার ভাঙনে ভাসিয়া গেল।

আমি আর মনাদা বসিয়া বসিয়া আলোচনা করি। আচ্ছা স্কুলের বড় বড় ছেলেরা ত ইচ্ছা করিলে এই সময় অসহায় গ্রামবাসিদের সাহায্য করিতে পারে। তাহারা বাড়ি-ঘর মাথায় করিয়া নদী ভাঙনের

আশঙ্কা নাই এমন স্থানে তাহা রাখিয়া আসিতে পারে। ছোট ছোট ছেলেরা হাঁড়ি-পাতিল আসবাব-পত্র সরাইয়া নিরাপদ স্থানে রাখিয়া আসিতে পারে। স্থির হইল, রাত জাগিয়া মনাদা অসহায় গ্রামবাসিদের অবস্থা জানাইয়া একটি আবেদন পত্র লিখিয়া রাখিবেন।

পরদিন স্কুলের সময় মনাদার লিখিত সেই আবেদন পত্রখানা লইয়া আমি স্কুলের হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের হাতে দিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা ক্লাশে ক্লাশে প্রচার করিবার হুকুম দিলেন। এই আবেদন পত্র পড়িয়া ছেলেরা দলে দলে বিভক্ত হইয়া লক্ষ্মীপুর অঞ্চলের গ্রামবাসিদের সাহায্য করিতে ছুটিল! আমাদের দেখাদেখি স্থানীয় ঈশান স্কুলের ছাত্রেরাও ভূতপূর্ব কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়ের পুত্র শ্রীকিরণ মজুমদারের নেতৃত্বে আমাদের গ্রামে আসিয়া সাহায্য কাজে ব্যপৃত হইলেন। তিন-চারদিন বেশ কাজ চলিল। ইতিমধ্যে ফরিদপুরের প্রসিদ্ধ উকিল বাবু পূর্ণচন্দ্র মৈত্র এবং মথুরানাথ মৈত্র মহাশয়দ্বয় দুই স্কুলের হেড্‌মাষ্টারদের কাছে পত্র লিখলেন, "নদী ভাঙ্গনের লোকদিগকে ছেলেরা যে সাহায্য করিতে যাইতেছে, তাহারা যদি জলে ডুবিয়া মরে, সে জন্য কে দায়ী হইবে? ছেলেদিগকে স্কুলে দেওয়া হইয়াছে লেখাপড়া করিতে। স্কুলের পড়া ছাড়িয়া তাহাদিগকে সাহায্য কার্যে যাইবার কে অনুমতি দিয়াছে?" এই পত্র পাইয়া পরদিন হইতে দুই স্কুলের হেড্‌মাষ্টারই ছেলেদিগকে আর সাহায্য কার্যে যাইবার অনুমতি দিলেন না।

আমি আর মনাদা বসিয়া বসিয়া নানা জল্পনা-কল্পনা করিতে লাগিলাম। আহা, এই নিরাশ্রয় লোকদিগকে ছেলেরা সাহায্য করিতেছিল, তাহাও এই ভদ্রলোক দুইজনের গায়ে সহিল না! অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির হইল, এই দুই উকিলের নামে একখানা বেনামী পত্র লিখিয়া উকিল লাইব্রেরীর দেয়ালে টানাইয়া দেওয়া হইবে। এই দুই উকিলের বাড়ি ছিল পশ্চিমবঙ্গে। এখন যেমন হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ তখনকার দিনে ছিল পশ্চিমবঙ্গে আর পূর্ববঙ্গে বিরোধ। তবে সে বিরোধ হিন্দু-মুসলমান বিরোধের মত এত মারাত্মক হইয়া ওঠে নাই। মনাদা লিখিলেন, "বর্দ্ধমানে বন্যার সময় পশ্চিমবঙ্গের ছেলেরা চা বিস্কুট

না হইলে সেবাকার্যে যাইতেন না। পূর্ববঙ্গের ছেলেরাই সেখানে অগ্রণী হইয়া সেবাকার্য করিয়াছিল। মথুরাবাবু ও পূর্ণবাবু ইচ্ছা করিলে মোমের পুতুল করিয়া আপনাপন ছেলেদের ঘরে বসাইয়া রাখিতে পারেন, কিন্তু কোন্ অধিকারে তাঁহারা পূর্ববঙ্গের ছেলেদের অভিভাবক হইয়া বসিলেন? এই নিরাশ্রয় লোকদের দীর্ঘ নিঃশ্বাস ভগবানের আসন পর্যন্ত যাইয়া পৌঁছিবে। অসহায় গ্রামবাসিদের দুঃখে পূর্ববঙ্গের ছেলেদের সেবাকার্যে যদি তাঁহারা সত্য সত্যই বাধা হইয়া দাঁড়ান, তবে ইহার প্রতিকার পূর্ববঙ্গের ছেলেরাই করিবে।"

পরদিন ভোর না হইতেই আমি কিছু জিকার আঠা লইয়া উকিল লাইব্রেরীর নোটিশ বোর্ডে সেই প্রতিবাদ পত্র আটকাইয়া দিয়া আসিলাম। তাহা পড়িয়া বার লাইব্রেরীর উকিলেরা পূণবাবু ও মথুরবাবুকে ছি ছি করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও দুইজনে এই দেওয়াল-পত্র পড়িয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। তখনকার দিনে বিপ্লবী ছাত্রদের প্রভাব ছিল অসামান্য। তাঁহারা মনে কবিযাছিলেন, এই দেওয়াল-পত্র বিপ্লবী ছাত্রেরাই লিখিয়াছে। তারপব দুইজনে একত্র হইয়া দুই স্কুলের হেড্-মাষ্টারদের নিকট যাইয়া তাঁহাদের পূর্ব পত্র প্রত্যাহার করিলেন। ছেলেরা আবার দলে দলে যাইয়া সাহায্য কাজে ব্রতী হইল। কিন্তু যেই সাহায্য কার্যের অন্তরালে যে আমাদের দুইজনেব কতখানি হাত ছিল তাহা কেহই জানিল না। আজও মনাদার সঙ্গে দেখা হইলে আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া আবার আমাদের পূর্ব জীবনে ফিরিয়া যাই।

মনাদার লিখিত সামান্য দুইখানা পত্রের ফলে ফরিদপুর শহরে এত কাণ্ড হইল। শত শত ছাত্র অসহায় গ্রামবাসিদের সাহায্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল। দেখিবার সে এক দৃশ্য! ছাত্রেরা দলে দলে মানুষের ঘর-বাড়ি ভাঙিয়া কাঁধে করিয়া দূরবর্তী স্থানে লইয়া যাইতেছে। ছোট ছোট ছেলেরা তৈজসপত্র হাঁড়ি-কুড়ি মাথায় করিয়া সঙ্গে সঙ্গে যাই-তেছে। অসহায় গ্রামবাসিরা অশ্রুসজল চক্ষে নীরব কৃতজ্ঞতা জানাই-তেছে। এই ঘটনায় আমরা বড়ই উৎসাহিত হইয়া পড়িলাম। আমা-দের সাহিত্য-সাধনা আরও মনোযোগের সহিত চলিল। একদিন

মনাদাকে বলিলাম, "আসুন, আমরা একখানা মাসিক পত্র বাহির করি।" মনাদা তৎক্ষণাৎ রাজি হইলেন। পত্রিকার নাম স্থির হইল 'উষা'। শহরের কোন ভদ্রলোকের জামাতা আর্ট স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তিনি উষা পত্রিকার মলাটের ছবি আঁকিয়া দিলেন। 'সাঁঝের মায়া' নাম দিয়া মনাদা এক বিরাট নভেল লেখায় হাত দিলেন। কয়েক-দিনেই তিনি প্রায় শ'খানেক পৃষ্ঠা লিখিয়া ফেলিলেন। স্থানীয় 'আর্য-কায়স্থ' পত্রিকার সম্পাদক ও গীতার অনুবাদক পরলোকগত কালি প্রসন্ন ঘোষ মহাশয় তখনও জীবিত। তাঁকে যাইয়া ধরিলাম পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ লিখিয়া দিতে। তিনি বেদ-বেদান্ত বহু প্রাচীন শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃতি দিয়া 'উষা' নামে একটি গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া দিলেন। আমাদের উৎসাহ ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় আমার কবিতা স্থান পাইল :

> নায়ের মাঝি নায়ের মাঝে,
> এখনো কেন শুয়ে ?
> বেয়ে চল্ তোর না খানি ভাই,
> পাল তুলিয়া দিয়ে।

'শুয়ে' শব্দের সঙ্গে 'দিয়ে' শব্দের মিল যে একালের কবিতায় চলে না সে জ্ঞান আমার তখনও হয় নাই। আমার কবিতা পড়িয়া যাঁহারা আমাকে উৎসাহ দিতেন তাঁহাদেরও এ জ্ঞান ছিল না।

পত্রিকার পাণ্ডুলিপি ত তৈরী হইল। এখন উহা ছাপাইবার খরচ কে দিবে ? প্রথম সংখ্যা ছাপাইতে প্রায় পঞ্চাশ টাকা ব্যয় হইবে। প্রথম সংখ্যা ছাপাইলেই অনুরোধ-উপরোধ করিয়া বহু গ্রাহক করা যাইবে। গ্রাহকদের দেয় চাঁদার টাকা হইতেই পরবর্তী সংখ্যাগুলি ছাপান যাইবে। কথা হইল, স্থানীয় জমিদার চৌধুরীদের সঙ্গে দেখা করিয়া মোটা রকমের কিছু চাঁদা আদায় করা হইবে। সেই টাকা দিয়া পত্রিকার প্রথম সংখ্যার ছাপার খরচ পোষানো হইবে। সেই বালক-বয়সের কল্পনার কাছে কোন সমস্যাই হার মানিতে চাহে না। কিন্তু তারপর যে কেন আর পত্রিকা ছাপানোর কাজে অগ্রসর হওয়া গেল না, আজ তাহা ভাল করিয়া মনে পড়িতেছে না। হয়ত মনাদা

পুলিশের চাকরি লইয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন অথবা কিছুদিন অতি উৎসাহের সহিত কাজ করিয়া মনাদা শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন ; এমনি কোন কারণে পত্রিকা ছাপানোর কাজ আর অগ্রসর হইল না। তখন আমি বারবার নিজেকে ধিক্কার দিতেছিলাম, জীবনের প্রথম চেষ্টাই যখন ব্যর্থ হইয়া গেল, আমার জীবনে কোনদিনই কোন পত্রিকা ছাপানোর কাজ সম্পন্ন করিতে পারিব না। সেই ভবিষ্যৎ-বাণী বোধ হয় আমার জীবনে সত্য হইতে চলিল।

শ্রীশবাবুর বাসায় থাকিতেন কালীমোহন নামে একটি কলেজের ছাত্র। বাসায় ছোট ছোট ছেলেদের পড়াইতেন। একদিন আলাপ-আলোচনা করিতে তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কথা বলিলেন। সেই সঙ্গে তিনি কংগ্রেসের কথাও পাড়িলেন। তৎকালে মুসলিম বক্তাদের বক্তৃতায় যেরূপ শুনিতাম তাহারই সুরে সুর মিলাইয়া আমি বলিলাম, "এখন স্বাধীনতা পাইলে উহা হিন্দুদের স্বাধীনতা হইবে। আগে আমরা মুসলমানেরা শিক্ষায়-দীক্ষায় হিন্দুদের সমকক্ষ হইয়া লই তখন আমরা স্বাধীনতার লড়াই করিব।"

কালীমোহনবাবু তখন আমাকে বলিলেন, "স্বাধীনতা মানে দেশের সকল লোকের স্বাধীনতা। দেশের যা সম্পদ, তাহা এখন বিলাত চলিয়া যায়। বিলাতের লোকেরা তাহা দিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে ভোগ-বিলাস করে। স্বাধীনতা হইলে এই সম্পদ দেশের জনগণ উপভোগ করিবে।" আমি বলিলাম, "তাহা যদি সত্য হয় তবে মুসলমানেরা কংগ্রেসে যোগদান করে না কেন?" তিনি বলিলেন, "কে বলে মুসল-মানেরা কংগ্রেসে নেই? ফজলুল হক, আলী ইমাম, মিঃ রসুল, মিঃ জিন্নাহ্ প্রভৃতি আরও বহু মুসলমান কংগ্রেসের সঙ্গে আছেন।"

সেইদিন হইতে তিনি আমাকে খবরের কাগজ পড়িতে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। দৈনিক বসুমতি তখন সব চাইতে বেশী চলিত। সেই কাগজে তখন বিবি বেসান্ত ও কংগ্রেস লইয়া বহু আলোচনা থাকিত। মাঝে মাঝে ফজলুল হক ও মিঃ রসুলের বক্তৃতা বাহির হইত। সেইগুলি তিনি বিশেষ করিয়া আমাকে পড়িয়া শুনাইতেন। ধীরে ধীরে আমার মন কংগ্রেসের প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল।

কালীমোহনবাবু বিপ্লবী দলের সভ্য ছিলেন। তিনি বিপ্লবী দলের গোপন লাইব্রেরী হইতে মাঝে মাঝে বই-পুস্তক আনিয়া আমাকে পড়িতে দিতেন। সখারাম গণেশ দেউস্করের দেশের কথা, বিনয় সরকারের সাধনা, নিগ্রোজাতির কর্মবীর ও অন্যান্য লেখকের জালিয়াত ক্লাইভ, রাজা প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি পুস্তক আনিয়া আমাকে পড়িতে দিতেন। এইসব বই সবটা পড়িয়া বুঝিতাম না। কিন্তু দেশের জনসাধারণের প্রতি একটি মমতাবোধ আমার মনে জাগ্রত হইত। ইহার পর জানিতে পারিলাম, ধীরেনের বড় ভাই কিরণদাদা, যিনি আমাকে লইয়া ছাদে ধর্ম-সাধনা করিতেন, পরে রামকৃষ্ণ আশ্রমে যোগ দিয়াছিলেন, তিনিও বিপ্লবীদলের সভ্য ছিলেন। এমন কি আমার বন্ধু ধীরেনও পরে বিপ্লবীদলের সভ্য হইল। মাঝে মাঝে তাহাদের গোপন সভা বসিত। সেই সভায় ধীরেনকে নানা বিষযে প্রবন্ধ লিখিয়া পড়িতে হইত। সেই প্রবন্ধেব অধিকাংশই আমি লিখিয়া দিতাম। ধীরেন আসিয়া গল্প করিত, তাহার প্রবন্ধ শুনিয়া বিপ্লবীদলে তাহার খুব সুখ্যাতি হইয়াছে। এই বিপ্লবীদলের অনেককেই আমি চিনিতাম। তাহাবা বুকটান করিয়া বুকের সিনা উঁচু করিয়া চলিত। স্বাস্থ্য ভাল হওয়ার জন্য ডন-কুস্তি করিত। আমিও তাহাদের দলের সভ্য হইতে চাহিতাম। আমি মুসলমান আর আমার বড ভাই পুলিশের চাকরি করিতেন বলিয়া তাহারা বিশ্বাস করিয়া আমাকে দলে লইতেন না। স্কুলের একদল ছাত্র এই দলের সভ্যাদিগকে মরালিষ্ট বলিয়া ক্ষেপাইত।

মেজদি আর সেজদি

ধীরেনের দুই দিদি, মৃণালিনী দেবী আর পঙ্কজিনী দেবী। ইহারা দুই বোন জমজ। একজনকে আর একজন হইতে পৃথক করিয়া দেখা মুস্কিল হইত। ধীরেনের সঙ্গে আমিও তাহাদিগকে মেজদি আর সেজদি বলিয়া ডাকিতাম। এই মেজদি ও সেজদির কথা না লিখিলে আমার জীবন কাহিনীই অসম্পূর্ণ থাকিবে। কিন্তু কোন্ ভাষায় যে আমার এত আদরের

দুই দিদির কথা লিখিব তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। দূর্গা পূজার দিন এই দুই দিদি একই রঙের দু'খানা শাড়ী পরিয়া সারা বাড়ি ভরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। সেই ত কত কালের ঘটনা। আজও দূর্গা পূজার ঢোলের বাগ্ন শুনিলে আমার সেই দুই দিদিকে আমার মানস-চক্ষে স্পষ্ট দেখিতে পাই। কপালে কাঁচ-পোকার ফোঁটা, মাথায় সিন্দুর। হাসি-খুশী মুখে যেন সেই আগের মতই তাহারা দুই বোনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

এই দুই দিদি আড়াআড়ি করিয়া আমাকে আদর করিতেন। কোন খাবার জিনিস এ দিদি যদি গোপনে আনিয়া আমাকে দিলেন, অপর দিদি তার নিজের ভাগটি সমস্তই আমার হাতে ঢালিয়া দিলেন। দিদিরা তাহাদের আপনাপন স্বামীর কাছে যত পত্র লিখিতেন সবই আমার হাত দিয়া পোষ্ট করাইতেন। একবার মেজদি একখানা অতি রঙ্গিন চিঠি আনিয়া আমাকে পোষ্ট করিতে দিলেন। বালক-বয়সের কৌতুহল অতিক্রম করিতে পারিলাম না। সেই চিঠিখানা খুলিয়া পড়িলাম। কত সুন্দর সুন্দর কথা লিখিয়াছেন দিদি তাঁর বরকে, "তুমি মিনুকে মোটেই ভাল-বাস না। সেবার তোমাকে খুকুর জন্য অমুক রঙের জামা কিনিয়া দিতে বলিয়াছিলাম। তা দিলে না। গত মাসে তুমি আস নাই। এবার কিন্তু অবশ্য অবশ্য আসিবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।" সেই চিঠি বন্ধ করিয়া আবার পোষ্ট অফিসের বাক্সে ফেলিয়া দিয়াছিলাম। এই দিদি এখন পশ্চিম বঙ্গের কোথায় আছেন জানি না। আমার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তখনকার সেই ছোট ভাইটিকে হয়ত তিনি ক্ষমা করিবেন, কিন্তু এই পরিণত বয়স্ক ভাইটি যে আজ তাঁহার গোপন কথা পাঠক সমাজে প্রচার করিয়া দিল, ইহার জন্য তিনি কি শাস্তি দিবেন জানি না, কিন্তু সেই শাস্তির দিনটির জন্য আমি অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিব। সেই শাস্তি উপলক্ষ্য করিয়া আবার হয়ত সেদিন দিদির সেই অলক্তক রঞ্জিত পা দুইটি দেখিতে পাইব।

সেজদি

সেজদি ছিলেন আমার আরও আপনজন। তাঁর কথা লিখিতে আমার দুই চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। কত ভাবে কত কৌশলেই যে দিদি আমাকে সাহায্য করিতেন আজ তার সব মনে পড়িতেছে না। তখন নদীতে বাড়ি ভাঙিয়া আমার পিতা একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছেন। বই-খাতা-পত্র কিনিতে পারি না। কিন্তু আমাদের পারিবারিক মর্যাদা বোধের জন্য কাহারো নিকট কোন সাহায্য চাহিতে আমার আত্ম-অহঙ্কারে বাধিত। দিদি ইহা বুঝিতেন। তাই এটা-ওটা কিনিবার জন্য দিদি আমাকে বেশী টাকা দিয়া বাজারে পাঠাইতেন। তাঁহার জিনিসগুলি কিনিয়া আনিয়া বাকী সিকি-আধুলীগুলি দিদিকে দিতাম। দিদি তাহা কিছুতেই লইতেন না। স্নেহের সঙ্গে বলিতেন "সাধু। এই সিকি-আধুলি গুলি দিয়া তুমি বই-পত্র কিনিও, অথবা কিছু কিনিয়া খাইও।" প্রথম প্রথম আপত্তি করিতাম। দিদি কিছুতেই শুনিতেন না। ইহার পর দিদির এটা ওটা কিনিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত তাহা পাওয়া আমার কাছে একটা রেওয়াজ হইয়া উঠিল। কোন কোনদিন দিদির দশ টাকার বাজার করিতে যাইয়া আমার পাঁচ-ছয় টাকা পর্যন্ত প্রাপ্য হইত।

একবারের কথা মনে আছে! সেদিন মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছিল। বাড়ি যাইয়া খাইয়া আসিতে পারি নাই। মা আমাকে খাইতে বলিলেন। বারান্দার এক স্থানে আমার খাইবার জায়গা হইল। তাহারই পাশে দুইটি ছাগল বাঁধা ছিল। ঠাকুর পাতে ভাত দিয়া তরকারী আনিতে গেল। ইতিমধ্যে ছাগল দুইটি আসিয়া সেই পাতায় মুখ দিয়া ভাতগুলি ওলট-পালট করিয়া ফেলিল। তখন বাড়ির সকলেরই খাওয়া শেষ হইয়াছে। একমাত্র সেজদির খাওয়া বাকী আছে। দিদি টের পাইয়া ঠাকুরকে কানে কানে কি বলিলেন। ঠাকুর সেজদির জন্য রক্ষিত ভাতগুলি আনিয়া আমাকে দিবার জন্য প্রস্তুত হইল। আমি কত বলিলাম, "দোহাই সেজদি! ও ভাত আপনি আনাইবেন না। আমার পেটে

ক্ষুধা নাই।" ঠাকুর ইতস্ততঃ করিতেছিল। সেজদি নিজে ঠাকুরের হাত হইতে ভাতের থালা আনিয়া পরিপাটি করিয়া আমাকে বাড়িয়া দিলেন। আমি বার বার করিয়া বলিলাম, "না সেজদি! এ ভাত আমি খাইব না।" সেজদি জোর করিয়া আমার হাতটি ধরিয়া সেই ভাতের সামনে আমাকে বসাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, "ও সাধু! আমার মাথা খাও যদি এ ভাত তুমি না খাও।" কত কালের কথা! কিন্তু আজও যেন সেই করুণাময়ীর কথাগুলি আমার কানে বাজিতেছে, "ও সাধু! আমার মাথা খাও, যদি এ ভাত তুমি না খাও।" সেদিন আমারই জন্য এই স্নেহময়ী দিদিটি অভুক্ত রহিলেন।

সেজদি আমার কবিতার বড়ই অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল এক কালে আমি একজন খুব বড় কবি হইব। নতুন কোন কবিতা লিখিলে তিনি তাহা সুন্দর অক্ষরে নকল করিয়া বাড়ির সকলকে পড়িয়া শুনাইতেন। তাঁহার পিতা যে এমন ডাকসাইটে রাশভারী মানুষ ছিলেন তাঁহাকেও তিনি আমার কবিতা না শুনাইয়া ছাড়িতেন না। দিদির মুক্তার মত অক্ষরে নকল করা কত কবিতাই সেকালে মাসিক পত্রিকায় পাঠাইয়াছি। সেগুলি ছাপা হয় নাই। দিদি বলিয়াছেন, "সাধু! তুমি দুঃখ পাইও না। এতটুকু ত তোমার বয়স। আরও ভাল করিয়া লেখ। নিশ্চয় একদিন তোমার কবিতা ছাপা হইবে।"

সেবার দিদির টাইফয়েড হইল। খুব ভীষণ অসুখ। তখনও আমি সেবাকার্যে পারদর্শী হই নাই। শরৎচন্দ্রের রামের সুমতি গল্পের নায়কের মত আমি দরজার সামনে বসিয়া থাকি। আল্লার কাছে প্রার্থনা করি, "খোদা! আমার দিদিকে ভাল করিয়া দাও।"

জ্বরের ঘোরে যেদিন দিদি প্রলাপ বকিতে লাগিলেন। ডাক্তার বলিলেন, "রোগিণীর মাথায় বরফের আইস-ব্যাগ দিতে হইবে।" ফরিদ-পুরে তখন বরফ পাওয়া যায় না। আমি দিদির পিতা শ্রীশবাবুকে বলিলাম, "রাজবাড়িতে বরফের কল আছে। মাছের বেপারীরা সেই বরফ দিয়া কলিকাতায় মাছ চালান করে। আমি সেখান হইতে বরফ আনিয়া দিতে পারি।" এই মেয়েটিকে শ্রীশবাবু বড়ই ভালবাসিতেন। তিনি আমাকে দশটি টাকা দিয়া রাজবাড়ি পাঠাইলেন।

দিদির অসুখে আমি যে কিছু করিতে পারিতেছি ইহা আমার কাছে একটি বরের মত মনে হইল। রাজবাড়ি যাইবার ট্রেনে বসিয়া কেবল মনে হইতেছিল, আমি যেন শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণের জন্য বিশল্য করণী আনিতে চলিয়াছি। আমার সারা অঙ্গ ভরিয়া প্রার্থনার সুর বাজিতেছিল, "খোদা! আমার সেজদিকে ভাল করিয়া দাও।" সন্ধ্যা বেলায় আধ মণ বরফ লইয়া অম্বিকাপুর ষ্টেশনে নামিলাম। দিদির জন্য কেনা এই বরফ কোন কুলীর মাথায় দিয়া লইয়া যাইব না। আমি নিজে বরফের বস্তা মাথায় করিয়া পথে রওয়ানা হইলাম। সেই বয়সে আধ মণ ভার মাথায় করিয়া বহিবার শক্তি তেমন হয় নাই, কিন্তু দিদির জন্য যে-কোন কষ্ট আমার কাছে কষ্ট বলিয়া মনে হইল না। বরফের পানিতে সমস্ত জামা-কাপড় ভিজিয়া গেল। কে তাহা গ্রাহ্য করে! আরো জোরে—আরও দ্রুত আমাকে চলিতে হইবে। এই বরফ পাইয়া আমার সেজদি ভাল হইবেন। আমার এত আদরের সেজদি—আমার এত মমতা-মাখান সেজদি।

বরফের পানিতে ভিজিয়া অতি ক্লান্ত হইয়া শ্রীশবাবুর বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। শ্রীশবাবু এত যে ভার-ভাত্তিক লোক ছিলেন তিনিও আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। আমার মত সকলেরই তখন ধারণা হইল, এই বরফ পাইয়া দিদি ভাল হইয়া উঠিবেন।

সত্য সত্যই দিদি ধীরে ধীরে সারিয়া উঠিতে লাগিলেন। ভাল হইয়া দিদি আমাকে একদিন ডাকিয়া বলিলেন, "সাধু! তুমি আমার জন্য কেন এত কষ্ট করিয়া বরফ আনিতে গিয়াছিলে?" আমি কোন কথাই বলিতে পারিলাম না। আমার চোখ দুইটি মাত্র অশ্রু-সজল হইয়া উঠিল। মনে মনে বলিলাম, "আমার লক্ষ্মীমণি সেজদি—সোনামণি সেজদি—তোমার অসুখ সারাইবার জন্য আমি মহাসমুদ্রে ঝাঁপ দিতে পারিতাম, হিমালয় পর্বত ডিঙাইয়া যাইতে পারিতাম।"

সেজদির বর ছিলেন বাবু গণেশচন্দ্র ঘোষাল। তাঁকে আমি গণেশদা বলিয়া ডাকিতাম। তাঁহার নিজের কিছু সাহিত্য-রুচি ছিল। তিনিও সেজদির মত আমার লেখার খুব অনুরাগী ছিলেন। প্রাইভেট মাষ্টারের মত তিনি আমার পড়া বলিয়া দিতেন। সেকালের লেখা আমার বহু

কবিতায় তাঁহার সংশোধনের ছাপ আছে।

সেবার দিদি শ্বশুর বাড়ি যাইবেন। পাবনা জেলার পলশাটিয়া গ্রামে দিদির শ্বশুর বাড়ি। দিদিকে আগাইয়া দিয়া আসিলাম। দিদি বার বার করিয়া বলিয়া দিলেন, "সাধু! তুমি অবশ্য আমাকে পত্র লিখিও।"

দিদি চলিয়া গেলে সমস্ত বাড়ি ভরিয়া যেন একটা বিষাদের ছায়া ঘনাইয়া আসিল। এই মেয়েটি সহজ স্নেহ-প্রবণতায় বাড়ির সবগুলি লোককে আপন মমতায় আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। বাড়ির ঠাকুর চাকর হইতে আরম্ভ করিয়া ভাই-বোন বাপ-মা এমনকি পাড়া-প্রতিবেশীরা পর্যন্ত এই মেয়েটিকে সবচাইতে আপনার বলিয়া ভাবিত। খাতা-কলম লইয়া দিদির কাছে পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলাম। সেই পত্রে বালক-কালের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে ভবিষ্যত-জীবনে আমি কি করিব—কি করিয়া দেশের অসহায় দুস্থ লোকদের সামনে যাইয়া সেবার মূর্তি হইয়া দাঁড়াইব, এমনি বড় বড় কথা সুদীর্ঘ ত্রিশ পৃষ্ঠাব্যাপী পত্রে ভর্তি হইয়া উঠিল। আমার সেই পত্র পাইয়া দিদি মাত্র এক পৃষ্ঠার একটি ক্ষুদ্র পত্র লিখিলেন। যে দিদিকে ছাড়িয়া এমন অভাব বোধ করিতেছি, দিদি যে আমার জন্যও তেমন করিতেছেন এমন কোন কথার আভাসই সেই পত্রে পাইলাম না ইহাতে মনে মনে কিছু অভিমান হইলেও দিদিকে মনে মনেই ক্ষমা করিলাম। হয়ত শ্বশুর বাড়িতে দিদির খুব কাজ। বড় করিয়া পত্র লিখিতে অবসর পান নাই। ইহার পরে হয়ত আমাকে আরও বড় পত্র লিখিবেন।

প্রায় তিন চার মাস পরে সেজদি শ্বশুর বাড়ি হইতে ফিরিবেন। খবর পাইয়া শ্রীশবাবু তাঁকে আগাইয়া আনিতে আমাকে গোয়ালন্দ পাঠাইলেন। খুব খুশীর সঙ্গে গোয়ালন্দ রওয়ানা হইলাম। পদ্মা নদী দিয়া আমাদের ষ্টীমার চলিল। দুই পাশে বালুচরে কাশ ফুল ফুটিয়াছে। সন্ধ্যা-মেঘের মত রঙিন হইয়া উঠিয়াছে চরের সদ্য-ফোটা ফুলভারে নত ঝাউগাছগুলি। আমার সেজদির গায়ের বর্ণেই যেন ছড়াইয়া পড়িয়াছে সেই ঝাউগাছগুলিতে। কতকাল পরে আবার সেজদিকে দেখিব। আমার সেজদি—আমার সোনার সেজদি। কত গ্রাম-বন্দর-নদী-নালা ছাড়াইয়া জাহাজ ছুটিয়া চলিয়াছে। তবু আমার মন বলে, আরও যদি একটু জোরে জাহাজ চলিত—পাখির মত যদি আকাশে ডানা মেলিয়া উড়িয়া

যাইতে, পারিত, তবেই যেন মনের আশা মিটিত। আরও কিছু আগে যাইয়া দিদিকে দেখিতে পাইতাম।

গোয়ালন্দে আসিয়া শুনিলাম এক ঘণ্টা পরে কালিগঞ্জের ষ্টীমার আসিবে। কালিগঞ্জের ঘাটে যাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। ষ্টীমার আসিয়া ঘাটে ভিড়িল। দলে দলে লোক নামিয়া গেল। তাহাদের মধ্যে আমার সেজদিকে দেখিতে পাইলাম না। ষ্টীমারের লোকগুলি যেন আমার বুকের উপর দিয়া হাটিয়া যাইতে প্রত্যেকের পদাঘাতে একটি একটি করিয়া নিরাশার আঘাত হানিয়া গেল। শেষ লোকটি যখন ষ্টীমার হইতে নামিয়া গেল তখন অতি বড় একটি দীর্ঘ নিশ্বাস আমার বুক হইতে বাহির হইল।

সারারাত্র রাজবাড়িতে মশার কামড় সহ্য করিয়া পরদিন ফরিদপুরে শ্রীশবাবুর বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মরি মরি! সেজদি দরজার সামনে দাঁড়াইয়া হাসিমুখে আমাকে সম্ভাষণ করিলেন। ভীড়ের মধ্যে আমি সেজদিকে দেখিতে পাই নাই। রাত্রের গাড়ীতেই তাঁহারা আসিয়া পোঁছিয়াছেন।

এতদিন শ্বশুর বাড়িতে থাকিয়া সেজদির চেহারা আরও সুন্দর হইয়াছে। বাড়ির সবাই আজ সেজদিকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন তাঁর শ্বশুর বাড়ির কথা শুনিতে। মা যে এত কথা বলেন তিনিও আজ মনোযোগী শ্রোতা। সেজদি একে একে তাঁর শ্বশুর বাড়ির কাহিনী বলিতে লাগিলেন। তাঁর ভাসুরদের কথা দেবরদের কথা, ঠাকুরঝিদের কথা। কি আর এমন শুনিবার আছে তাহার মধ্যে। কিন্তু সেজদির মুখে তাহারা যেন সুন্দর হইয়া রূপ পাইয়াছে। শ্রোতারা এক নিশ্বাসে সব শুনিতেছে,—একটি সুখী পরিবারের কাহিনী। এই গৃহের মেয়েটি যেন তাঁর সুখী বধূ-জীবনের সঙ্গে সেই কাহিনীকে তাঁহার স্নেহ-মমতায় গাঁথিয়া আনিয়াছেন।

পলশাটিয়া গ্রামে সেই ঘোষাল-বাড়ি। সেখানে বারো মাসে তের পার্বণ। অসময়ে অতিথি আসিলে বাড়ির মেয়েরা না খাইয়া অতিথিকে খাওয়ায়। ঘাটলায় স্নান করিতে যাইয়া পাড়ার সমবয়সী বধূদের সঙ্গে

ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করে। পলশাটিয়া গ্রামের ছেলেরা মাঝে মাঝে থিয়েটার করে। সেই থিয়েটারের গান ঃ

"ভাঙা ঘরে মন টেকে না করি কি, করি কি ?"

এই গানটি সেজদির মুখে এমন শোনাইল সেদিন !

এবার সেজদির বর গণেশবাবু কলিকাতা হইতে বি, এ, পাশ করিয়া আসিলেন। আর সেজদিকে শ্বশুর বাড়ি যাইতে হইবে না। গণেশ বাবু এখানে থাকিয়াই চাকরি-বাকরির চেষ্টা করিবেন।

আমি যে ঘরে থাকিয়া পড়াশুনা করি, সেজদিরা থাকেন তারই পাশের ঘরে। আমাদের পড়াশুনা শেষ হইলে মাঝে মাঝে সেজদি আসিয়া আমাদের সঙ্গে গল্প করেন।

সেবার সেজদির খুব আমাশা হইল। ঘণ্টার ঘণ্টায় তাঁহাকে বাথ-রুমে যাইতে হয়। সেই বাথ-রুম শোয়ার ঘর হইতে অনেক দূরে। সঙ্গে হারিকেন ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকি বাথ-রুমের বাহিরে। হাত-মুখ ধুইয়া সেজদি আবার ঘরে প্রবেশ করেন। রাত গভীর হইতে গভীর-তর হয়। পূব আকাশে উদয়তারা দেখা দেয়। চারিদিকে জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নাই। অন্ধকারে হারিকেন ধরিয়া থাকি। সেজদির জন্য রাত জাগিতেও ভাল লাগে। এই নিস্তব্ধ রজনী সাক্ষ্য হইয়া থাকে এই দুইটি রক্তসম্পর্কহীন ভ্রাতা-ভগিনীর স্নেহমমতার ; সেজদির বর গণেশ বাবু তখনও অঘোরে ঘুমাইয়া। এত কথা আজ এমন করিয়া লিখিতাম না। সেকালে মানুষের প্রতি মানুষের কত বিশ্বাস ছিল ; আজকের বিশ্বাসহীন সমাজের লোকেরা একথা জানিয়া রাখুক, এই জন্যই এ প্রসঙ্গের অবতারণা।

সেজদির একটি মেয়ে হইল। এমন সুন্দর ফুলের মত রাঙা টুকটুকে মেয়েটি। হঠাৎ তার অসুখ হইল। এই অসুখে আমি সেজদির সঙ্গে সারারাত জাগিতাম। মেয়েটি মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িল ! একমাত্র আমি আর সেজদিই তার জন্য কাঁদিলাম। আত্মীয়-স্বজনেরা বলিল, "কুলীনের ঘরের মেয়ে। মরিয়া ভালই হইয়াছে। এই মেয়ে বিবাহ দিতে বরকে মোটা টাকার পণ দিয়া বাপ-মাকে ফতুর হইতে হইত। সেকালে হিন্দু সমাজের পিতা-মাতা মেয়ে হইলে মুখ ভার করিয়া

বসিয়া থাকিতেন। কারণ মেয়ের বিবাহে বাপ-মাকে গহনাসহ বহু টাকা জামাইকে পণ দিতে হয়। এখনও হিন্দু সমাজে এই রীতির পরিবর্তন হয় নাই। আমাদের মুসলিম সমাজে আগেকার দিনে মেয়ের বিবাহ দেওয়ায় বাপ-মাকে কোন সমস্যারই সম্মুখীন হইতে হইত না। আমরা পরপর তিন ভাই জন্মিলাম। মাঝখানে আমার একটি বোন মারা গেল। একটি মেয়ের জন্য মা আমার আকুলি-বিকুলি করিতেন। বাড়িতে চুড়িওয়ালা আসিলে মা অন্যান্য প্রতিবেশীদের মত মেয়ের জন্য চুড়ি কিনিতে পারিতেন না। আমার ছোট ভাই সৈয়দ উদ্দীনকে ছেলে-বেলায় মা চুড়ি পরাইয়া সেই সখ মিটাইতেন। এরপর আমার বোনদের জন্ম হইলে মার সেই সাধ ষোলকলায় পূর্ণ হইয়াছিল। সেকালে আমাদের সমাজে এমনই মেয়ের আদর ছিল। আজও বোধ হয় তাহা কমে নাই।

সেজদি সুন্দর গান গাহিতে পারিতেন। তাঁর গাওয়া একটি গান আজও আমার মনে পড়িতেছে ঃ

"কেন দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার
গানের ও-পারে,
আমার সুরগুলি পায় চরণ তোমার
পাইনে তোমারে।"

আজও যেন সেজদির কণ্ঠে এই গান শুনিতে পাইতেছি। বছর বিশেক আগে সেজদিরা পশ্চিম বঙ্গে চলিয়া গিয়াছেন। কোথায় কোন্ ঠিকানায় তাঁহারা আছেন জানিনা। বহুকাল তাহাদের সঙ্গে দেখা-শোনা হয় না। আজও দুর্গাপূজার ঢোলের বাদ্য শুনিলে আমার সেজদি আর মেজদিকে আমি মানসচক্ষে দেখিতে পাই। কপালে কাঁচ-পোকার ফোঁটা, মাথায় সুন্দর সিন্দুরের শোভা আর আলতায় রঞ্জিত রাঙা টুকটুকে পা দু'খানি। আর কি জীবনে তাঁহাদের সঙ্গে দেখা হইবে? সেই স্নেহ-ভরা ভাই ডাকটি শুনিবার জন্য আজও আমার মন আকুলি-বিকুলি করে।

সেবা-সমিতির সভ্য হিসাবে

শ্রীশবাবুর বাসায় থাকিতেই আমি ফরিদপুর সেবা-সমিতির সভ্য হইয়া পড়িলাম। এই সেবা-সমিতির সভ্যদের সঙ্গে শহরের বহু বাড়িতে রোগীর সেবা করিয়া আমি, কি করিয়া রোগীকে খাওয়াইতে হইবে, কেমন করিয়া মাথা ধোয়াইতে হইবে, নিউমোনিয়া হইলে কি ভাবে মশ.নের পুলটিশ দিতে হইবে, আকনের পাতায় পুরাতন ঘি মাখাইয়া কি ভাবে রোগীকে সেঁক দিতে হইবে প্রভৃতি ভালমত শিখিয়া ফেলিলাম। আমি যে পরিণামে একজন লেখক হইব সেই কল্পনা তখনও আমার মনে দানা বাঁধে নাই। সন্ন্যাসী ঠাকুরের ভক্ত হইয়া সেই যে মনে মনে ঠিক করিয়াছিলাম, আমি তাঁহারই মত সন্ন্যাসী হইয়া সেই চির তুষার-ময় হিমালয়ের পথে ঘুরিয়া বেড়াইব, সেই কল্পনা এখনও আমার মন হইতে মোছে নাই।

শ্রীশবাবুর বাসায় আসিয়া কিরণ দাদার প্রভাবে রামকৃষ্ণ মিশনের বহু বই পড়িয়া ফেলিলাম। আর সেবা-সমিতির বন্ধুদের সঙ্গে মিশিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম, আমার সারা জীবন পরের সেবা করিয়া কাটাইব। তখনকার জীবনে বই-পুস্তকে কোন বড় আদর্শ চরিত্রের সন্ধান পাইলে তাহারই অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিতাম। বিদ্যাসাগরের জীবনী পড়িয়া জানিতে পারিলাম, তিনি কুলী হইয়া লোকের মোট বহন করিতেন। আমাদের বাড়ির সামনেই রেল-ষ্টেশন। তাহারই অনুকরণে কতদিন কত লোকের মাল-পত্র মাথায় করিয়া বহিয়া ঘোড়ার গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়াছি। একবার এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁর মেয়েকে লইয়া গাড়ি হইতে নামিলেন। মাল-পত্র লইয়া তিনি কিছুতেই সামলাইয়া উঠিতে পারিতে-ছিলেন না। আমি যাইয়া বলিলাম, "বড় সুটকেশটি আমাকে দিন। আমি ঘোড়ার গাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিতেছি।" ভদ্রলোক ইতস্ততঃত করিতে ছিলেন। মেয়েটি বলিল, 'বাবা! দাও এঁর মাথায়। এঁরা মানুষ

নয়, দেবতা। এমনি করিয়া এঁরা পরের উপকার করেন।' আমি মাথায় করিয়া সুটকেশটি ঘোড়ার গাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিলাম। মেয়েটি কৃতজ্ঞ নয়নে আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

আরও একদিনের ঘটনা মনে পড়িতেছে। একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে লইয়া গাড়ী হইতে নামিলেন। সঙ্গের বোঝাটি কিছুতেই বহন করিতে পারিতেছেন না। সাজ-পোষাক দেখিয়া মনে হইল তাঁহারা বড়ই গরীব। ষ্টেশন হইতে শহরের পথ দুই মাইলেরও বেশী। এত বড় বোঝাটি এই বৃদ্ধ কেমন করিযা দুই মাইল পথ বহিয়া লইয়া যাইবেন! ঘোড়ার গাড়ীতে যাইবার অর্থ-সম্পদ তাঁহাদের নাই। আমি ভদ্রলোকের বোঝাটি বহিয়া লইয়া শহরে পৌঁছাইয়া দিতে রাজী হইলাম। খুশী হইয়া তাঁহারা আমার মাথায় বোঝাটি তুলিয়া দিলেন। আমি আগে আগে যাইতেছি। তাঁহারা পিছে পিছে আসিতেছেন। বুড়া-বুড়ী আমার মত দ্রুত হাঁটিতে পারেন না। আমি খানিক আগাইয়া যাইয়া তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করি। এমনি করিয়া যখন আলীপুরের মোড়ে আসিয়াছি, সামনে দেখিলাম আমার পিতা তিন চারজন বন্ধুর সঙ্গে গল্প করিতে করিতে বাড়ির পথে ফিরিতেছেন। মাথায় করিয়া পরের মোট বহন করিয়া লইয়া যাইতেছি দেখিলে বাজান কি মনে করিবেন এই ভয়ে আমি ত পথের বামধারের আকবরের ভিটার জঙ্গলে প্রবেশ করিলাম। এদিকে বুড়া-বুড়ী মনে করিলেন তাঁহাদের মোট লইয়া আমি পালাইয়া যাইতেছি। তাঁহারা শোরগোল আরম্ভ করিলেন, "তোমরা দেখ, একটি কুলী আমাদের মাল-পত্র লইয়া এই জঙ্গলের পথে পালাইল।"

শুনিয়া আমার পিতা তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে ছুটিয়া আসিলেন। বুড়া-বুড়ী সমানে চীৎকার করিতেছেন। সেই চীৎকারে আরও লোকজন আসিয়া বন-জঙ্গল তোলপাড় করিয়া তুলিল। আমি ত মোটসহ এক ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া ভয়ে কাঁপিতেছি। না-জানি এই অবস্থায় দেখিয়া বাজান আমাকে কি বলিবেন!

পড়বি ত পড়—পরিশেষে বাজানের চক্ষেই আমি আগে পড়িলাম। তিনি হাত ধরিয়া সেই ঝোপের ভিতর হইতে আমাকে টানিয়া আনিলেন। বোচকাটি তখনোও ঝোপের ভিতর। সমস্ত ব্যাপারটি তখন পরিষ্কার

হইয়া গেল। জসীম সাধু বলিয়া গ্রামে আমার নাম ছিল। বাজানের বন্ধুরা সেই বুড়া-বুড়ীকে সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। তবু তাঁহারা আমাকে আর মাল বহিয়া লইয়া যাইতে দিলেন না। বাজান ঘাড় ধরিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে আমাকে বাড়ি লইয়া আসিলেন। পথে বলিতে বলিতে আসিলেন, "পড়াশুনার নাম নাই, কেবল আজে-বাজে কাজ লইয়া সময় কাটাও।" কিন্তু মনে মনে তিনি আমার এই ব্যাপারে খুশীই হইয়াছিলেন। ইহার পরে বহু বন্ধু সমাগমে তিনি প্রায়ই এই কাহিনীটি অতি সমারোহ করিয়া বলিতেন।

সেবা-সমিতির সঙ্গীরা অনেকেই ছিলেন বিপ্লবী দলের সভ্য। তাঁহারা রোগীর সেবা করিতেন কর্তব্যবোধে; মনের সহজ মমতা-প্রবণতা লইয়া নয়। কোন রোগীর অবস্থা সঙ্গীন হইলে আত্মীয়-স্বজনেরা যখন কান্নাকাটি করিত তখন তাঁহারা পরস্পরে হাসি-তামাসা করিতেন। পাছে তাহাদের দুঃখে অনুপ্রাণিত হইয়া কর্তব্যকার্যে অবহেলা হয় এই ভয়ে তাঁহারা এরূপ করিতেন।

একবার একটি ছোট ছেলের মৃত্যু হয়। মা কিছুতেই তাহাকে কোল হইতে ছাড়িয়া দিবেন না। শ্মশান-যাত্রীরা অপেক্ষা করিতেছে। কেহই মায়ের বুক হইতে বাছাকে ছিনাইয়া আনিতে পারে না। মা বার বার বলিতেছে, "আমার বাছা ঘুমাইয়া আছে। কে বলে সে মরিয়াছে? এখনই ডাক দিলে জাগিবে।" সেবা-সমিতির সভ্যেরা দুই তিনজনে জোর করিয়া মায়ের কোল হইতে মৃত ছেলেটিকে কাড়িয়া লইয়া আসিল। তারপর পরস্পরে হাসি বিনিময় করিল। ইহা আমার ভাল লাগিত না। রোগীর সামনে বসিয়া আমি সেবা করিতে করিতে আল্লার কাছে প্রার্থনা করিতাম। যদি কোন রোগী আমার হাতে মারা যাইত, মনে মনে ভাবিতাম, আমার প্রার্থনায় বুঝি ভুল হইয়াছে। অমুক সময় আমি রোগীর কাছে ছিলাম না। তখনও যদি থাকিয়া প্রার্থনা করিতাম তবে রোগী মরিত না। একবার আমার সেবায় অনেকগুলি রোগী ভাল হইয়া উঠিল। আমার বন্ধু ধীরেনের তখন ধারণা হইল, আমি যে রোগীর সেবা করিব, সে নিশ্চয়ই ভাল হইয়া উঠিবে। তাহাদের বাসায় কাহারও কোন অসুখ হইলে সে তাই আমাকে সেবা করিবার ভার দিত। একবার

আমার' হাতে পাঁচ ছয়টি রোগী মারা গেল। তারপর ধীরেনদের বাসায় কোন রোগীর সেবা করিতে আসিলে সে আমাকে নিষেধ করিত।

ফরিদপুরের বন্ধু-কুটিরে একটি নতুন ভাড়াটে আসিল। সেই বাসার সামনে দিয়া আমার কলেজে যাওয়ার পথ। রোজ দেখিতাম শহরের বড় বড় ডাক্তারেরা সেই বাড়িতে আনাগোনা করে। ভাবিলাম, এই বাড়িতে নিশ্চয় কোন গুরুতর ব্যাধিগ্রস্ত রোগী আছে। নিশ্চয়ই এই রোগীর সেবা করিবার লোকের অভাব। একদিন বৈকালে সেই বাড়িতে যাইয়া কড়া নাড়িলাম। একজন যুবক আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনাদের বাড়িতে কাহারও অসুখ হইয়াছে কি?" যুবকটি বলিল, "আমার বড় ভাইয়ের প্লুরেসিস। দেখুন, এই বিদেশে তাহাকে চিকিৎসার জন্য লইয়া আসিয়াছি। কয়েক রাত জাগিয়া আমরা একেবারে হয়রান হইয়া পড়িয়াছি। দেশে থাকিলে আত্মীয়-স্বজনেরা আসিয়া সাহায্য করিত। এই বিদেশে কাকেই বা চিনি আর কারই বা সাহায্য চাই?"

আমি বলিলাম, "আজ রাতে আসিয়া আমি রোগীর সেবা করিব। আপনারা আজিকার মত ঘুমাইয়া লইতে পারিবেন।"

বাড়ি হইতে খাইয়া-দাইয়া রাত আটটার সময় বন্ধু-কুটিরের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বন্ধু কুটিরের পাশেই ছিল হেল্‌থ অফিসারের বাসা। সেখানে আমার সহপাঠী শ্রীশ ঘোষ থাকিত। আমি শ্রীশের সঙ্গে দেখা করিয়া বলিলাম, "পাশের বাড়িতে আমি রোগীর সেবা করিতে আসিয়াছি। শেষ রাতে আসিয়া তোমার বিছানায় শুইয়া খানিক ঘুমাইব। আমি আসিয়া ডাক দিলে দরজা খুলিয়া দিও।" শ্রীশ বলিল, "আচ্ছা! তুমি আসিয়া আমাকে ডাক দিও।"

বন্ধু-কুটিরে যাইতেই একজন দরজা খুলিয়া দিল। বাড়ির লোকেরা সত্যই আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। দেখিলাম, দুই তিনজন লোক রোগীকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। তাহারা মাঝে মাঝে ঘুমে ঝিমাইতেছে। রোগীর মাথার কাছে একটি বধূ বসিয়া বাতাস করিতেছে। প্রথমে আমি তাহাদের নিকট হইতে জানিয়া লইলাম, রাত্রে রোগীকে কি কি ঔষধ খাওয়াইতে হইবে। তারপর বাড়ির লোকদিগকে বলিলাম, "আজিকার

মত আপনারা যাইয়া ঘুমান। শেষ রাত্রে আসিয়া রোগীর পাশে বসিবেন। এখনকার মত রোগীর ভার আমার উপর ছাড়িয়া দিন।" শুনিয়া বাড়ির লোকেরা খুশী হইল। সেকালে যক্ষ্মা রোগের উপশমের জন্য এখনকার মত পেনিসিলিন প্রভৃতি ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই। ডাক্তার নির্দেশ দিয়াছিলেন নেকড়ায় জড়ানো একটি ঔষধের পোঁটলা রোগীর নাকের সামনে ধরিয়া রাখিতে হইবে। একটি লোক বসিয়া বসিয়া তাহাই করিতেছিল। রোগীর কোন জ্ঞান নাই। মাঝে মাঝে আহা-উহু করিতেছে। শুনিলাম, গত তিন চারদিন ধরিয়াই রোগীর এই অবস্থা। আমি সেই লোকটির হাত হইতে ঔষধের পোঁটলাটি লইয়া রোগীর নাকের কাছে ধরিলাম, বধূটির নিকট হইতে পাখাটি লইয়া অপর হাতে রোগীকে বাতাস করিতে লাগিলাম।

তারপর বাড়ির লোকদের বলিলাম, "আপনাবা এখন যাইয়া ঘুমান। দরকার হইলে আপনাদিগকে আমি ডাক দিব।" একে একে বাড়ির লোকেরা সকলেই চলিয়া গেল। বধূটি কিন্তু গেল না। রোগীর পায়ের কাছে যাইয়া সে বসিয়া রহিল। আধ ঘোমটার আড়াল হইতে তাহার রাঙা টুকটুকে মুখখানি দেখিতে পাইলাম। সেই মুখে কত কালের বিষাদই যেন মাখিয়া রহিয়াছে। লোকে বলে দুঃখ সুন্দর মুখে বড়ই শোভা বিস্তার করে। সেই শোভাই যেন এই বধূটিকে আরও সুন্দর করিয়াছে। অযত্ন বিন্যস্ত মাথার চুল রুক্ষসূক্ষ্ম, পরনে আটপৌরে একখানা শাড়ী। সেই শাড়ীর রাঙাপাড় বধূর অলক্তক বিহীন পায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। চারিদিকে রজনীর নিস্তব্ধতা! এককোণে একটি মাটির প্রদীপ ঘুরিয়া ঘুরিয়া জ্বলিতেছে। তারই সামনে এই মৃত্যু-পথ-যাত্রী রোগী দারুণ রোগ যন্ত্রণার সঙ্গে ধুঁকিতেছে। ওধারে বধূটি বসিয়া। এ যেন মৃত্যু আর সুন্দর পাশা-পাশি বসিয়া আছে। দুঃখের তুহিন সাগরে যেন রক্তমৃণালটি শোভা পাইতেছে।

বার বার আমি বধূটিকে বলিলাম, "বোন! তুমি যাও—কিছুক্ষণ ঘুমাইয়া লও। কতদিন হয়ত ঘুমাও নাই। দরকার হইলে তোমাকে ডাকিয়া আনিব।"

বধূটি কোনই উত্তর দিল না। নীরবে রোগীর পায়ের কাছে

বসিয়া রহিল। ওর সমস্ত অঙ্গ ভরিয়া যেন প্রার্থনার ধূপ জ্বলিতেছে। আস্তে আস্তে রাত গড়াইয়া যাইতে লাগিল। জেলখানার বাগান হইতে একটি রাত-জাগা পাখি সহসা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। আমি বউটিকে আবার বলিলাম, "বোন! তুমিও যদি রাত জাগিবে তবে আমি আসিলাম কেন? যাও, একটু ঘুমাইয়া আস।"

এবার বধূ স্বামীর পায়ের উপর তার সিন্দুর-রঞ্জিত মাথাটি বার বার ঠেকাইল। তার মাথার সিন্দুরের দাগে রোগীর পা দুইটি রাঙা হইয়া উঠিল। তারপর মাথার কাপড় গলায় লইয়া দুইহাত জোড় করিয়া কি প্রার্থনা করিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে লাগিল। তাও কি যাইতে চায়?—খানিক যায় আবার পিছন ফিরিয়া স্বামীর দিকে চায়।

বউটি চলিয়া গেলে আমার সমস্ত অন্তর ভরিয়া প্রার্থনার মন্ত্র বাজিতে লাগিল। এই যুবক রোগী কে জানি না। কোথায় তার বাড়ি তাহারও সন্ধান রাখি না, কিন্তু এই সুন্দব বধূটির জন্য—ওর মাথার উজ্জ্বল সিন্দুর ফোঁটাব জন্য ভগবান রহমান। এই রোগীকে তুমি ভাল করিয়া দাও। জীবনে এমন সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা কোনদিন করি নাই।

ধীরে ধীরে রাত গড়াইয়া যাইতেছিল। পাখার বাতাস করিতে করিতে এই সুন্দর বধূটির রাঙা মুখখানি বার বার আমার মনে হইতেছিল। আহা, এমন মেয়েটিকে খোদা তুমি দুঃখের সাগরে ভাসাইও না! কত-দিনই বা ইহাদের বিবাহ হইয়াছে। এদের মনে একে অপরকে বলিবার জন্য কত কথারই না মুকুল হইয়াছিল। সেই কথা ভাষার ফুলে ফুটাইয়া উহারা একে অপরকে এখনও বলিতে পারে নাই। খোদা! রহমানের রহিম! এই লজ্জা-বিনম্র বধূটিকে তার মনের কথা বলিবার সুযোগ দাও। মৃত্যু! তুমি ফিরিয়া যাও।"

জেলখানার ঘড়িতে যখন রাত চারটা বাজিল তখন বাড়ির লোকেরা জাগিয়া উঠিল। বউটি ঘুমে-ভরা চোখ মুছিতে মুছিতে স্বামীর পাশে আসিয়া বসিল। মনে মনে ভাবিলাম, "তোমার স্বামীকে যে আবার তোমার হাতে ফিরাইয়া দিতে পারিলাম, ইহাও আমার সৌভাগ্যের কথা।"

আমি ধীরে ধীরে আসিয়া শ্রীশের দরজায় ঘা দিতে লাগিলাম। অনেক ডাকাডাকির পর শ্রীশ উঠিয়া বাতি জ্বালাইল, কিন্তু দরজা খুলিয়া

দিল না। ভিতর হইতেই বলিল, "তুমি এই যক্ষ্মা রোগীর সেবা করিয়া শেষরাত্রে যে আমার বিছানায় ঠাঁই লইবে ইহা কখনো হইবার নয়।"

আমি বলিলাম, "এ রোগীর ত যক্ষ্মা হয় নাই। প্লুরেসিস হইয়াছে।" শ্রীশ বলিল, "যাহা প্লুরেসিস তাহাই যক্ষ্মা। ও-বাড়ির লোকেরা তোমাকে ভুল সংবাদ দিয়াছে। তুমি যাওয়ার পর আমি রোগীর বিষয়ে সকল খবর লইয়াছি। তার সাংঘাতিক যক্ষ্মা। আর ডাক্তারেরা বলিয়াছে, রোগীর বাঁচিবার আশা নাই।" এই বলিয়া শ্রীশ বাতি নিবাইয়া দিল। শ্রীশের ঘরের সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। এত রাত পর্যন্ত তবে আমি একজন যক্ষ্মা রোগীর সেবা করিয়াছি। যে যক্ষ্মা রোগের জীবাণু বাতাসে উড়িয়া ভাল মানুষকে সংক্রামিত করে। আর আমি কিনা সেই রোগীকে হাত দিয়া স্পর্শ করিয়াছি। সেই হাতে আবার নিজের মুখ চোখ মুছিয়াছি। তবে ত আমাব সকল অঙ্গ ভবিয়া যক্ষ্মা রোগের জীবাণু। কিন্তু এত রাত্রে এখন আমি কোথায় যাই? শহর হইতে প্রায় আড়াই মাইল দূরে আমার বাড়ি। সেই সুদীর্ঘ জনশূন্য পথে একা যাইতে সাহসে কুলায় না। কত বছর আগে আমি শ্মশানে-মশানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। তখন অভ্যাস ছিল। ভয়কে জয় করিতে পারিতাম। এখন অভ্যাস হারাইয়া ফেলিয়াছি। রেল-সড়ক পার হইলে হদু মল্লিকের তালগাছ তলা দিয়া বাড়ির পথ। সেই তালগাছে হদু মল্লিকের পুতের বউ গলায় দড়ি দিয়া মারিয়াছিল। সেই পথে বাড়ি ফিরিতে মোটেই সাহসে কুলাইতেছিল না।

তখন স্থির করিলাম, রাজেন্দ্র কলেজের বারান্দায় যাইয়া শুইয়া থাকিব। অনেক-ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহাই করিলাম। শেষ রাত্রে বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়াছে। গায়ে দেওয়ার কোন কাপড় নাই। কোঁচার খোটের অর্দ্ধেকটা শানের উপর বিছাইয়া শুইয়া পড়িলাম। একে ত গায়ে কাপড় নাই তার উপর চারিধারের উন্মুক্ত প্রান্তরের যত মশা আসিয়া আমাকে আক্রমণ করিল। যদি বা একটু তন্দ্রা আসিতে চায়, ভয়ে ভয়ে ঘুমাই না। কলেজের দারোয়ান মারু যদি এখানে অপরিচিত লোককে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া মাথায় লাঠির বাড়ি মারে তবে কি উপায় হইবে। তাহা ছাড়া শ্রীশের বর্ণিত যক্ষ্মারোগ যেন আমার আধ-তন্দ্রার ঘোরে জীবন্ত হইয়া

আমার সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। আর সামান্য ঘণ্টা দুই মাত্র রাত আছে। কিন্তু এই ঘণ্টা দুই কি আমার কাটিতে চাহে।

পূব আকাশে যখন আবছা আবিরের রেখা দেখা দিল তখন আমি উঠিয়া বাড়ির পথে রওয়ানা হইলাম। এই এত সকালেই গায়ে সাবান মাখিয়া স্নান করিয়া লইলাম। তারপর সেই বন্ধু-কুটিরের রোগীটির আর কোন খবরই লই নাই।

সাত-আট দিন পরে সকাল দশটা এগারটার সময় আমাদের অম্বিকাপুর ষ্টেশনে ঘুরিতেছি। দেখিলাম, সেই বন্ধু-কুটিরের লোকগুলি একটি কামরায় বসিয়া। জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলাম, সেই রোগীর অবস্থা এখন কেমন! আর জিজ্ঞাসা করিতে হইল না। কামরার এককোণে সাদা থান পরিধানে সেই বউটি বসিয়া। আজ তার কপালে এয়োতির প্রতীক চিহ্নস্বরূপ সেই সিন্দুর বিন্দুটি আর শোভা পাইতেছে না। রোগীর সেবা করিবার রাত্রেও বউটিকে বিযাদময়ীই দেখিয়াছিলাম। সেই বিষাদের অন্যরূপ। স্বামীকে বাঁচাইবার দুরন্ত আশা সেদিন এই বিষাদময়ীকে সুন্দরের রূপ দিয়াছিল। আজকের এই বিষাদময়ী একেবারে ভিন্ন। এই শ্বেত বসন পরিহিতা বিধবা মেয়েটির সারা অঙ্গ হইতে যেন কোন সপ্ত আকাশের করুণার শব্দহীন রাগিনী সমস্ত আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। সেই ত প্রায় চল্লিশ বৎসরের ঘটনা। কিন্তু বউটিকে যেন আজও মনে মনে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি।

রোগীর সেবা করিতে যাইয়া কত বিচিত্র রকমের লোকের সঙ্গেই না আমার পরিচয় হইয়াছে। ফরিদপুরের প্রসিদ্ধ উকীল মথুরবাবুর মেয়ের নিউমোনিয়া। জামাতা ভোলানাথ বাবু আমার শিক্ষক। বড় ভাল পড়াইতেন। আমাকে তিনি বিশেষ করিয়া স্নেহ করিতেন। যে বাড়িতে তিনি থাকিতেন সেখানে গেলাম রোগিণীর সেবা করিতে। মাষ্টার মহাশয় তখন ছিলেন না। বাড়ির কেহ আমাকে চেনেনও না। আমি রোগিণীর সেবা করিতে আসিয়াছি শুনিয়া তাঁহারা যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। এতদিন রাত-জাগিয়া তাঁহারা শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আমার দক্ষ-হাতে রোগীর পরিচর্যা দেখিয়া তাঁহারা সকলেই আমার দিকে প্রশংসাপূর্ণ দৃষ্টি মেলিলেন। একজন ত বলিয়াই ফেলিলেন, "আপনি

আসাতে আমরা বাঁচিয়া গেলাম। রোগিণীর পাশে রাত্র জাগিবার আজ কেহ নাই!" প্রায় ঘণ্টাখানেক চলিয়া গেল। আমি বসিয়া বসিয়া রোগিণীর মাথায় জল-পট্টি দিতেছি। অডিকলান লইয়া পানিতে মিশাইয়া সুদক্ষ-হাতে সেই পানিতে নেকড়া ভিজাইয়া রোগিণীর কপাল মুছাইয়া দিতেছি। এমন সময় বাড়ির লোকেরা সকলে একত্রিত হইয়া কিছুক্ষণ কি যেন পরামর্শ করিলেন। আমি দূর হইতে কেবলমাত্র 'মুসলমান' শব্দটি শুনিতে পাইলাম। কিছুক্ষণ পরে যে ভদ্রলোকটি আমাকে বলিয়াছিলেন, আজ রাত্রে রোগিণীর পাশে রাত্র জাগিবার লোক নাই, তিনি আমাকে অদূরে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, "আমাদের বাড়িতে রোগিণীর সেবা করিবার যথেষ্ট লোক আছে। আপনার থাকার কোন প্রয়োজন নাই।" আমি সবই বুঝিতে পারিলাম। নিতান্ত অপরাধীর মতই আমি সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম।

এইবার প্রতিজ্ঞা করিলাম, "বড়লোকদের বাড়িতে না ডাকিলে আর সেবা করিতে যাইব না। কত গরীব লোক বিনা চিকিৎসায় মরিতেছে। এবার হইতে তাহাদের সেবা করিব।

অম্বিকাপুর ষ্টেশনে নতুন ষ্টেশন-মাষ্টার আসিলেন বাবু উমাকান্ত ঘোষাল। নিজের কোন সন্তান-সন্ততি নাই। স্ত্রী শুচিবাই গ্রস্তা। দিনের মধ্যে অন্ততঃ ত্রিশবার স্নান করিতেন। অফিসের কাজ সারিয়া মাষ্টার বাবুকে জামা কাপড় বদলাইয়া ঘরে ঢুকিতে হইত। এই ভদ্রলোক আমাকে বড়ই ভালবাসিতেন। তিনি আমাকে আমার সেবা-কার্যের জন্য উৎসাহ দিতেন। কোন গরীব লোকের ঔষধ-পত্র কেনার জন্য টাকা চাহিলে বিনা প্রশ্নে তিনি আমাকে টাকা দিতেন। তিনি সেবা-কার্যের জন্য আমাকে একটি ডুস ও একটি থার্মোমিটার কিনিয়া দিয়াছিলেন। সেবার তাঁরই রেল ষ্টেশনের পয়েন্টম্যানের স্ত্রীর কলেরা হইল। স্বামী আমাকে ডাকিয়া লইয়া গেল তাহার সেবা করিতে। সত্ত বিবাহ করিয়া সে নতুন সংসার পাতিয়াছিল। বউয়ের হাতের পায়ের মেহেদীর দাগ এখনও মোছে নাই। স্বামী বেচারা বউয়ের জন্য প্রাণপণ করিতেছে। কিন্তু একা মানুষ! কত দিক সামলাইবে? তাহারা বিহার দেশের মানুষ। বহুদিন বাংলা দেশে থাকিয়া বেশ বাংলা শিখিয়াছে। শাশুড়ী থাকে

গোয়ালন্দ। অসুখের সময় শ্বাশুড়ীকে আনিতে গিয়াছিল। কিন্তু আত্মীয়-স্বজনেরা শ্বাশুড়ীকে আসিতে দিল না। বিবাহের এক বৎসরের মধ্যে মেয়ের শ্বশুর-বাড়ি যাওয়া মায়ের পক্ষে নিষেধ। কে এই নিষেধবাণী প্রথম প্রচার করিয়াছিল জানি না। হয়ত কোন বিশেষ ক্ষেত্রে এই নিষেধবাণীর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কোন্ নিষ্ঠুর সূত্র ধরিয়া এই নিষেধ-বাণী এই মৃত্যু-পথযাত্রী মেয়ের শয্যাশিয়রে তার মমতাময়ী মাকে আসিতে আজ বাধা প্রদান করিল! অসুখের ঘোরে বউটি বার বার বলিতেছে, "আমার মাকে আনিয়া দাও। মা না আসিলে আমি বাঁচিব না।" স্বামী মিথ্যা প্রবোধ দিতেছে, "সামনের গাড়ীতেই মা আসিবেন। তুমি চুপ করিয়া থাক।" কিন্তু কত গাড়ী আসিল, কত গাড়ী চলিয়া গেল। মেয়েটির মা আর আসিল না। সেই মা হয়ত এই রোগগ্রস্তা বধূটির মতই ঘরে বসিয়া মেয়ের জন্য কাঁদিয়া সারা হইতেছে। কে আমাদের সমাজ হইতে এই হৃদয়হীন কুসংস্কার দূর করিবে?

বউটিকে আমি দুই তিন রাত সেবা করিলাম। ডাক্তারের নির্দেশ মত পার রেকটকাল ফোঁটায় ফোঁটায় ঈষৎ উষ্ণ সেলাইন পানি রোগিনীর দেহে প্রবেশ করাইলাম। পায়খানা বমি পরিষ্কার করিয়া দিতে লাগিলাম। রাত্রে আমি থাকিতাম বলিয়া স্বামীকে ঘুমাইতে দিতাম। সে দিনে রোগিণীর দেখাশুনা করিত।

ইতিমধ্যে রেল ষ্টেশনের কুলীদের দুই তিন জনের কলেরা হইল। আমি রাতের মত ষ্টেশন মাষ্টারের ঘরে থাকি আর প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর রোগীদের মধ্যে যাইয়া তাহাদের দেহে পার-রেকটকাল সেলাইন-পানি প্রবেশ করাই। অভিজ্ঞতায় আমার ধারণা হইয়াছিল, রক্তনালী দিয়া সেলাইন-পানি রোগীর দেহে প্রবেশ করাইয়া ডাক্তারেরা সে সব রাজসিক ইন্তেজাম করেন তাহা দেখিয়া অধিকাংশ অশিক্ষিত রোগীই হার্টফেল করিয়া মারা যায়। তাই পারত পক্ষে আমি কোন অশিক্ষিত রোগীর রক্তনালীতে নুন পানি প্রবেশ করানো অনুমোদন করিতাম না। আর করিলেই বা কি হইত? এই সব গরীব রোগীর পক্ষে ডাক্তারের চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা ফি ও ঔষধ কেনার পয়সা জোটানো অসম্ভব ছিল। তখন আমার কিই বা বয়স। মাত্র পনর বৎসরের বেশী হইবে না। আজ

ভাবিয়া আশ্চর্য হই, সেই ছোট্ট ছেলেটি কি করিয়া সারা রাত ভরিয়া এ বস্তি সে বস্তি ঘুরিয়া এতগুলি রোগীর দেখাশুনা করিত। আমার মনে পড়িতেছে, গভীর রাত্রকালে হাতের ডুসটি লইয়া কুলী-ব্যারাকের দিকে চলিয়াছি। বেশ ভয় ভয় করিতেছে। কিন্তু আমার মনে হইতেছে, আমার ভিতরে যেন কে আর একজন জাগিয়া উঠিয়াছে। এই রাতের নির্জনতায় সে আমাকে দিয়া তার নির্দিষ্ট পাঠটি নিখুঁতভাবে করাইয়া লইতেছে। সকাল হইলে গাঁয়ের লোকেরা আমাকে দেখিয়া ধন্য ধন্য করিত। সেই সব প্রশংসাবাণী আমাকে যেন অপর একজন করিয়া দিত। কুলীরা তখন এখানে ওখানে নানা দলে বাস করিত। তাই সব রোগীদের দেখিতে দেখিতে কোথা দিয়া যে রাত্র কাটিয়া যাইত টেরও পাইতাম না। এরই মধ্যে নিয়ম অনুসারে সেই বউটিকেও দেখিতে যাইতাম। এবার বউটি জ্ঞান হারাইয়াছে। হাত পা ঠাণ্ডা। নাড়ি চলিতেছে না। কলেরা রোগী ঘণ্টায় ঘণ্টায় অবস্থা পরিবর্তন করে। এই নাড়ি চলিতেছে, এই চলিতেছে না। সেই জন্য কলেরা রোগীকে দেখিয়া কেহ আশাবাদীও হইবে না আবার নিরাশও হইবে না। কিন্তু মেয়েটির চোখ উল্টাইয়া গিয়াছে। চোখের মণিতে রক্ত উঠিয়াছে। তাহাতেই কিছুটা শঙ্কিত হইলাম। স্বামীটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার শাশুড়ী কি সত্যই আসিল না?" সে বলিল, "কাল লোক পাঠাইয়াছিলাম, সে আসিল না।" পাড়ার সকল লোকে একত্র হইলেই এই বউটির পয়েণ্টম্যান-স্বামীর প্রশংসা করে। তাহারা বলাবলি করে, কলিযুগে এমন কর্তব্য পরায়ণ স্বামী কোথাও দেখা যায় না। দেখ না বউটিকে কিভাবে সেবা করিতেছে।

অনবরত ছয় সাত দিন কলেরা রোগীর সঙ্গে সমানে রাত্র জাগিয়া আমি বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। ইতিমধ্যে একজন কুলী মারা গেল। শহরে ভীষণ কলেরা আরম্ভ হইল। আমার বাড়ির ধারে শ্মশান ঘাট। সেখানে একসঙ্গে তিন চারটি চিতা জ্বলিতে লাগিল। এই সব কারণে আমি আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িলাম। শ্মশান-ঘাটে হিন্দু শবযাত্রীদের হরিবোল শব্দ শুনিয়া আমার বুকের মধ্যে ধড়ফর করিয়া উঠে। ঘুমে চক্ষু বুঁজিয়া আসে। কিন্তু আধঘুমে নানা বিভীষিকা দেখিয়া ঘুমাইতে

পারি না,। আমার পিতা-মাতা আমার জন্য শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। পাঁচ ছয় দিন পরে আমি কিছুটা ভাল হইয়া উঠিলাম। ষ্টেশনে আসিয়া ষ্টেশন মাষ্টার উমাকান্ত বাবুকে বউটির কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "গতরাত্রে বউটি মারা গিয়াছে।" শুনিয়া বড়ই খারাপ লাগিল, আহা স্বামী বেচারার অবস্থা যেন কেমন হইয়াছে! সে হয়ত বউ-এর মৃত্যুতে পাগল হইয়া ঘুরিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "বউটির স্বামী এখন কোথায়?"

ষ্টেশন মাষ্টার কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "সেই পাষণ্ডের কথা আর বলিও না। তুমি যাওয়ার পর সে আর একদিনও বউ-এর পাশে বসে নাই। বউটিকে ঘরে তালাবদ্ধ করিয়া আসিয়া সে বস্তির কুলীদের সঙ্গে মিলিয়া গাঁজা খাইত। একদিন ঘরে যাইয়া দেখে বউটি মরিয়া রহিয়াছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে এখন কোথায়?" মাষ্টারবাবু বিরক্তির সঙ্গে বলিলেন, "কি জানি কোথায়? হয়ত বন্ধুজনকে লইয়া কোথাও গাঁজা খাইতেছে।" শুনিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম। আমাদের সকল ভালবাসারই পরিণতি কি এইভাবে হয়!

ভুসী গাড়োয়ানের ছেলের কলেরা হইল। ষ্টেশন-মাষ্টার বলিলেন, "হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করাই।" আমি হোমিওপ্যাথিকে বিশ্বাস করিতাম না। এখনও করি না। শুনিয়াছি, আমেরিকার কোন কোন প্রদেশে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা নিষিদ্ধ। পৃথিবীর প্রায় দুই তৃতীয়াংশই ত ভ্রমণ করিলাম। একমাত্র পাক-ভারত ব্যতিরেকে কোথাও কোন হোমিও-প্যাথিক ডাক্তার দেখিতে পাইলাম না। আমাদের দেশের লোকেরা যেমন ভুত, প্রেত, ওঝা পীর ও ফকিরে বিশ্বাস করে তেমনি হোমিওপ্যাথিক ঔষধে বিশ্বাস করে। গ্রাম দেশে ঘুরিয়া দেখিয়াছি, প্রায় অধিকাংশ গ্রামেই একজন আধজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার আছে। এ-দেশের লোক সব সময়ই কোন কিছু বিশ্বাস করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। যাহারা হোমিও-প্যাথিকে বিশ্বাস করে তাহারা বন্ধু সমাবেশে এই ঔষধের কার্যকারিতা সম্বন্ধে এমন সব রোমাঞ্চকর কাহিনী বানাইয়া বলে যে শ্রোতাদের মধ্যে কেহ যদি তাহা অবিশ্বাস করিতে চায়, তাহার পক্ষে সেখানে তিষ্ঠান

দায় হইয়া পড়ে। সেই গল্প যাহারা শোনে তাহারা আবার তাহাতে আরও কিছু রঙ চড়াইয়া অপরের কাছে বলে। এমনি করিয়া আমাদের দেশে ভূতের গল্পগুলি প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দু দেবতারা বহু হস্ত এবং বহু মস্তকের অধিকারী হইয়াও বহু বৎসর ধরিয়া ভক্তমণ্ডলীর পূজা পাইয়া আসিতেছেন। দেশের জনগণের এই সহজ বিশ্বাস-প্রবণতার জন্য বহু পীর ও সাধু-সন্নাসী নানা তুক-তাকের অবতারণা করিয়া সমস্ত দেশটাকে অবাধে শোষণ করিয়া চলিয়াছে। এমন রোগ আছে যাহা আপনা হইতেই সারিয়া যায়। এমনও রোগ আছে যাহা নিতান্তই মনের বোগ। যে-কোন ঔষধ বা মন্ত্রে রোগীর বিশ্বাস হইলে সারিয়া যায়। এই ধরনের ব্যধিগ্রস্ত লোকের সংখ্যা কম নয়। তাহারা দু'এক ফোঁটা হোমিওপ্যাথিক ঔষধেই সারিয়া যায়। কিন্তু কলেরা, টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, যক্ষ্মা প্রভৃতি ব্যারামের বর্তমান যুগে যে সব এলোপ্যাথিক ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার সুযোগ হইতে কয়েকটি গাল-গল্পের দ্বারা সরল দেশবাসীদিগকে যাহারা বঞ্চিত করিতেছে তাহাদের প্রতি আমাদের রাষ্ট্রের কি কোন কর্তব্য নাই ?

যাক এসব কথা। ষ্টেশন-মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে অনেক তর্ক-বিতর্ক করিয়া ভুসীর ছেলের জন্য এলোপ্যাথিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলাম। আমার সেবা-কার্যের জন্য শহরের ডাক্তারেরা প্রায় সকলেই আমাকে ভালবাসিতেন। কোন গরীব লোকের জন্য ডাকিলে তাঁহারা ফি লইতেন না। কারণ গ্রাম-দেশে আমার এমনই সুনাম ছিল, আমি সমর্থন না করিলে আমাদের অঞ্চলে কোন ডাক্তারের কল পাওয়ার উপায় ছিল না। আমার সেবা-কাজে ডাঃ অমিয় কুমার মৈত্র মহাশয় আমার বড়ই সহায় ছিলেন। কত রোগীর বাড়িতেই যে তাঁহাকে বিনা ফিসে লইয়া গিয়াছি কোন কোন রোগীর বাড়িতে যাইয়া তিনি অপদস্থও হইয়াছেন। দুই তিনদিন বিনা ফিসে তাঁহার চিকিৎসাধীনে থাকিয়া গ্রাম-টাউটের গাল-গল্পে রোগীর আত্মীয়েরা উপযুক্ত ফিস দিয়া কোন কম্পাউণ্ডার দিয়া রোগীর চিকিৎসা করাইয়াছে। তবু আমি ডাকিলেই তিনি কখনো বিনা পারিশ্রমিকে রোগী দেখিতে অস্বীকার করিতেন না। এই ভদ্রলোক এখনও ফরিদপুরে ডাক্তারী ব্যবসা করিতেছেন। হয়ত আগের মতই গরীব

রোগীদের তিনি বিনা পারিশ্রমিকে দেখাশুনা করেন।

এই অমিয়বাবুকে ভুসীর ছেলের চিকিৎসার ভার দিলাম। তিনি কয়েকটি পুরিয়া তৈরী করিয়া দিলেন। এই পুরিয়া ঈষৎ উষ্ণ পানিতে মিশাইয়া রোগীকে তিন ঘণ্টা অন্তর পার-রেকটাল ডুস দিতে আরম্ভ করিলাম। এই ডুস আবার খুব সাবধানে দিতে হইত। যাহাতে ফোঁটায় ফোঁটায় এই ঔষধ-পানি ধীরে ধীরে রোগীর শরীরে প্রবেশ করে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইত। ঘন ঘন পায়খানা ও বমি হওয়ার জন্য কলেরা রোগীর দেহ হইতে রক্ত পানি হইয়া বাহির হইয়া যায়। সেই জন্য এই ঔষধের মাধ্যমে কৃত্রিম লবণ-পানি রোগীর দেহে প্রবেশ করাইয়া রোগীকে গরম রাখা হয়। রোগীর নাড়ীর ভিতর দিয়া এই ঔষধ প্রবেশ করাইলে আরও উপকার হয়। অশিক্ষিত সমাজে ইহা কোন কার্যকরী হয় না সে কথা আগেই বলিয়াছি।

ভুসী ছেলের শিয়রে বসিয়া কাঁদিত। তার একটি মাত্র ছেলে। স্কুলে পড়াইবে বলিয়া সুদূর বিহার অঞ্চলের বাড়ি হইতে ছেলেটিকে কয়েক বছর আগে লইয়া আসিয়াছে। আসিবার সময় মা কত কান্নাকাটি করিয়াছে। ভুসী শোনে নাই। আজ যদি ছেলে ভাল হইয়া না ওঠে তবে ভুসী নদীর জলে ডুবিয়া মরিবে। "বাবুজি! আমার ছেলেটিকে ভাল করিয়া দাও।"

আমি বলিলাম, "ভুসী! আল্লাহকে ডাক। আল্লাই তোমার ছেলেকে ভাল করিবেন।" ভূসীর সঙ্গে সঙ্গে আমিও আল্লাকে ডাকিলাম।

তিন চারদিন রোগীর প্রস্রাব হয় না। রোগীর প্রস্রাব আনার কায়দাও আমি জানি। ছোট ছোট তিন চারিটি গ্লাসের মধ্যে সামান্য স্পিরিট ঢালিয়া আগুন জ্বালাইয়া দিলাম। সেই আগুন সমেত গ্লাসটি রোগীর মাজার দুই পাশে লাগাইতে লাগিলাম। সকালে এরূপভাবে বহুক্ষণ চেষ্টা করিয়াও রোগীর প্রস্রাব হইল না। কিন্তু বিকালে দুই তিনবার চেষ্টা করিতেই রোগী প্রস্রাব করিল। ভূসীকে বলিলাম "ভূসী! এবার তোমার ছেলের আর কোন ভয় নাই। শীগ্‌গীর ভাল হইয়া যাইবে।" হইলও তাই। কয়েকদিনের মধ্যেই ভূসীর ছেলে ভাল হইয়া গেল। ষ্টেশনের কুলী মহলে 'দাগদার বাবু' বলিয়া আমার নাম রটিল।

হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারেরা কিন্তু ইহাতে খুশী হইলেন না। এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় যদি ভূসীর ছেলে মারা যাইত, তাহারা বলিত, 'দেখ! হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিলে এই ছেলে মারা যাইত না।'

এই সুযোগ তাঁহারা শীঘ্রই পাইলেন। গ্রামের ছবু শেখের ছোট চার বৎসরের মেয়েটির কলেরা হইল। খবর পাইয়াই আমিয়বাবু ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া মেয়েটিকে দেখিতে গেলাম। আহা! রাঙা টুকটুকে মেয়েটি। গরীবের ঘরে আসিয়া কোথা হইতে এই এক গা রূপ সে কুড়াইয়া আনিয়াছে। ডাক্তারের নির্দেশ মত আমি রোগীকে পার-রেকটাল সেলাইন দিতে লাগিলাম।

পরদিন দুপুর বেলা দেখি, মেয়েটির নাড়ী নাই। আমি তাহাকে সেলাইন দিতে আরম্ভ করিলাম। মা পাশে বসিয়া কত আশায় আমার দিকে চাহিয়া রহিল। আমার প্রত্যেকটি কাজ যেন তার বাছনীকে নিরাময় করিতেছে। হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া মেয়েটি মারা গেল। মা চীৎকার করিয়া আমার পায়ে আসিয়া পড়িল,—"ও জসী! কি করিলিরে। আমার বাছারে তুই মারিয়া ফেলিলি।" সেই মেয়ে-হারা মায়ের সঙ্গে কাঁদিতে কাঁদিতে আমি গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। তখন আমারও মনে হইল, অসময়ে ডুস দিয়া আমিই মেয়েটিকে মারিয়া ফেলিলাম।

হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারেরা তাহাদের সমর্থকদের সাহায্যে পাড়ায় পাড়ায় রটাইয়া দিল, 'কি চাও অমুক, ছবুর মেয়ের নাড়ির ভিতরে সেলাইন দিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে।' যেখানেই যাই সেখানেই আমাকে লইয়া লোকে ছি ছি করে। এতদিন যে সেবা করিয়া এত রোগীকে ভাল করিয়াছিলাম সে কথা সকলেই ভুলিয়া গিয়াছে।

অমিয়বাবুর কাছে যাইয়া সমস্ত খুলিয়া বলিলাম। তিনি বলিলেন, 'তোমার পার-রেকটাল সেলাইন দেওয়াতে রোগী কিছুতেই মরিতে পারে না। রোগী হয়ত তখনই মরিত। সেলাইন দিতে যাইয়া তুমি তাহাকে বাঁচাইতে গিয়াছিলে। এজন্ত তাহাদের তোমাকে নিন্দা না করিয়া প্রশংসা করাই উচিত ছিল।'

কত সামান্য সামান্য অসুখে গ্রাম দেশের লোকেরা মারা যায়!

আমাদের গ্রামে একটি লোক খুব ভাল কেচ্ছা বলিতে পারিত। আমি মাঝে মাঝে যাইয়া তাহার নিকট কেচ্ছা শুনিতাম। সেবার শুনিতে পাইলাম, লোকটির ঘোরতর অসুখ। বাঁচিবার আশা নাই। আমাকে দেখিতে চাহিয়াছে।

সন্ধ্যার পরে আমি লোকটিকে দেখিতে গেলাম। যাইয়া দেখি, সে মরিয়া যাইবে মনে করিয়া তাহার গল্প শোনার অনুরাগীরা প্রত্যেকেই কিছু না কিছু আনিয়া তাহাকে খাইতে দিয়াছে। একজন আনিয়া দিয়াছে তেলে-ভাজা জিলাপী, অপরজন আনিয়াছে তেলে-ভাজা শক্ত গজা। সে শুইয়া শুইয়া একটু একটু করিয়া কামড়াইয়া খাইতেছে।

আমি তাহার হাত ধরিয়া দেখিলাম হাতের নাড়ী বসা। ঘন ঘন রক্ত পায়খানা হইতেছে। মনে মনে ভাবিলাম, লোকটির রক্ত আমাশা হইয়াছে।

আমাকে দেখিয়া সে বলিল, "আপনাদের কাছে কত কসুর করিয়াছি। আজ আমার শেষ দিন। সকল অপরাধ মাপ করিয়া দিবেন।"

আমি বলিলাম, "কে বলে যে তুমি মরিয়া যাইবে? কাল আমি শহর হইতে ডাক্তার আনিয়া তোমাকে ভাল করিয়া দিব।" আমার কথা শুনিয়া লোকটির কোটরাগত চক্ষু দুইটি বাঁচিবার আশায় উজ্জল হইয়া উঠিল।

তখন আমি বলিলাম, "এই সব তেলে-ভাজা জিনিস যাহারা তোমাকে খাইতে দিয়াছে তাহারা মনের অগোচরে তোমার শত্রুতা করিতেছে। বিষের মত এইসব ফেলিয়া দাও।" সমবেত লোকদিগকে বলিলাম, "তোমরা তোমাদের পোঁটলা-পুঁটলী লইয়া যার যার বাড়ি চলিয়া যাও। এগুলি আমি কিছুতেই এই রক্ত আমাশার রোগীকে খাইতে দিব না।" অনিচ্ছাসত্বেও যার যার আনা খাবারের পোঁটলা-পুঁটলী লইয়া অনুরাগীরা ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িল। পরদিন অমিরবাবু ডাক্তারকে আনিয়া রোগী দেখাইলাম। তিনি একটি মিকচার লিখিয়া দিলেন আর দুই তিনটি ইন্‌জেক্‌সনের ব্যবস্থা করিলেন। চার

পাঁচ দিনের মধ্যেই লোকটি সারিয়া উঠিল। ইহার পর লোকটি আরও পোনর ষোল বৎসর বাঁচিয়াছিল। তাহার কেচ্ছা-কাহিনীর আসরে আগের মতই লোক জমা হইত। এই লোকটি যাকে দেখিত তাকেই বলিত, "অমুকের ছেলে অমুক আমাকে সেবার মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইয়াছে।"

এরূপ কত দৃষ্টান্ত দিব! সামান্য একটু ঔষধ দিয়া বহু মৃত্যু-পথ-যাত্রী লোককে আমরা বাঁচাইয়াছি।

ডাক্তার সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ইহাব আবও আগের ঘটনা। আমি তখন ক্লাস সেভেনের ছাত্র। ফরিদপুরে আসিলেন এক পাগলা ডাক্তার। যাকে দেখেন তারই সঙ্গে কথা বলেন। রোগীর বাড়ীতে যাইয়া ছোট ছেলেদের সাজী হইতে মওয়া-মুড়ি চাহিয়া খান। ভিজিটের টাকার জন্য পিড়াপিড়ি করেন না।

এই ডাক্তারের সঙ্গে আমার একদিন পরিচয় হইল। তিনি আমার কাঁধে হাত দিয়া বলিলেন, "তোমাদের অঞ্চলের যত গরীব রোগীর খবর আমাকে দিবে। চিকিৎসার জন্য কোন পারিশ্রমিক লাগিবে না। এমন কি ঔষধও আমি কিনিয়া দিব। তুমি আমাকে যেখানেই হুকুম করিবে সেখানেই যাইব।"

ইনি হইলেন ডাঃ সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তী জীবনে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়া জেল ও সুখ্যাতি সব কিছুরই ভাগী হইয়াছিলেন। ফরিদপুর জেলার নড়িয়া অঞ্চলে তাঁহার বাড়ি। বিবাহ করেন নাই। যা কিছু উপার্জন করেন তাহা কয়েকজন বন্ধুর পড়াশুনার খরচের জন্য কলিকাতা পাঠাইয়া দেন। এই বন্ধুরা উপযুক্ত হইয়া আসিলে তাঁহাদের লইয়া তিনি লোক-সেবার আশ্রম খুলিবেন।

আমার মায়ের মামা বাড়ি ছিল বাখুণ্ডা গ্রামে। সেখানে বেড়াইতে যাইয়া দেখি, তাঁহাদের বাড়ির একটি মেয়ে খুবই অসুস্থ। সম্পর্কে

মেয়েটি, আমার খালা। পেটটি ঢোলের মত ফুলিয়া গিয়াছে। হাত পা ফুলা ফুলা। আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁহার বাঁচিবার আশা ছাড়িয়া দিয়াছেন। সুরেশদাকে যাইয়া এই মেয়েটির কথা বলিলাম। ফরিদপুর হইতে বাখুণ্ডা গ্রাম ছয় সাত মাইল দূরে। সমস্ত শুনিয়া সুরেশদা বলিলেন, "মেয়েটিকে তুমি এখানে তোমাদের বাড়িতে লইয়া আস। আমি তাহার চিকিৎসা করিয়া দিব।"

আমি মেয়েটিকে আমাদের বাড়িতে লইয়া আসিলে সুরেশদা তাহাকে ভালমত পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, 'মেয়েটির ক্রিমি হইয়াছে। কয়েক ডোজ ঔষধ দিলেই সারিয়া যাইবে।' ঔষধ লিখিয়া সুরেশদা হাসপাতালের লেডি-ডাক্তারকে একখানা পত্র লিখিয়া দিলেন। লেডি-ডাক্তারের বয়স সুরেশদার প্রায় সমান। তিনি পত্রে তাঁহাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিলেন। হাসপাতাল হইতে ঔষধ আনিয়া দিলে কয়েকদিনের মধ্যেই রোগিণী ভাল হইয়া উঠিল। ইহার পর তাঁহার এমন সুন্দর চেহারা হইল যেন হিন্দুদের পূজার প্রতিমা। বিবাহের পরে তাঁহার দুই তিনটি সন্তান হইয়াছিল। একবার কোন সন্তানের জন্মের সময় মেয়েটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ইহার পরে আরও অনেক গরীব রোগীর জন্য সুরেশদাকে নানা গ্রামে লইয়া গিয়াছি। সমস্ত খুটিনাটি ঘটনা এখন মনে করিতে পারিতেছি না। গত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সুরেশদা চাকরি লইয়া যুদ্ধে চলিয়া যান। যুদ্ধের পর অনেক টাকা-পয়সা উপার্জন করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। এই সময় তিনি ফরিদপুর হিতৈষী স্কুলের ভার গ্রহণ করেন। স্কুলের সমস্ত খরচ-পত্র তিনি নিজে বহন করিতেন। আগেই বলিয়াছি, এই স্কুলে আমার পিতা মাষ্টারী করিতেন।

রাত্রে হিতৈষী স্কুলের ঘরগুলিতে সুরেশদা নাইট স্কুল খুলিলেন। মেথর পাড়া হইতে পড়ুয়াদিগকে ডাকিয়া আনার ভার ছিল আমার উপরে। সুরেশদা নিয়মিতভাবে মেথর পড়ুয়াদিগকে পড়াইতেন। আমিও সুরেশদার মত ছাত্রদিগকে পড়াইতাম। নন-কোঅপারেশন আন্দোলন তখন সবে আরম্ভ হইয়াছে। একটি ছোট্ট সভায় সুরেশদা একদিন বক্তৃতা করিতে উঠিলেন। তখনও তাঁহার জনসভায় বক্তৃতা

করার অভ্যাস হয় নাই। বক্তৃতা করিতে করিতে মাঝখানে, তিনি থামিয়া গেলেন। কিন্তু সেই বক্তৃতার জন্যই সুরেশদাকে গ্রেপ্তার করা হইল। সেই সঙ্গে পীর বাদশা মিঞাকেও। মুসলমান পীর আর হিন্দু ব্রাহ্মণ এক সঙ্গে হাত-কড়া পরিলেন। এই ঘটনা দেশে হিন্দু-মুসলমানের প্রীতির বন্ধনকে আরও দৃঢ় করিল। জেল হইতে বাহির হইয়া সুরেশদা কুমিল্লা শহরে অভয়-আশ্রম নামে একটি প্রতিষ্ঠান খোলেন। যুদ্ধে যাইয়া তিনি যে টাকা জমাইয়াছিলেন তাহার সবই তিনি এই আশ্রমে ব্যয় করেন।

ইহার পরে তিনি কখনো হিন্দু মহাসভায়, কখনো কংগ্রেসে, কখনো কৃষক-প্রজা-মজদুর পার্টিতে যোগদান করেন। মাঝে মাঝে তাঁহার সঙ্গে দেখা হইয়াছে। ফরিদপুরের স্বল্প পরিসর স্থানের মধ্যে সুরেশদার যে মহান হৃদয়বত্তার পরিচয় পাইয়াছিলাম, পরবর্তী রাজনৈতিক জীবনের ডামাডোলে যদিও তিনি গৌরবের শিখর হইতে শিখরে উঠিতেছিলেন তবুও আমার মন বলিত, সুরেশদাকে আবার যেন জন-সেবক রূপে আমাদের সেই ক্ষুদ্র শহর ফরিদপুরের সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে পাই।

সুরেশদার বিষয়ে, যখনই ভাবি, আমার মন একটি উচ্চ আদর্শে উদ্বোধিত হইয়া ওঠে। এই লোকটি তাঁর সমস্ত জীবন দেশবাসীকে দান করিয়া গিয়াছেন। নিজের বলিতে তাঁহার কিছুই ছিল না। তিনি যখন হিন্দু মহাসভায় যোগ দিয়াছিলেন তখন মনে মনে ব্যথা পাইয়াছি। এমন মহানুভবতা আর হৃদয়বত্তার অধিকারী কি করিয়া সেই মহৎ গুণগুলিকে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য গণ্ডী ঘিরিয়া রাখিবেন! সেই গণ্ডী তিনি অতিক্রম করিয়াছিলেন। জীবনের প্রতিটি রক্ত বিন্দু তিনি তাঁহার দেশবাসীর জন্যই ব্যয় করিয়াছিলেন। আজ মৃত্যুর ওপরে বসিয়াও তিনি তাঁর সর্বত্যাগী-জীবনের আদর্শবাদের আলোক-বর্তিকা তুলিয়া ধরিয়া তাঁর সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় ছিল তাঁহাদিগকে পথ দেখাইতেছেন।

সুবোধ ডাক্তার

ফরিদপুরে আরও একজন ডাক্তার আসিলেন, বাবু সুবোধচন্দ্র সরকার। এই ভদ্রলোকের দয়া-দাক্ষিণ্যের বিষয়ে আমাদের গ্রাম দেশে শত শত কাহিনী ছড়াইয়া আছে। তিনি রোগীর বাড়িতে যাইয়া রোগীকে কিঞ্চিৎ সুস্থ না করিয়া ফিরিতেন না। দূরের কোন রোগী দেখিতে যাইয়া মাঝে মাঝে তিনি দুই তিনদিন পর্যন্ত সেখানে কাটাইতেন। পারিশ্রমিকের জন্য কোনই পরোয়া করিতেন না।

একবার পদ্মানদী পার হইয়া মাধবদিয়ার চরে তিনি এক মুসলমান চাষীর বাড়ি রোগী দেখিতে আসিয়াছেন। রোগী দেখিয়া ঔষধ-পত্র লিখিয়া দিতেছেন, এমন সময় একটি করুণ দৃশ্য তাঁর চোখে পড়িল। রোগীর পিতা বৃদ্ধ চাষী ধীরে ধীরে তার গোয়াল হইতে দুই তিনটি হালের বলদ খুলিয়া দিতেছে। অপর একজন লোক সেই গরুগুলি অন্যত্র লইয়া যাইতে বৃথা চেষ্টা করিতেছে। গরুগুলি কিছুতেই যাইতে চাহে না। বৃদ্ধ চোখের পানি ফেলিতে ফেলিতে বলিতেছে, "তোদের আমি রাখিতে পারলাম না। এজন্য আমাকে কোন দোষ দিস্ না। অপরের বাড়িতে যাইয়া তোরা সুখে থাকিস্।" গরুগুলিও সেই বৃদ্ধের সঙ্গে চোখের পানি ফেলিতেছে। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই গরুগুলি অপরে লইয়া যাইতেছে কেন?" বৃদ্ধ তখন বলিল, "ডাক্তার বাবু! আমার এই একটি মাত্র ছেলে অসুখে পড়িয়াছে। এত দূরের পথে আপনাকে আনিয়াছি, আপনাকে অন্ততঃ একশত টাকা দিতে হইবে। তাহা ছাড়া ঔষধ-পত্রের দামও আছে। তাই গরুগুলি বেচিয়া দিতেছি।"

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই গরুগুলি বেচিলে তোমরা হাল চাষ করিবে কি দিয়া?"

বৃদ্ধ বলিল, "সে কথা ভাবিলে ত চারিদিক অন্ধকার দেখি। আগে ছেলে ত ভাল হউক। কিন্তু ডাক্তার বাবু! বড়ই মুস্কিলে পড়িয়াছি,

গরুগুলি বোধ হয় আগেই টের পাইয়াছে। তাহারা কিছুতেই গোয়াল ছাড়িয়া যাইতে চায় না। বলুন ত কি করি?"

ডাক্তার বলিলেন, "মিঞাসাহেব! আপনাকে গরুগুলি বেচিতে হইবে না। আপনার ছেলের অসুখের জন্য আমাকে কোন পারিশ্রমিকই দিতে হইবে না।"

লোকটি বলিল, "কিন্তু ঔষধের দাম ত দিতে হইবে। ঘরে যে একটি পয়সাও নাই।"

ডাক্তার উত্তর করিলেন, "আপনার ছেলের জন্য যা কিছু ঔষধ লাগে আমি কিনিয়া দিব। সে জন্য কোন চিন্তা করিবেন না।"

আমাদের গ্রাম দেশে এই ডাক্তার বাবুর বিষয়ে এমনি শত শত গল্প প্রচলিত আছে। এক সময়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে তাঁহার খ্যাতি এতদূর পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল যে, কেহ যদি তাঁহার মূর্তি গড়িয়া পূজা করিত তবে দেশের শত সহস্র হিন্দু-মুসলমান একত্র হইয়া সেই পূজায় অঞ্জলী প্রদান করিত।

মাঝে মাঝে ডাক্তারবাবু পাঁচ-ছয় দিনের জন্য কোথাও উধাও হইয়া যাইতেন। রোগীর আত্মীয়-স্বজনেরা, ডাক্তারবাবুর ছেলেরা এ-গাঁয়ে সে-গাঁয়ে তাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াইত। থানায় খবর পাঠাইত, ডাক্তার বাবুকে পাওয়া যাইতেছে না। চারিদিকে লোক ছুটিত তাঁহার সন্ধান করিতে।

সাত আট দিন পরে শ্রান্ত-ক্লান্ত, অনিদ্রার অবসন্ন অবস্থায় ডাক্তার বাবু গৃহে ফিরিতেন। ডাক্তার-গৃহিনী পাখার বাতাস করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিতেন, "এতদিন কোথায় ছিলে?"

ডাক্তারবাবু বলিতেন, "প্রথমে ত গেলাম রঘুয়া পাড়া মাতবর বাড়ি। রোগী এখন তখন। সারারাত সেবা-শুশ্রুষা করিয়া রোগীকে কিছুটা চাঙ্গা করিয়া আনিলাম, এমন সময় কল আসিল ভাটপাড়া গ্রাম হইতে। ছোট্ট মেয়েটির নিউমোনিয়া হইয়াছে। আহা! দেখিতে যেন হলদে পাখির বাচ্চাটি। তাকে ঔষধ-পত্র দিয়া কিছুটা নিরাময় করিয়াছি, এমন সময় খবর আসিল বউঘাটায় কার ছেলেকে সাপে কাটিয়াছে। গেলাম সেখানে। এমনি করিয়া দেরী হইয়া গেল।"

গৃহিনী বলিলেন, "টাকা পয়সা কি আনিয়াছ ? ঘরে ত চাল বাড়ন্ত।"

ডাক্তার মুখ কাচুমাচু করিয়া বলিলেন, "এবার বেশ টাকা পাইয়াছিলাম। রঘুয়া পাড়ার মাতবর দুই শত টাকা দিয়াছিল।"

গৃহিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে যে তোমার ব্যাগে মাত্র দশটি টাকা দেখিলাম।"

ডাক্তার বলিলেন, "ভাটপাড়ার মেয়েটির জন্য যে ঔষধের দাম দিতে হইল। ওরা এত গরীব যে ঔষধের টাকা না দিলে মেয়েটির চিকিৎসাই হইত না। পথের মধ্যে একটি গরীব ছেলে পরীক্ষা দেওয়ার ফিস চাহিল। আর বল ত সাপে-কাটা রোগীর কাছে হইতে কি টাকা লইতে পারি ? আমি তাদের আরও কিছু দিয়া আসিলাম।"

গৃহিনী আর কিছুই বলিলেন না। এরূপ ঘন ঘন ডাক্তারবাবুকে অদৃশ্য হইতে দেখিয়া পরে আর তিনি নিখোঁজ হইলে কেহ বড় একটা খোঁজ খবর লইতেন না।

এই ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আমার সহজেই পরিচয় হইয়া গেল। একবার খবর পাইলাম, কেদারীর মার বোন নদীর ওপারের চরে অসুস্থ হইয়া পড়িয়া আছে। সুবোধ বাবুকে বলিতেই তিনি আমার সঙ্গে নদীর ওপারে সেই বৃদ্ধাকে দেখিতে গেলেন। যাইয়া দেখিলাম, সাত আট দিন আগে এই বৃদ্ধাকে একটি ষাঁড়ে গুঁতা দিয়া তাহার গুপ্তস্থান ছিঁড়িয়া দিয়াছে। সেই ক্ষতস্থান পচিয়া এমন দুর্গন্ধ হইয়াছে যে কাছে যাওয়া যায় না। রাশি রাশি মাছি বুড়ীকে ঘিরিয়া আছে। এক গ্লাস পানি দেওয়ারও লোক নাই। ডাক্তারবাবু তাঁহার ব্যাগ হইতে ঔষধ বাহির করিয়া গরম পানিতে সেই ক্ষতস্থান ধুয়াইয়া দিলেন। তারপর একটি ইন্‌জেক্‌শন দিলেন। ইন্‌জেক্‌শন দেওয়ার সময় ইহার সমস্ত কায়দা-কানুন আমাকে শিখাইতে লাগিলেন। "রোগীর কাঁধের নীচে হাতের ডানার শেষ দিকটার উপরে বিশেষ কোন রক্তনালী নাই। এখানে ইন্‌জেক্‌শনের সুঁই ফুঁড়িতে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। তুমি এইভাবে শিরিঞ্জ ধরিয়া সুঁইয়ের কিছুটা দাবাইয়া দিবে। তারপর ধীরে ধীরে ঔষধ টিপিয়া দিবে। ইহার আগে শিরিঞ্জে ঔষধ ভরিয়া বেশ করিয়া সামনের দিকে টিপিয়া দিবে, যেন বাতাস

না থাকে। ঔষধ ভরিবার আগে শিরিঞ্জটি গরম পানিতে ফুটাইয়া লইও। নিজের হাত দুইখানিও ভালমত কার্বলিক সাবানে পরিস্কার করিও। আমি রোজ আসিয়া এই রোগীকে দেখিতে পারিব না। কাল হইতে তুমিই ইহাকে ইন্‌জেক্‌শন দিবে।"

ডাক্তারবাবুর নির্দেশ মত প্রতিদিন সকালে আসিয়া হাইড্রোজেন প্যারাকসাইড্‌ দিয়া বৃদ্ধার ক্ষতস্থান পরিস্কার করিয়া বোরিক কটন দিয়া বাঁধিয়া দেই, হাতের ডানায় ইন্‌জেক্‌শন দেই। ছয় সাত দিন পরে বৃদ্ধা ভাল হইয়া উঠিল। ইহার জন্য ঔষধ-পত্রের ব্যবস্থা ডাক্তার বাবুই করিয়াছিলেন।

এই বৃদ্ধা ভাল হইয়া উঠিয়া আরও দশ-বার বৎসর বাঁচিয়াছিল। হাট হইতে তেঁতুল ও কুলের আচার কিনিয়া আনিয়া পাড়ার বৌঝিদের কাছে সে বিক্রী করিয়া বেড়াইত। ইহাতে কিই-বা তাহার আয় হইত। এই সামান্য আয়ে তাহার এটা ওটা কিনিবার পয়সা জুটিত। সংসারে আপন বলিতে বোন-পুত কেদারী। তারও অবস্থা ভাল না। গ্রামের বউরা বুড়ীকে বড়ই মমতা করিত। এ-বাড়ি ও-বাড়ি খাইয়া তাহার দিন চলিত। আমার সেই সেবা কার্যের পুরস্কার স্বরূপ মাঝে মাঝে বুড়ী আমাকে কুলের আচার আনিয়া দিত। বহু সাধ্য-সাধনা করিয়াও বুড়ীকে নিরস্ত করিতে পারিতাম না। বারবার অনুরোধ করিয়া সেই কুলের আচার সে আমাকে গছাইয়া দিত।

গ্রামের মোনা মল্লিকের অসুখ। বিছানা হইতে উঠিতে পারে না। এই মোনা মল্লিকের সঙ্গে আমার ছেলে-বেলার সম্পর্ক। সে নানা রকম পাখি পালিত। ঘুঘু, কোড়া, ডাহুক প্রভৃতি শিকারী পাখীরা সব সময় তাহার বাড়িতে খাঁচায় আবদ্ধ থাকিত। বর্ষাকালে সে ডাহুক লইয়া জঙ্গলের মধ্যে তাহার খাঁচাটি রাখিয়া আড়ালে যাইয়া বসিয়া থাকিত। খাঁচার চারিধারে থাকিত ফাঁদ। পোষা ডাহুকের ডাক শুনিয়া বুনো ডাহুকেরা তাহার সঙ্গে ভাব করিতে আসিয়া সেই ফাঁদে আটকা পড়িত। দুই একবার আমি তাহার সঙ্গে জঙ্গলে ডাক শিকারে গিয়াছিলাম।

ঘন বেত ঝাড়ের আড়ালে যেখানে নীচু মাটিতে অল্প বৃষ্টির পানি জমিয়াছে, সেখানে অতি সাবধানে খাঁচাটি রাখিয়া সে আড়ালে যাইয়া

বসিয়া থাকিত। আষাঢ় মাসে বনের শোভা বড়ই সুন্দর রূপ ধারণ করে। এখানে সেখানে শ্যামা লতা, তেলাকুচ লতা, আমরুজ লতা সবাই যুক্তি করিয়া সেই বেত বনের উপর নানারূপ সুনিপুণ কারুকার্য করিতে থাকে। এখানে সেখানে দু'একটি হিজল গাছ রাশি রাশি রাঙা ফুল ছড়াইয়া সেই বনভূমিতে দেবকন্যাদের পায়ের অলক্তক রাগের চিহ্ন আঁকিয়া দেয়। এ-ডালে ও ডালে কানাকুয়া ডাকে, ঘুঘু ডাকে। দূরের ধান ক্ষেত হইতে কোড়ার ডাক কানে আসে। আমি দুই চোখ মেলিয়া বনের শোভা দেখিতাম—দুই কান মেলিয়া পাখির গান শুনিতাম। মোনা মল্লিক এত সব ভাবিত না। কখন তাহার খাঁচায় ডাহুক আসিয়া আটকা পড়িবে সে তাহাই ভাবিত।

মোনা মল্লিকের বাড়ি যাইয়া আমি তাহার খাঁচার পাখিগুলিকে দেখিতাম। একবার বাড়িব এটা ওটা বেচিয়া কিঞ্চিৎ পয়সা সঞ্চয় করিয়া তাহার নিকট হইতে খাঁচা সমেত একটি ঘুঘুর বাচ্চা কিনিয়াছিলাম। আমার পিতা তাহা টের পাইয়া সেই পাখির বাচ্চা ফেরৎ দিয়াছিলেন। মোনা মল্লিকের সঙ্গে আমার একটি আত্মিক সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। সে সুনিপুণ হাতে বাঁশ চিরিয়া সলা বানাইয়া মাছ ধরিবার দোয়াড়ী ও চাঁই তৈরী করিত। ধারালো দাখানি দিয়া সে বেত চাঁছিত। তাহার সুদক্ষ হাতের টানে বেতটি নাচিয়া নাচিয়া ধারালো দায়ের স্পর্শে মসৃণ হইয়া লুটাইয়া পড়িত। ধারাল অস্ত্রে কাঠ কাটার সময় যেমন, তেমনি তাহার বেত চাঁছিবার সময় আমি যেন আমার বুকের ভিতর কি এক রকম স্পন্দন অনুভব করিতাম। তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিব না। এ-কাজে ও-কাজে তাহার বালিকা বধূটি উঠানে ঘুরিয়া বেড়াইত। মাঝে মাঝে তাহাদের কৃত্রিম কলহ হইয়া আবার আপোশ হইত। তাহার বউটি গ্রামের মধ্যে নামকরা সুন্দরী ছিল। তখন কিই-বা বয়স। বোধ করি আট—নয় বৎসরের বেশী হইবে না। কিন্তু তখনও হয়ত মনের অগোচরে আমার ভিতর সৌন্দর্যের প্রতি অবচেতন আকর্ষণ ধীরে ধীরে রূপ পাইতেছিল।

এই মোনা মল্লিকের অসুখের খবর শুনিয়া আমি সুবোধবাবু ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিলাম। ডাক্তার রোগীর অবস্থা ভালমত পরীক্ষা করিয়া ঔষধ

পথ্যের নির্দেশ দিলেন। সব ঔষধ কিনিতে প্রায় বিশ টাকার মত লাগিবে। এত টাকা মোনা মল্লিক কোথা হইতে দিবে? ডাক্তারবাবু তাঁহার বন্ধু জমিদার ইন্দুভূষণ সরকার মহাশয়কে পত্র লিখিয়া দিলেন। সেই পত্র পাইয়া তিনি ঔষধ-পত্রের খরচের জন্য আমার হাতে বিশটি টাকা দিলেন।

আমি রোজ যাইয়া মোনা মল্লিককে দেখাশুনা করিতে লাগিলাম। ডাক্তারের নির্দেশ মত প্রতিদিন তাহাকে ডুস দিয়া পায়খানা করাইতে হইত। গরম পানি দিয়া সমস্ত গা মুছাইয়া দিতে হইত। তাহা ছাড়া গরম পানিতে ঔষধ মিশাইয়া তাহার ময়লা দাঁতগুলি প্রতিদিন পরিষ্কার করিয়া দিতাম। এইসব কাজে তাহার স্ত্রী এটা ওটা আনিয়া আমাকে সাহায্য করিত। তাহাকে আমি গ্রাম সম্পর্কে চাচী বলিতাম। আমার চাইতে দশ-বার বৎসরের বড়। বয়স এখনই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ডাক্তার রোগীকে কেবলমাত্র দুধ খাইতে বলিয়াছিলেন। সেই দুধের টাকাও আমি এর-ওর নিকট হইতে চাহিয়া-চিন্তিয়া আনিয়া দিতাম। প্রতিদিন সকালে বিকালে প্রায় চার পাঁচ ঘণ্টা ধরিয়া রোগীকে দেখাশুনা করিতে লাগিলাম। রোগীর অবস্থাও ডাক্তারবাবুকে শহরে যাইয়া বলিতাম।

একদিন মোনা মল্লিকের বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যাইতেছি এমন সময় রহিম মল্লিকের মা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন' "ভাই জসীম! তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।" রহিম মল্লিকের মাকে আমি গ্রামসম্পর্কে দাদী বলিয়া ডাকিতাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি কথা দাদী! পথের মধ্যে তোমার সঙ্গে প্রেমালাপ করিব, লোকে বলিবে কি?" দাদী-সম্পর্কে বৃদ্ধাদিগের সঙ্গে এরূপ রহস্যালাপ করিয়া গ্রাম দেশের লোকেরা নিজেদের জীবনে সাময়িক আনন্দ আনিয়া থাকে। দাদী বলিল, "তামাসার কথা নয় ভাই? আমি ত শুনিয়া আসমান হইতে পড়িয়া গেলাম। ওই হদার মা বুড়ী, তাকে আমি ঝাঁটা দিয়া পিটাইয়া কুটি কুটি করি, সে কিনা বলে, জসী যে মোনা মল্লিকের অসুখে এত দেখাশুনা করিতেছে, ইহার কারণ মোনা মল্লিকের বউ-এর সঙ্গে তাহার দোষ আছে।"

তখন আমার বয়স বড় জোড় চৌদ্দ বছর। নবম শ্রেণীতে পড়ি। ইত্যাকার অপবাদ যে কেহ কারও প্রতি করিতে পারে তাহা আমার

বুদ্ধির অগোচর। আমার পায়ের তলা হইতে যেন মাটি সরিয়া গেল। সেই হদার মা বুড়ী এ কথা ত শুধু দাদীকেই বলে নাই। হয়ত পাড়ার আরও অনেককে বলিয়াছে। দাদী আমার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া আমাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "আমি কিন্তু ভাই তোমাকে চিনি। এর এক বর্ণও বিশ্বাস করি নাই। বলুক না যাকে যত খুশী। মিথ্যা কথা বলায় তাদের মুখ খসিয়া পড়িবে। তোমার তাহাতে কিছুই হইবে না।" দাদী সান্ত্বনা দিতে আমার মনের অবস্থাকে আরও বাড়াইয়া দিল। বাড়ি ফিরিতে ফিরিতে দাদীর শেষ কথাটি বার বার ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইয়া আমার অন্তরকে করাত দিয়া কাটিতে লাগিল: "বলুক না যাকে যত খুশী।" তবে কি সকলের কাছেই বুড়ী এই কথা বলিয়া বেড়াইতেছে!

এরপর তিন-চারিদিন আর মোনা মল্লিকের বাড়ি গেলাম না। সেদিন ষ্টেশনের রাস্তা পার হইয়া শহরে যাইতেছি, এমন সময় সুবোধবাবুর সঙ্গে দেখা। তিনি সাইকেলে করিয়া দূরের কোন কলে যাইতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া সাইকেল হইতে নামিলেন। "কই, মোনা মল্লিকের অবস্থা জানাইতে তুমি ত আর আসিলে না। রোগী কেমন আছে?"

আমি তখন ডাক্তারবাবুকে সমস্ত খুলিয়া বলিলাম। শুনিয়া ডাক্তার বাবু উচ্চ হাসিয়া বলিলেন, "আরে জসীম! তুমি এটা জান নাই? তোমার মত একটি ছেলে নিঃস্বার্থভাবে যে কোন গরীব লোককে সাহায্য করিতে পারে এটা গ্রামদেশের লোকদের কল্পনারও অগোচর। আমরা ভদ্রলোকেরা চিরকাল শুধু তাহাদের এক্সপ্লয়েটই করিয়াছি। তাই এই বৃদ্ধা মহিলা তোমার কাজ দেখিয়া তার নিজের বুদ্ধির মত এটা ওটা নানা রকম জল্পনা-কল্পনা করিয়াছে। পরিশেষে ভাবিতে ভাবিতে এই আবিষ্কার করিয়াছে যে, মোনা মল্লিকের বউ-এর সঙ্গে তোমার দোষ আছে। একি যেমন তেমন আবিষ্কার। এজন্য এই বৃদ্ধাকে কত মাথা খাটাইতে হইয়াছে। তোমার কাজের কথা লইয়া সে যে এত ভাবিয়াছে, এই ত তোমার পুরস্কার। এ জন্য মন খারাপ করিও না।"

ডাক্তারবাবুর কথাগুলি এমনই স্নেহপূর্ণ আর হৃদ্যতা মাখানো যে পর-দিন হইতে আমি আবার যাইয়া মোনা মল্লিককে দেখাশুনা করিতে

লাগিলাম। অসুখ হইতে সারিয়া উঠিয়া মোনা মল্লিক আরও কয়েক বৎসর বাঁচিয়াছিল। তাহার ছেলে এখনও আমার প্রতি বড়ই কৃতজ্ঞ। দেশে গেলে এটা ওটা কাজ করিয়া দিতে তাহার পিতাকে যে একদিন আমি সেবা করিয়াছিলাম এই কথার উল্লেখ করে।

কালক্রমে সুবোধ ডাক্তারের বিরুদ্ধে শহরের অন্যান্য ডাক্তারেরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। তিনি প্রত্যেক রোগীকে প্রায় ঘণ্টা খানেক ধরিয়া দেখিতেন। অন্যান্য ডাক্তারেরা বলিত, "সুবোধবাবুর বুদ্ধি কম। তাই রোগীর রোগ নির্ণয় করিতে অনেক সময় লাগায়।" ইহা ছাড়া তিনি প্রায়ই গ্রামদেশের কলে যাইয়া চার-পাঁচ দিন কাটাইতেন। শহরের রোগীরা প্রতিদিন ডাক্তারের উপস্থিতি কামনা করে। বিশেষ করিয়া রোগী যদি ঘোরতর হয় ডাক্তারকে দুই বেলা কল দিয়া উপযুক্ত পারি-শ্রমিকের বিনিময়ে রোগীকে দেখায়। দিনে দিনে তাই শহরে ডাক্তার-বাবুর কল কমিয়া আসিল। গ্রামদেশের ধনীলোকেরা শহরের অনুকরণ করে। গ্রামে বসিয়াও তাহারা নিজেদের আওতায় এক একটি মানসিক শহুরিয়া পরিবেশ গড়িয়া লয়। শহরে যে ডাক্তারের কল নাই সেই ডাক্তারকে তাহারা পারত পক্ষে ডাকে না। এইভাবে ধীরে ধীরে সুবোধবাবুর উপার্জন কমিয়া যাইতে লাগিল।

এই সময়ে তিনি লাঠিখেলা ও তলোয়ার চালনায় মনোনিবেশ করিলেন। কতদিন তাঁহার বাড়িতে গিয়া দেখিয়াছি, বৈঠকখানার ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোগীরা অপেক্ষা করিতেছে। তিনি অন্দর মহলে কোন বন্ধুকে তাঁহার তলোয়ার ভাঁজের নূতন কলা-কৌশল দেখাইতেছেন। গ্রামদেশে রোগী দেখিতে যাইয়াও তিনি কোথাও লাঠিখেলার কোন ওস্তাদ পাইলে সমস্ত ভুলিয়া তাহার নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিয়া যাইতেন। মাঝে মাঝে তিনি বাঘের ছাল পরিয়া গ্রাম দেশের লোক-দিগকে লাঠিখেলা দেখাইয়া স্তম্ভিত করিতেন। তাঁহার ছয় বৎসরের ছেলেটির মাথায় একটি আলু রাখিয়া তিনি চোখ বন্ধ করিয়া তলোয়ার দিয়া সেই আলু দুইখণ্ড করিতেন। ছেলেটিকে আবার মাটিতে শোয়াইয়া তাহার গলার উপর একটি লাউ রাখিয়া সেই লাউ চোখ বন্ধ অবস্থায় কাটিতেন। গ্রাম দেশে যেখানে যত লাঠিয়াল ছিল তাহাদিগকে তিনি

দলবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার ধারণা ছিল, সেই দলবদ্ধ লাঠি-য়ালদের লইয়া তিনি একদিন দুর্দ্ধর্ষ ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের সহিত সংগ্রাম করিবেন। মাঝে মাঝে এ গ্রাম সে-গ্রাম হইতে লাঠিয়ালেরা দশ/বারো জন আসিয়া দুই তিনদিন ডাক্তারবাবুর বাসায় থাকিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিত। বলাবাহুল্য যে, ডাক্তারবাবু তাহাদের জন্য দুইবেলা বেশ ভাল আহারের ব্যবস্থা করিতেন। গভর্ণমেণ্টের লোকেরাও বোধ হয় তাঁহার লাঠিয়াল সংগঠনের কথা জানিতেন। কিন্তু আধুনিক কামান গোলা প্রভৃতি মারণাস্ত্রের অধিকারী বৃটিশ-সিংহের বিরুদ্ধে এই পাগলা ডাক্তারের কয়েক-শত লাঠিয়াল লইয়া আস্ফালন যে কোনই কাজে আসিবে না তাহা হয়ত তাঁহারা জানিতেন বলিয়াই ডাক্তারবাবুর কাজে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করি-তেন না। গভর্ণমেণ্টের লোক ডাক্তারবাবুর কাজে হস্তক্ষেপ করিতেন না কিন্তু তাঁর দেশবাসী তাঁহাকে কপর্দকশূন্য করিয়া ছাড়িল। একে ত শহরের ধনী ব্যক্তিদের বাড়িতে তাঁহার কল কমিয়া গেল, গ্রাম দেশেব ধনী ব্যক্তিরাও তাঁহাকে কম ডাকিতে লাগিলেন। যখন শহরের কোন ডাক্তার দূরের পথে কোথাও যাইতে চাহিতেন না তখন সুবোধ ডাক্তারের ডাক পড়িত। ইহাতেও তাঁহার মাসিক আয় তিন চারশত টাকার মত হইত। কিন্তু হইলে কি হইবে? ডাক্তারবাবুর দানের হাত ত কমিল না। গরীব রোগীকে দেখিয়াও তিনি বেশী দামের ঔষধ ব্যবস্থা করিতেন। তিনি বলিতেন, "রোগী গরীব হইতে পারে কিন্তু তার রোগটা ত গরীব নয়।" এই কথা প্রমাণ করিতে তাঁকে গরীব রোগীদের সমস্ত ঔষধের দাম দিতে হইত। শহরের দুই তিনটি ঔষধের দোকানে ডাক্তারবাবুর নামে দুই তিন হাজার টাকা দেনা হইল। তাহারা দেনার দায়ে নালিশ করিল। তবু তাঁহার দানের হাত কমিল না। নিজের ছেলেটির জন্য প্রাইভেট মাষ্টার রাখিয়া দিয়াছিলেন। অর্থা-ভাবে তাঁহাকে ছাড়াইয়া দিলেন। ছেলেটি এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় ঘুরিয়া জটলা করিয়া বেড়াইত, পড়াশুনা করিত না। এদিকে মন দেওয়ার অবসর তাঁহার কোথায়? বৌদিদির অলঙ্কারগুলি ধীরে ধীরে সেকরার দোকানে যাইয়া জমা হইতে লাগিল। কতদিন এই দেবীতুল্যা বৌদিদিকে তালী দেওয়া শাড়ী পরিতে দেখিয়াছি। ডাক্তারবাবুর সেদিকে খেয়াল ছিল

না। রোগী পাইলে তিনি সকল ভুলিয়া যাইতেন। বিশেষ করিয়া গরীব মুসলমান চাষীর বাড়ি হইতেই তাঁহার বেশী কল আসিত।

কতদিন ডাক্তারবাবুর সঙ্গে তাঁহার রোগীর বাড়ি গিয়াছি। একবার আমাদের গ্রামের একটি চাষীর বাড়িতে যাইয়া দেখিলাম ভিজা সেঁতসেঁতে মেঝের উপর একটি ছেঁড়া মাদুরের উপর রোগী শুইয়া আছে। ডাক্তারবাবু প্রথমেই বাড়ির কর্তাকে আদেশ করিলেন খড়ের পালা হইতে এক বোঝা খড় আনিয়া দাও। সেই খড় পরিপাটি করিয়া ঘরের মেঝেয় বিছাইয়া তাহার উপর কাঁথা মেলিয়া প্রথমে রোগীকে সেখানে শোয়াইয়া দিলেন। রোগী আরামের নিশ্বাস ফেলিল। তার পাশে আর একটি খড়ের বিছানা প্যাতিয়া সেখানে বসিয়া তিনি রোগী দেখিতে লাগিলেন। প্রায় ঘণ্টা খানেক রোগী দেখিয়া ডাক্তার বলিলেন, "রোগীর নিউমোনিয়া হইয়াছে, ইহাকে সব সময় গরম রাখিতে হইবে। ঠাণ্ডা লাগিলে রোগী বাঁচিবে না। গ্রামে কোথাও পুরাতন ঘি আর আকনের পাতা আছে কি না লইয়া আস।"

আকনের পাতায় পুরাতন ঘি মাখাইয়া তাহা আগুনের উপর সেঁকিয়া ডাক্তারবাবু নিজেই রোগীর বুকে সেঁক দিতে লাগিলেন। আর বাড়ির বধূটিকে কি করিয়া সেঁক দিতে হইবে শিখাইতে লাগিলেন।

এমনি করিয়া তিনি প্রত্যেক রোগীর বাড়ি যাইয়া কোন দরদী বন্ধুর মত তাহাদের দেখাশুনা করিতেন। এই সব লোকেরা শতকণ্ঠে ডাক্তারবাবুর তারিফ করিত। কিন্তু তাহারা ত দেশের গন্য-মান্য কেহ নয়। তাহাদের মতামতের দাম পোড়া দেশে কে দিবে?

নানা রকম পাওনাদারের অত্যাচারে আর স্বগোত্রীয় ডাক্তারদের সমালোচনায় ধীরে ধীরে ডাক্তারবাবুর মধ্যে উন্মাদ রোগের লক্ষণ দেখা দিল। আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁহাকে কলিকাতা লইয়া গেলেন চিকিৎসা করাইতে। শুনিতে পাইলাম, সেখানে যাইয়া উন্মাদ অবস্থায় একদিন তিনি বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যা করিয়াছেন। দরিদ্র দুঃস্থ মুসলমান হিন্দু চাষীদের এত বড় দরদী-বন্ধুর এমন মহৎ-জীবন এইভাবে শেষ হইয়া যাইবে তাহা কোনদিনই ভাবিতে পারি নাই। আর সেই জন-দরদী মানুষ-দেবতাকে কোনদিনই দেখিতে পাইব না। দেবতা কোনদিনই দেখি

নাই। প্রতিমা বানাইয়া যাহারা দেবতার পূজা করে তাহাদের সঙ্গেও একমত হইতে পারি নাই। কিন্তু আজ মন বলিতেছে, এককালে হয়ত ডাক্তারবাবুর মত মানুষই আপন জীবনের মহিমায় তাঁর পারিপার্শ্বিক সবাইকে এমনি করিয়া মুগ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে গুণগ্রাহীরা তাঁহাদের প্রতিমা গড়াইয়া মন্দিরে মন্দিরে পূজা আরম্ভ করিয়াছিল। সেকালের আদর্শবাদ হয়ত এ-কালের আদর্শ নয়। হয়ত তাঁহাদের জীবনের যা সত্যকার মহিমা ছিল তাহাও আজ নানা উদ্ভট কল্পনায় ঢাকা পড়িয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের পূজা আজও চলিতেছে। আমি প্রতিমায় বিশ্বাস করি না। তবু কেহ যদি আজ ডাক্তারবাবুর প্রতিমা গড়িয়া কোথাও পূজা করে, আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পূজাঞ্জলী সেইখানে আমি নিবেদন করিব।

ডাক্তারবাবুর মৃত্যুর পবে একদিন আমি অম্বিকাপুরের ষ্টেশনের রাস্তা দিয়া বাড়ি ফিরিতেছি। দেখিলাম, ডাক্তারবাবুর স্ত্রী তাঁর ছেলে আর মেয়েটিকে সঙ্গে লইয়া ফরিদপুর হইতে দেশের বাড়ি গোপালপুরে চলিয়া যাইতেছেন। এত বড লোকেব স্ত্রী, আজ একখানা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করিবারও তাঁহার সামর্থ নাই। বৌদিদির মাথায় সেই উজ্জ্বল সিন্দুর বিন্দুটি আজ আর শোভা পাইতেছে না।

কি দুঃসহ অর্থকষ্ট লইয়াই যে বৌদিদি আজ শহরেব বাড়ি হইতে সেই সুদর পল্লীগ্রামে চলিযা যাইতেছেন তাহা বুঝিতে কষ্ট হইল না। সেখানে যাইয়া ছেলে-মেয়েদের পডাশুনা হইবে না। শহরের জীবনে যাঁহারা অভ্যস্ত, শত কুসংস্কার ও অজ্ঞানতা পূর্ণ পাড়া গাঁয়ে যাইয়া তাঁহারা কিরূপে বাস করিবেন। অনেক কষ্টে চোখের পানি রোধ করিলাম। আহা! ওরা ত কতই কাঁদিয়াছে। আমি কাঁদিয়া আবার উহাদের কাঁদাইব কোন প্রাণে!

আমার জীবনে কত মানুষের সংস্পর্শে-ই আসিয়াছি, এই ডাক্তারবাবুর মত লোক একজনও দেখিলাম না। ফরিদপুরের মিউনিসিপ্যালিটিতে শুনিয়াছি আজ কয়েকজন তরুণ যুবক নেতৃস্থান দখল করিয়াছেন! তাঁহারা কি শহরের কোন রাস্তা সুবোধবাবুর নামে নামকরণ করিয়া এই মহানুভব ব্যক্তিটির প্রতি সামান্য কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে পারেন না?

আজ আমার বিগত জীবনের দিকে যতদূর চাহিয়া দেখি, আমার পিতা, সুরেশবাবু, সুবোধ ডাক্তার এমনি কত মহৎ ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। তাঁহারা কি আমার জীবনে এতটুকুও আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন? সেই আত্মত্যাগ-সেই পরার্থে সকল সমর্পণ জীবনের দেউলিয়া দিনগুলির সঙ্গে তাঁহাদের মহৎ-সংসর্গের দিনগুলি তুলনা করিয়া কেবলই মনে হয়, সেখানে শুধুই শূন্যতা—শুধুই শূন্যতা জমা হইয়া আছে। তাই এত করিয়া তাঁহাদের কথা লিখিয়া গেলাম; দেশের অনাগত কালের ভাই-বোনেরা যদি এসব জানিয়া কোন আদর্শ বাদের সন্ধান পায়!

অন্যান্য সেবা-কাজ

তখনকার দিনে আমার জীবনের লক্ষ্য ছিল বড় হইয়া আমি সাধু সন্ন্যাসী হইব। অবশিষ্ট জীবন পরের উপকার করিয়া কাটাইব। কবি বা সাহিত্যিক হইবার আকাঙ্ক্ষা তখনও মনে তেমন উচ্চ আশা বাঁধে নাই।

লোকের ভাল করিবার জন্য তখন মনে এমনি একটা জোর পাইতাম যে সেই কাজ করিতে যে টাকা-পয়সার প্রয়োজন তাহা চিন্তাও করিতাম না। কিন্তু টাকা-পয়সার দরকার হইলে তাহা আমি সহজেই পাইয়া যাইতাম। ষ্টেশন-মাষ্টার উমাকান্তবাবু ত ছিলেনই, তাহা ছাড়া আর যাহার কাছে চাহিতাম সেই আমাকে টাকা-পয়সা দিত। এমনি একটি ঘটনার কথা আজ মনে পড়িতেছে।

খবর পাইলাম, শিবরামপুর রেলষ্টেশন হইতে পাঁচ মাইল দূরে কোন বিধবার একটি মাত্র পুত্র আমগাছ হইতে পড়িয়া হাত পা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আছে।

আমি তৎক্ষণাৎ সেই বিধবার একজন আত্মীয়কে বলিলাম, "কাল সকালের গাড়িতে ছেলেটিকে লইয়া আসিবেন। আমি তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিব।"

পরদিন সকালের গাড়িতে ছেলেটিকে লইয়া তাহার বিধবা মা আসিলেন। ষ্টেশন হইতে গরুর গাড়িতে করিয়া তাহাকে হাসপাতালে লইয়া যাইতে হইবে। কিন্তু আমার কাছে একটি পয়সাও নাই। গরুর গাড়ির ভাড়া দিবে কে? দেখিলাম, আমাদের ফরিদপুরের জমিদার নন্দন লালমিয়া ষ্টেশনে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তখন তার বয়স বারো তেরো বৎসরের বেশী হইবে না। মনটি তখন বড়ই কোমল ছিল। এই বিধবার ছেলেটির কথা বলিতেই লালমিঞা তার পকেট ঝাড়িয়া তিন চারটি টাকা আমাকে দিল। গাড়ি করিয়া ছেলেটিকে হাসপাতালে আনিয়া ভর্তি করিয়া দিলাম। অল্পদিনের মধ্যেই ছেলেটি ভাল হইয়া দেশে চলিয়া গেল।

এই সব সেবা-কার্য করিতে মাঝে মাঝে বালক-বয়সে দুষ্ট বুদ্ধিও আমাদিগকে পাইয়া বসিত। জমীন মেস্তরীর দালানে আসিয়া আশ্রয় লইল একটি পরিবার! তাহাদের ছোট ছেলেটির কালাজ্বর। আমার ক্লাশের বন্ধু অতুল সেন খবর দিল, "ছেলেটিকে সেবা-শুশ্রূষা করার লোকের অভাব। বাপ-মা রাত জাগিয়া একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। আজ রাত্রে তুমি আসিও। আমরা ছেলেটিকে দেখাশুনা করিব।" রাত্রের আহার শেষ করিয়া আমি সেই বাড়িতে যাইয়া পৌঁছিলাম। যাইয়া দেখি, অতুল আগেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ছেলেটির বয়স পাঁচ ছয় বৎসর। সারা গায়ে পাঁচড়া। শুকনো কাকলাসের মত চেহারা। বহুদিনের রোগে হাড় কয়খানাই মাত্র অবশিষ্ট আছে। ছেলেটি কিছুতেই বিছানায় শুইবে না। কোলে করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। বন্ধুদের মধ্যে অতুল এমন ব্যক্তি যাহার ঘৃণা-পিত্ত বলিয়া কোন জ্ঞান ছিল না। সে-ই ছেলেটিকে কোলে লইয়া বসিল। আমি পাখার বাতাস করিতে লাগিলাম! তখন ছিল গরমের দিন। এই জন্য একে ত জামা কাপড় গায়ে রাখা যায়না, তার উপরে এই জ্বরের রোগীকে কোলে করিয়া বসিতে তাহার উত্তাপও গায়ে আসিয়া লাগে। তাহার উপর সেই ঘরে ভীষণ মশার উপদ্রব। রোগীকে কামড়াইয়া সেই মশা আমাদের গায়ে আসিয়া কামড়াইতেছিল। ইহাতে সেই রোগীর কালাজ্বর আমাদের মধ্যেও সংক্রামিত হইবার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু তখন আমরা সেবার মনোবৃত্তি

লইয়া সেখানে উপস্থিত হইয়াছি। এ সব চিন্তা একবারও মনে আসিত না। ভাবিতাম, এইভাবে লোক সেবা করিতে করিতে যদি মৃত্যু হয়, সেই মৃত্যু আমাদের পরম বাঞ্ছনীয়। পৃথিবীর যে সব মহাপুরুষ গণ সেবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাহাদের কাহিনী ছিল আমাদের আদর্শ। আমরা ভাবিতাম, এ জীবনটা যে খোদাতায়ালা দিয়াছেন, তাহারই কাজে ইহাকে ক্ষয় করিয়া দিব।

অনেকক্ষণ ছেলেটিকে কোলে রাখিয়া অতুল ছেলেটিকে আমার কোলে দিয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিল। আমি কিছুসময় ছেলেটিকে কোলে রাখিয়া আবার অতুলের কোলে দিলাম। এইভাবে রাত প্রায় চারটা বাজিল। ছেলেটির বাপ-মা পাশেই ঘুমাইতেছিল। তাহাদিগকে ডাকিয়া দিয়া আমরা রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম। এতরাত্রে আমি বাড়ি যাইত পারিব না। সুতরাং অতুলদের বাড়িতে যাইয়াই ঘুমাইব। আমরা পুল পার হইয়া গেলি পুষ্করিণীর তীরে আসিলাম। তাহারই পূব পাড়ে নরেন মাষ্টারের বাড়ি। কেন যেন নরেন মাষ্টারের প্রতি অতুলের রাগ ছিল। অতুল তিন চারটি ঢিল কুড়াইয়া লইয়া নরেন মাষ্টারের টিনের ঘরের চালার উপর ধুমাধুম মারিতে লাগিল। নরেন মাষ্টার ঘুম হইতে জাগিয়া বাতি জ্বালাইলেন। কিন্তু চোরের ভয়ে ঘরের বাহিরে আসিলেন না। আমরা হাসিতে হাসিতে অতুলদের বাড়িতে আসিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পরদিন নরেনবাবু থানায় যাইয়া তাঁহার বাড়ির সামনে বিশেষ পুলিশের ব্যবস্থা করিলেন। এ খবর শুনিয়া আমরা আরও হাসিলাম।

অতুল এখানে সেখানে সেবা-কার্য করিত কিন্তু নিজের বাড়িতে ভাই বোনদের অসুখ-বিসুখে একবার ফিরিয়াও চাহিত না। সেবার পূজার ছুটিতে অতুলের সবগুলি ভাই-বোনের জ্বর হইল। অতুলের বাবা মাত্র বাজার খরচের কয়েক টাকা হাতে রাখিয়া পূজার সময় সমস্ত খরচ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ভাই-বোনে তাহারা অনেকগুলি। সামান্য কেরানীগিরির চাকরি করিয়া কতই-বা তিনি পাইতেন!

ছেলেদের জ্বর হইলে প্রথমে তিনি বাজার খরচের টাকা দিয়া বার্লি পথ্য ও ঔষধ কিনিলেন। তারপর বাজার করারও পয়সা হাতে থাকে নাই।

সেবার ফরিদপুরে ম্যালেরিয়া জ্বর মহামারী আকারে দেখা দিল। শ্মশান-ঘাটে দিবা-রাত্রি চিতার পরে চিতা জ্বলিতে লাগিল। শহরের প্রায় সকল বাড়িতেই জ্বরের রোগী। কে কাহার দিকে ফিরিয়া চায়? কে কাহাকে টাকা কর্জ দেয়? আমি সারারাত জাগিয়া অতুলের ভাইদের সেবা করি! আমাদের একটি ভিটায় বেগুন খেত করা হইয়াছিল। সেখান হইতে বেগুন তুলিয়া আনিয়া তাহাদের দেই। সেই বেগুনের একমাত্র তরকারী আর ভাত জ্বরের রোগীদের পথ্য। বার্লি কিনিবারও পয়সা নাই। অতুল এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়ায়। অসুস্থ ভাই-বোনদের দিকে ফিরিয়াও চাহে না। ইতিমধ্যে অতুলেরও ম্যালেরিয়া জ্বর হইল। বিছানায় জ্বরের ঘোরে কাঁপিতে কাঁপিতে সে থিয়েটারের য়্যাক্ট করিত।

অতুলের একটি ভাইয়ের জ্বর খুব বেশী হইল। উত্তাপ একশত ছয় ডিগ্রী। তখন ডাক্তার ডাকিয়া আনা প্রয়োজন। কিন্তু ডাক্তারের ফি আর ঔষধের টাকা কোথা হইতে আসিবে? রোগীর অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাইতে লাগিল। ছেলেটি আমার বড়ই আদরের ছিল। অতুলদের বাড়ি গেলে জসীমদা জসীমদা বলিয়া প্রাণ ভরিয়া তুলিত। আমি তার মাথায় জল-পট্টি দেই আর চোখের পানি সংবরণ করি। অতুলের মা-বাবা পার্শ্বে বসিয়া। আমার কেবলই মনে হইতেছে, ডাক্তার—ডাক্তার—একজন ডাক্তার যদি আসিত, একফোঁটা ঔষধ যদি দিত, খোকা ভাল হইয়া উঠিত। কিন্তু আমার হাতে একটি পয়সা নাই। আমি কেবলি খোকার মাথায় জল-পট্টি দিয়া পাখার বাতাস করি আর আল্লাকে ডাকি, আল্লা এই খোকাকে ভাল করিয়া দাও। কিন্তু আল্লা আমার কথা শুনিলেন না। বেলা পাঁচটার সময় খোকা চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইল।

তখন পাড়ায় বাহির হইলাম শ্মশান যাত্রীর খোঁজে। প্রায় সব বাড়িতেই জ্বর। দুই একজন যাহারা ভাল আছে তাহারা কেহই শ্মশানে যাইতে রাজী হইল না। অতুলের বাবার এক বন্ধু ছিলেন বাবু অক্ষয় কুমার সেন। তিনি ফরিদপুরের এস, ডি, ও, ছিলেন। বড় চাকরি করিতেন বলিয়াও গরীব বন্ধুকে ভুলেন নাই। তিনি বলিলেন, "আমি শ্মশানে যাইব।"

আমরা তিনজনে সেই খোকার মৃতদেহ লইয়া গোবিন্দপুর শ্মশান

ঘাটে গেলাম। শ্মশান ঘাটের সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে থাকিতে আমি দেখিয়া দেখিয়া শিখিয়াছিলাম কি করিয়া চিতায় কাঠ সাজাইতে হয়। সেই অভিজ্ঞতা আজ কাজে লাগিল। আমিই কাঠ আনিয়া চিতা সাজাইয়া দিলাম। সেই চিতার উপর খোকাকে যখন শোয়াইয়া দিলাম তখন আমার চোখের পানি বাঁধ মানিল না।

ইহার পরে অতুলের আরও দুইটি ভাই মারা গেল। ইহারা সকলেই লেখাপড়ায় খুব ভাল ছিল। গ্রামদেশে বহুলোক বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। সেজন্য তাহাদের বাপ-মায়েরা দুঃখ করে না কারণ সেখানে বহু অসুস্থ লোকেরই চিকিৎসা হয় না। কিন্তু মধ্যবিত্ত সমাজের বাপ-মা, যাহারা বর্তমান চিকিৎসা বিদ্যার সুফল জানে, তাহাদের এতগুলি ছেলে যখন বিনা চিকিৎসায় মারা গেল তাহাদের দুঃখ কল্পনাও করা যায় না।

ইহার পরে অতুলের মা ও বাবাকে ম্যালেরিয়া জ্বরে ধরিল। অতুলের অসুখও বাড়িয়া গেল। আমি সারা রাত জাগিয়া তাহাদের দেখাশুনা করি। একদিন অতুল জ্বরের ঘোরে আমার হাতখানা বুকের উপর লইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বল! তুমি আমার কে?" আমি বলিলাম, "আমি তোমার বন্ধু জসীম।" অতুল বলিলল, 'না' তুমি মানুষ নও। মানুষের ছদ্মবেশে তুমি দেবতা।"

তখন আমার সমস্ত গায়ে রোমাঞ্চ হইল। মনে হইল, এতদিন রাত্রি জাগিয়া ইহাদের যে সেবা করিয়াছি, আজই আমি ইহার চরমতম পুরস্কার পাইলাম।

কিছুদিন পরে অতুল ভাল হইয়া উঠিল। শ্রীশবাবুব বাসার মত অতুলদের বাসায়ও আমার অবারিত দ্বার হইল। ইহার পরে অতুলদের বাসায় কাহারও কোন অসুখ হইলে অতুল নিজেই তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিত। অতুলদের বাড়ি যাইয়া আমরা দুই বন্ধু একত্র পড়াশুনা করিতাম। অতুলের মত বন্ধু পাওয়া খুবই সৌভাগ্যের বিষয়। পরের জন্য সে এত কাজ করিয়া দিত যাহার তুলনা মেলে না।

সেবার আমাদের বন্ধু শান্তি গাঙ্গুলীর ছোট ভাই বটুর টাইফয়েড হইল। রাঙা টুকটুকে ছয়-সাত বৎসরের ছেলেটি। এত সুন্দর গান করিতে পারিত যে, আমরা সকলেই তাহাকে খুব স্নেহ করিতাম। শান্তির

মা আর বোনেরা রাত জাগিতে জাগিতে শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া পড়িল। শান্তির সেবার পরীক্ষার বৎসর। আর সে সেবা শুশ্রূষা করিতেও জানে না। অতুল আসিয়া ভার লইল বটুর দেখাশুনা করিবার। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত—কি একনিষ্ঠ সেবা—বটুর মাকেও হারাইয়া দিল অতুল রোগীর দেখাশুনা করিতে। সেবার আমার বি, এ, পরীক্ষার বৎসর। তাই রোগীর সেবা-কার্যে অতুলের সঙ্গে যোগ দিতে পারিলাম না। তবু আমি রোজই দুই তিনবার বটুকে দেখিতে যাইতাম। সব সময়ই অতুলকে দেখিতাম, হয়ত সে রোগীর মাথায় আইসব্যাগ দিতেছে অথবা পাশে বসিয়া পাখা করিতেছে। শান্তির দুইবোন—তাহারা রোগীর জন্য এটা ওটা আনিয়া দিতেছে। সকলের মুখেই অতুলের তারিফ—সকলের মুখেই অতুলের সুনাম। মাস দেড়েক অসুখের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করিয়া বটু ভাল হইয়া উঠিল। এতদিন রোগীর পরিচর্যা করিয়া অতুলের পড়াশুনা হয় নাই। তাই তাহার পরীক্ষা দেওয়া হইল না। তাহার পিতার অবস্থাও ভাল ছিল না। অতুলের আর পড়াশুনা হইল না। সামান্য কোন চাকুরি করিয়া বহু সন্তান-সন্ততি লইয়া হয়ত কলিকাতার কোন অন্ধ গলিতে অতুলের দিন কোন রকমে চলিতেছে। বটুর বড় ভাই শান্তি সেবার পরীক্ষা দিয়া পাশ করিল। বর্তমানে সে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত আছে। অতুল যে একটি রোগী সেবার জন্য তার ভবিষ্যৎ জীবনে এত বড় অভাব অনটনের দিনগুলি মাথায় করিয়া লইল সে কথা কেহই ভাবে না। অতুলও হয়ত ভাবে না। পরার্থে যাহারা জীবন উৎসর্গ করে তাহারা ত কোন পরিণাম চিন্তা করিয়া তাহা করে না।

তেহের ফকির

আমাদের গ্রামে তাঁতী পাড়ার রহিম মল্লিকের গানের কথা আগেই উল্লেখ করিয়াছি। রহিম মল্লিকের পিতার নাম ছিল তেহের ফকির। তিনি খুব ভাল লাঠিখেলা জানিতেন। আর ফকিরী করিয়া গ্রামদেশের রোগীর চিকিৎসা করিতেন। আমাদের পাড়ায় কোন লাঠিখেলার অনুষ্ঠান হইলে সকল লাঠিয়াল তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া তবে আসরে নামিত।

খেলা শেষ হইবার আগে সকলের অনুরোধে তিনি কিছুক্ষণ লাঠিখেলার কসরত দেখাইতেন। তাহা দেখিয়া লাঠিখেলা শিখিবার জন্য আমার মন খুব আকৃষ্ট হইল। মনে মনে ভাবিলাম, লাঠিখেলা যদি শিখিতে হয়, তবে সব চাইতে বড় ওস্তাদ তেহের ফকিরের কাছেই যাইব। আমার বয়স তখন পাঁচ-ছয় বৎসরের বেশী হইবে না। আমি বাঁশের ঝাড় হইতে অপটু হাতে একখানা লাঠি তৈরী করিয়া তেহের ফকিরের কাছে গেলাম খেলা শিখিতে। গ্রাম সম্পর্কে তিনি আমার দাদা। তাঁহাকে যাইয়া বলিলাম, "দাদা! আমি আপনার কাছে আসিয়াছি লাঠিখেলা শিখিতে।" আমার কথা শুনিয়া তিনি দাদীকে বলিলেন, "ওগো শুনিতেছ? আমার এক বড় কুটুম আসিয়াছে আমার কাছে লাঠিখেলা শিখিতে।" এই বলিয়া তিনি আমার হাত হইতে লাঠিখানা লইয়া নানা কসরত দেখাইয়া আমার গায়ে আনিযা লাঠি ঠেকাইতে লাগিলেন। দাদী ঘরের চৌকাঠ ধরিয়া হাসিয়া কুটি কুটি হইতেছিলেন।

তেহের ফকিরের বাড়িতে প্রতি বৎসব মাঘী পূর্ণিমাব বাত্রে ধামাইল হইত। ধামাইলের পনর ষোল দিন আগে বাঁশের ঝাড় হইতে অক্ষত কতকগুলি সরু বাঁশ কাটিয়া আনা হইত। সব চাইতে বড় বাঁশটির নাম রাখা হইত মাদারের বাঁশ—তারপর আলীর বাঁশ, ফতেমার বাঁশ প্রভৃতি ছয়টি বাঁশ! সব চাইতে ছোট বাঁশটির নাম ছিল আল্লার বাঁশ। এই বাঁশটি সাদা কাপড়ে আবৃত হইত। প্রত্যেক বাঁশের আগায় একটি চামর থাকিত। এই বাঁশগুলি লইয়া ফকিরের শিষ্যেরা গ্রামের বাড়ি বাড়ি যাইয়া নাচিত। যাদব ঢুলী এই নাচের সঙ্গে ঢোল বাজাইত। সে কি অপূর্ব নাচ! পায়ে নূপুর পরিয়া প্রত্যেকের বাঁশটি ডান হাতের তেলোর উপর লইয়া বাম হাতে বাঁশের কিছুটা উপরে ধরিয়া কখনো বসিয়া, কখনো মাজা বাঁকা করিয়া, কখনো বা লাফাইয়া এমন সুন্দর নাচ দেখাইত। সেই নাচের তালে তালে যাদব ঢুলী তাহার ঢোল বাদ্যের সমস্ত নৈপুণ্য দেখাইত। নাচুয়েদের সঙ্গে তাহার বাদ্যের প্রতিযোগিতা হইত। কোন বাড়িতে যদি তাহার ঢোল বাদ্যের চাইতে নাচুয়েদের নাচের তারিফ হইত, পরবর্তী বাড়িতে যাইয়া সে তাহার ঢোল বাদ্যের আরও নতুন নতুন কৌশল দেখাইয়া নাচুয়েদের পরাজিত করিত।

সমবেত নাচ শেষ হইলে একক নাচ আরম্ভ হইত। কেহ তাহার বাঁশটি পেটের উপর লইয়া হাতে না ধরিয়া নাচিত! কেহ মাথার উপরে বাঁশটি লইয়া নাচিত। গ্রামের লোকেরা ধন্য ধন্য করিত। বাঁশ নাচানো শেষ হইলে সবগুলি বাঁশ একটি ধামার উপর রাখিয়া নাচুয়েরা বাড়ির কর্তার নিকট হইতে পান-তামাক খাইত। ধামাইলের বাঁশ মাটিতে নামানো নিষিদ্ধ! বাড়ির গৃহিনী নাকে নথ ঝুলাইতে ঝুলাইতে আসিয়া সোয়াসের খানেক চাউল, পাঁচটি পয়সা একটি কুলার উপর আনিয়া সেই ধামায় ঢালিয়া দিত। ফকিরের শিষ্যেরা অন্য বাড়িতে যাইয়া আবার নাচের অনুষ্ঠান জমাইত। গ্রামের উলঙ্গ ছেলে-মেয়ের দল এই বাঁশ নাচুয়ের দলের সঙ্গে এ-বাড়ি সে-বাড়ি ঘুড়িয়া বেড়াইত।

আমাদের গ্রামে বাঁশ নাচানো দেখানো শেষ হইলে ফকিরের শিষ্যেরা অন্যান্য গ্রামে যাইত। শোভারামপুর, গোয়ালচামট, পরাণপুর, শ্যামসুন্দর পুর, কত গ্রামেই ফকিবের শিষ্যেরা যাইত। সব গ্রাম হইতেই তাহারা জনসাধারণের অজস্র তারিফের সঙ্গে ধামাধামা চাউল, ডাল ও নানা রকম ফল ফলারী বহিয়া আনিত।

ধামাইলের পাঁচ ছয়দিন আগে একটি বড় তেঁতুল গাছ কাটিয়া তাহা চিরিয়া আঁটি আঁটি চলা রৌদ্রে শুকাইয়া লওয়া হইত। ধামাইলের দিন রাত্রে সেই চলা পোড়াইয়া ফকিরের শিষ্যেরা কয়েক বোঝা কয়লা তৈরী কবিত। আগেই ফাঁকা জায়গায় একটি স্থান আলা মাটি দিয়া লেপিয়া পুঁছিয়া রাখা হইত। বিভিন্ন গ্রাম হইতে গানের দল আসিয়া ফকিরের বাড়ির সামনে আমগাছ তলায়, জামগাছ তলায়, কাঁঠাল গাছ তলায় গানের আসর বসাইত। ছোট বেলায় আমি একবার আমার বড় ভাইয়ের সঙ্গে এই ধামাইল দেখিতে গিয়াছিলাম। যাইয়া দেখি, কত মানুষ আসিয়াছে ধামাইল দেখিতে। তাহারা এখানে সেখানে জমা হইয়া উপস্থিত গায়কদের বিভিন্ন আসরে গান শুনিতেছে। কোথাও জারীগান হইতেছে, কোথাও গোপীযন্ত্র সংযোগে বিচার গান হইতেছে, আবার কোথাও সারিন্দা বাজাইয়া মুর্শিদী গান হইতেছে। কিন্তু সকলেরই লক্ষ্য কখন ধামাইল হইবে।

শেষ রাতের তারা যখন উঠিল, তখন সেই লেপা-মোছা স্থানে বস্তায়

করিয়া তেঁতুল কাঠের কয়লা আনিয়া বুক সমান উচু-করিয়া ঢেরি দেওয়া হইল। তাহার চারিদিকে অতি সুন্দর করিয়া তেঁতুলের চলা কাঠগুলি সাজাইয়া দেওয়া হইল।

তখন চারিদিকের গান-বাজনা বন্ধ হইয়া গেল। সকলে আসিয়া সেই লেপা-পোছা স্থানের চারিদিকে গোল হইয়া দাঁড়াইল। ইতিমধ্যে বাঁশ-নাচুয়ের দলের লোকেরা ঢোল বাদ্য সহকারে নদী হইতে স্নান করিয়া আসিয়া সেই স্তুপিকৃত কাঠের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। যাদব ঢুলী তখন আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া তার ঢাক বাদ্যের যত কলা-কৌশল আছে প্রদর্শন করিতেছিল। তেহের ফকির তখন তাঁর আতসী-পাথরের তসবীটি গলায় পরিয়া দরগা ঘরে ঢুলিতে ছিলেন। সহসা তিনি উঠিয়া কয়েকখানা পাটখড়িতে আগুন জ্বালাইয়া সেই স্তুপিকৃত কাষ্ঠে ধরাইয়া দিলেন। চারিদিক হইতে সমবেত লোকেরা ধ্বনি দিয়া উঠিল।

বল্‌বে আল্লার ধ্বনি,
আল্লা আল্লা লায়েলাহা ইল্লাল্লাহ্।

দাউ দাউ করিয়া ধামাইলের কাঠ জ্বলিতে লাগিল। ফকির তখন হাতে সুন্দরী কাঠের একখানা কল লইয়া সেই আগুনের চারিদিকে ঘুরিতে লাগিলেন। ঢাকের বাদ্য প্রায় গম্ভীর হইয়া আসিল। আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া শত লেলিহান জিহ্বা মেলিল। সহসা ফকির সেই আগুনের মধ্যে একঘটি দুধ ঢালিয়া দিলেন। চারিদিকে লোকজন ঘন ঘন আল্লার ধ্বনি দিতে লাগিল। ফকির তখন পা দিয়া সেই মানুষ সমান আগুন উছলাইয়া দিলেন। বাঁশ নাচুয়ে-লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে সেই আগুনের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। সেকি নাচ—আর সেকি ঢোলের বাদ্য। আমরে বুক কি এক উত্তেজনায় দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতে লাগিল। কিছুক্ষণের মধ্যে আগুন নিবিয়া গেল। বাঁশ-নাচুয়ের দলের লোকেরা তখন ঢোল বাদ্য সহকারে শ্মশান ঘাটের নিকট মরা পদ্মায় যাইয়া যার যার বাঁশ পানিতে ছাড়িয়া দিয়া স্নান করিয়া ঘরে ফিরিল।

তেহের ফকিরের মৃত্যুর পর আর আমাদের গ্রামে ধামাইল হয় না। লোকে বলে তেহের ফকির মন্ত্র-তন্ত্র জানিতেন। সেই মন্ত্রের বলে তিনি

আগুনের তেজ নষ্ট করিয়া দিতেন। অবিশ্বাসীরা বলে, মন্ত্র-তন্ত্র কিছুই না। আগুনের উপর নাচিবার আগে নাচের দলের লোকেরা নদীতে স্নান করিয়া আসিত। একে ত মাঘ মাসের শীত। তার উপর ঠাণ্ডা কাদা-মাটিতে অনেকক্ষণ পা রাখিয়া দিত। ভিজা পায়ে তাহারা বাঁশ লইয়া সেই আগুনের উপরে এমনি দ্রুত তালে নাচিত যে আগুনের তাপ তাহাদের পায়ে লাগিত না।

তেহের ফকিরের ছেলে রহিম মল্লিকের কথা আগেই একাধিকবার বলিয়াছি। তাকে আমি গ্রাম-সম্পর্কে চাচা বলিয়া ডাকিতাম। চাচা বিবাহ করিলেন অপূর্ব সুন্দরী একটি মেয়েকে। এই মেয়েটির পূর্ব-স্বামী একজন শিক্ষিত চাকুরে ছিলেন। গরীব বিধবাদের যা হয়, বহু অভিভাবকের কৌশল-জাল ছিন্ন করিয়া চাচা এই মেয়েটিকে বিবাহ করিলেন। এজন্য তাঁহার বহু টাকা খরচ করিতে হইল। গ্রামে রটনা হইল, কি চাই, প্রতিমার মত দেখিতে এমন একটি মেয়েকে রহিম মল্লিক বিবাহ করিয়াছে। সেই মেয়েকে একদিন দেখিতে গেলাম। যাইয়া দেখি, সত্যিই তিনি প্রতিমার মত। সম্পর্কে তিনি আমার চাচী হন। চাচী আমাকে পিঁড়ি আনিয়া বসিতে দিলেন। ঘর হইতে মুড়ি আনিয়া খাইতে দিলেন।

বড়ু

ইহারও বহুদিন পরে। তখন আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ, পড়ি। যখনই আমি দেশে আসিতাম গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়িতে যাইতাম! সেবার যাইয়া দেখি রহিম মল্লিকের মেয়ে বড়ু দেখিতে কি সুন্দর হইয়াছে। কতবার ত এই বাড়িতে আসিয়াছি। কোনদিনই ত এই মেয়েটি আমার চোখে পড়ে নাই। বয়স তাহার পনর ষোল হইবে। তার মার আর কি রূপ ছিল! মেয়ে যেন তাঁতী পাড়ার যত সুন্দর সুন্দর নতুন বুনট করা শাড়ী তার সব রঙ গায়ে মাখিয়া আসিয়াছে। মুখের দিকে চাহিলে চোখ নামাইয়া লয়—যেন লজ্জাবতী লতাটি, গায়ে এতটুকু বাতাস লাগিলে পাতার দলগুলি গোটাইয়া লয়। ডুরে শাড়ী পরনে। তার রূপে যেন সমস্ত উঠান আলো হইয়া উঠিয়াছে।

এবার হইতে রহিম মল্লিকের মা, দাদীর সঙ্গে আমার আরও অন্তরঙ্গতা

বাড়িয়া উঠিল। দাদী এককালে ভাল বিয়ের গান গাহিতে পারিত। সেই গান খাতায় লিখিয়া লইতে ঘন ঘন দাদীর সঙ্গে দেখা করিতে লাগিলাম। সব গানের পদ দাদীর ভাল করিয়া মনে নাই। দাদী ডাক দেয়, "ও বড়ু, এ দিকে আয় আমার সঙ্গে গানটি ধর। তোর ভাই শুনিতে চায়।"

এক গা ভরিয়া রূপ আর লজ্জা আড়াআড়ি করিয়া তাহার দেহকে ঘিরিয়া আছে। সহজে কি আসিতে চায়। অনেক ওজর-আপত্তি করিয়া নাতনী আসিয়া দাদীর কাছে বসে। দাদীর মোটা গলার সঙ্গে নাতনীর সরু কণ্ঠ মিলিয়া গানের সুর বিস্তৃত হইতে থাকে। মেয়েলী গানে তেমন সুর-বৈচিত্র নাই কিন্তু সেই একঘেঁয়ে সুরের মধ্যে সুক্ষ্মাতি সুক্ষ্ম যে কারুকার্য আছে তাহা বুঝিবার মত যাহাদের অভ্যস্ত কান আছে তাহারাই মাত্র বুঝিতে পারে। বড়ুর কণ্ঠে সেই সুক্ষ্মাতি সুক্ষ্ম কাজগুলি এমনি করিয়া প্রকাশ পাইতেছিল যা শুধু অনুভব করিবার—বুঝাইয়া বলিবার নয়। দাদী আর বড়ু দুইজনে মিলিয়া গান গাহিয়া চলিল,

গাঙের কুলে কলার গাছটি
ও ভানুলো চিরল চিরল পাতা নারে।
তারির না তলে তারির না তলে
ও ভানুলো খেলায় রঙের পাশা নারে।
পাশা না খেলিতে পাশার বুঝান বুঝাইতে
ও ভানুলো ঘুমে চৈতন হৈল নারে।
ঘুমের ঢোলনী ঘুমের ভুলনী,
ও ভানুলো পাল্কিতে তুইলা দিলি নারে।
পাল্কির হেলনী—পাল্কির দোলনী
ও ভানুলো চৈতন ভাল হৈল নারে।
"এত যে আদরের এত যে দরদের
ও সাধুরে, মা ধন কোথায় রইল নারে।"
"এত যে আদরের এত যে দরদের
ও সাধুরে, বাপজান কোথায় রইল নারে।"
"বাড়িতে নিয়া ঘরে না নিয়া
ও ভানুলো ভাঙব উক্কল গলা নারে।"

সেদিন তাহারা আরও কি কি গান গাহিয়াছিল মনে নাই। বাড়ি ফিরিতে ফিরিতে কেবলই মনে হইতেছিল, এই অভাগিনী ভানু নামের মেয়েটি যেন বড়ু। অপরিণত বয়সে তাহার বিবাহ হইল। বিবাহের পাশা খেলিতে খেলিতে মেয়েটিকে বাপ ভাই তার বরের সঙ্গে পাল্কিতে তুলিয়া দিল। পাল্কির দোলনিতে মেয়েটি জাগিয়া উঠিয়া কাঁদিতে লাগিল। সাধু সওদাগর বর মেয়েটিকে তাহার কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। মেয়েটি বলিল, 'এত যে দরদের—এত যে আদরের আমার মা ধন কোথায় রহিল—আমার বাপজান কোথায় রহিল ?' ছেলেটি তখন বলিল, 'তুমি এত উচ্চৈস্বরে কান্না করিতেছ। বাড়িতে লইয়া গিয়া তোমার এই উচ্চ গলা ভাঙ্গিয়া দিব।' কত শত বৎসরের গ্রাম্যজীবনের এইখণ্ড কাহিনীটি ঘিরিয়া সরু সুরের অপূর্ব কারু-নৈপুণ্যের মধ্যে বড়ু যেন ইনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতেছিল।

আজ যেন আমি অমূল্য সম্পদের অধিকারী হইলাম। ঘরে আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। বড়ুর গানের সুর—তার দুই হাতের নানা রঙের কাচের চুড়িগুলি, তার শাড়ীর পাড়ের নক্সা, সব মিলিয়া আমার ঘরে যেন রাশি রাশি মণি-মানিক্য ছড়াইয়া দিতেছিল।

তখন আমি "সোজন বাদিয়ার ঘাট" পুস্তক রচনা করিতেছিলাম। এই রচনার মধ্যে আমি এই মণি-মানিক্যগুলি কুড়াইয়া আনিয়া সেই বিলম্বিত কাহিনীটিকে নানা নক্সায় ভরিয়া তুলিতে লাগিলাম।

এই সুদীর্ঘ বই লিখিতে যখনই শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি তখনই আমি বড়ুদের বাড়ি যাইতাম, কোনদিন হয়ত লাল, সাদা, নীল নানা রকমের সুতার নাছি নাটায়ের সঙ্গে ফেলিয়া বড়ু দুই পা মেলিয়া বসিয়া চরকা ঘুরাইয়া নলী ভরিত। বাম হাতে নাটায়ের সুতা ধরিয়া ডান হাতে চরকা ঘুরাইত। নাটাই ঘুরিয়া ঘুরিয়া তার হাতের মধ্যে সুতা ছাড়িয়া দিত। চরকার ঘুরনে সেই সুতা যাইয়া নলীর গায়ে জড়াইত। কোন সুতা ছিঁড়িয়া গেলে সে কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া সুতাকে শাসাইত। তারপর চরকা থামাইয়া দুইহাতে সেই সুতাটি জোড়া দিয়া আবার চরকা ঘুরাইত। মাঝে মাঝে গুন গুন করিয়া গান গাহিত। আমার মনে হইত, যেরূপ তাহার অঙ্গে ধরে না তাহাই যেন সে সুতায় ধরিয়া নলীর মধ্যে জড়াইয়া লইতেছে। তাহার স্বামী কাল তাহাই রঙীন শাড়ীর নক্সায় মেলিয়া

ধরিবে। আমি একান্তে বসিয়া এই দৃশ্য উপভোগ করিতাম।

কোন কোনদিন সে উঠানের মাঝখানে ছোট ছোট কাঠি গাড়িয়া তাহার উপর তেনা কাড়াইত! বাম হাতে নাটাই লইয়া ডান হাতে আর একটি কাঠির আগায় নাটায়ের সূতা আটকাইয়া সারা উঠান হাঁটিয়া হাঁটিয়া কাঠিগুলির সঙ্গে সূতা জড়াইয়া দিত। কখনো সাদা, কখনো নীল, কখনো হলদে আবার কখনো লাল। লালে-নীলে-সাদায় হলুদে মিলিয়া সূতাগুলি যেন তারই গায়ের বর্ণের সঙ্গে আড়া-আড়ি করিয়া সেই তেনার গায়ে যাইয়া জড়াইয়া পড়িত। তাহাদের বাড়ির উঠানে একটি প্রকাণ্ড কাঁঠাল গাছ। চারিধারে বড় আম গাছ আর নানা রকম আগাছার জঙ্গল। সেই জঙ্গলে কানাকুয়া কুব কুব করিয়া ডাকিত। 'বউ কথা কও' পাখি ডাকিত। মাঝে মাঝে ঝাঁকে ঝাঁকে শালিক আসিয়া তাহাদের টিনের ঘরের চালায় বসিত। সমস্ত মিলিয়া যে অপূর্ব পরিবেশ তৈরী হইত, আমি অলক্ষ্যে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতাম আর মেয়েটির মতই কল্পনার সূত্র লইয়া মনে মনে জাল বুনিতাম। মেয়েটি আমাকে দেখিতে পাইয়া তার তেনা কাড়ানো রাখিয়া হাসিয়া বলিত, "ভাই! কখন আসিলেন?" তাড়াতাড়ি সে ঘর হইতে একখানা পিঁড়ি আনিয়া আঁচল দিয়া মুছিয়া আমাকে বসিতে দিত। তারপর আবার সে তাহার কাজে মনোনিবেশ করিত। আমি বসিয়া বসিয়া তাহার তেনা কাড়ানো দেখিতাম। সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তেনা কাড়াইতে কাড়াইতে আমার সঙ্গে গল্প করিত।

কোন কোনদিন আসিয়া দেখিতাম, সে উঠানের এক কোণে রান্না করিতেছে। আমি অদূরে পিঁড়ি পাতিয়া বসিতাম। উনানে দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে। সেই আগুনের তাপে তার মুখে ফোঁটায় ফোঁটায় মুক্তাবিন্দুর মত ঘাম শোভা পাইতেছে। ডালের ঘুঁটনী দুই হাতে ঘুরাইয়া সে যখন ডাল ঘুঁটিত তার হাতের কাঁচের চুড়িগুলি টুন টুন করিয়া বাজিত। উনানের আগুন কমিয়া গেলে সে তাহাতে আরও লাকড়ি পুরিয়া দিত। আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিত। সেই আগুন যেন আমার ভিতরেও জ্বলিয়া উঠিত। শাক রাঁধিবার সময় সেই শাক-পাতার গন্ধে সারা বাড়ি আমোদিত হইয়া উঠিত। সেই শাকে ফোড়ং

দেওয়ার সময় সে উত্তপ্ত তৈলের মধ্যে আধসিদ্ধ শাকগুলি ছাড়িয়া দিয়া সেই বনের পাতাগুলিকে সুস্বাদু খাদ্যে পরিণত করিত। কিই বা তাহার সংসার। একখানা মাত্র ছোট ঘর। বাপ তাহাকে উঠানের ও-ধারের ঘরে থাকিতে দিয়াছে। সেখানে কয়েকটি মাটির হাঁড়ি-পাতিল। কতই না যত্নে সেই ঘরখানিকে সে লেপিয়া-পুছিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখে। সেই হাঁড়ি-পাতিলগুলিকে সে ধুইয়া মুছিয়া কত যত্ন করিয়া যেটা যেখানে শোভা পায় সেখানে সাজায়। মাটির শানকিখানি তার উপরেও তার যত্নের পরিসীমা নাই। মনে বলে, আমি যদি ওর ঘরের কোন একটা জিনিসে পরিণত হইতে পারিতাম—ও আমাকে এমনি করিয়া যত্ন করিত। শুধুই মনে মনে ভাবি। মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলিবার সুযোগ পাই না। আমি আসিলে দাদী আসিয়া সামনে বসেন। চাচী আসিয়া সামনে বসেন। কত রকমের কথা হয়। কিন্তু যে কথা বলিতে ইচ্ছা করি, সে কথা বলিতে পারি না।

দাদীকে গান গাহিতে বলি। দাদী বলে, "এখন নয় ভাই! সব বাড়িতে লোক। আমি গান গাহিলে লোকে বলিবে, ষাট বছরের বুড়ি ভীমরতি ধরিয়াছে। এই দুপুরবেলা গান ধরিয়াছে! হাটের দিন বিকালে আসিও। তোমাকে প্রাণ ভরিয়া গান শুনাইব।"

হাটের দিন তাঁতী পাড়ার পুরুষেরা শাড়ী কাপড় লইয়া হাটে যায়। মেয়েরা মাথায় তেল-সিঁদুর পরিয়া এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরিয়া বেড়ায়। বুধবারের হাটের দিন বিকাল বেলা দাদীর বাড়িতে যাইয়া উপস্থিত হই। "ও দাদী! মনে আছে নি? গান শুনাইবার দাওয়াত দিয়াছিলে।"

চাচী বড়ুর মাথায় একরাশ চুল খুলিয়া চিরুণী দিয়া আচড়াইতেছিল। দাদী আবার চাচীর মাথার চুল খুলিয়াছে। প্রত্যেকেই দুই হাঁটু সামনে ভাঙ্গিয়া বসিয়াছে। যেন কত কালের গাছটি হেলিয়া পড়িয়াছে। দাদী তার গোড়ালী, চাচী গাছের শাখা—আর বড়ু সেই গাছের ফুল হইয়া হাসি ঝলমল করিতেছে।

পাশের পিঁড়িখানা দেখাইয়া দাদী বলেন, "বস ভাই—বস।"

পিঁড়ি পাতিয়া বসি। দাদী গান আরম্ভ করে! রামসাধুর গান। কত শত শত বিবাহ উৎসবে দাদী এই গান গাহিয়াছে। সেই সব বিবাহ

উৎসবের বিগত স্মৃতি দাদীর কণ্ঠে ভরা। সেই সঙ্গে চাচী আর বড়ুও গানে সুর মিলায়। অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ—তিন সুর যেন একত্রে আসিয়া মেলে। তিন নদী যেন এক নদীতে আসিয়া ঢেউ খেলায়। গানের কলি দল মেলিতে থাকে—

"শাশুড়ী তো বলিলো, গুণের শাউড়ী বলিলো,
ও হারে তোমার পুত রইল কোন্ বা স্থাশেরে।"

"আমার না পুত লো, ও বউলো পঞ্চফুলের ভোমরা লো,
ও হারে একফুলে রইল মন মজিয়া নারে।"
ঘরে ত আছে লো, ও বউ লো পেটরা ভরা জেওর লো,
তুমি উহাই দেইখা পাশইরো রামসাধুরে।"

"ও পেটরার জেওর লো, শাউড়ি আমি লুটেরে বিলাব লো,
আমি তেও না যাব রামসাধুর তালাশেরে।"

"ঘরে ত আছে লো, ও বউ লো কৌটা ভরা সিন্দুর লো,
তুমি উহাই দেইখা পাশইবো রামসাধুরে।"

"ও কৌটার সিন্দুব লো, শাউডি আমি বাতাসে উড়াব লো,
আমি তবু যাব রামসাধুর তালাশেরে।"

এই রামসাধু কে জানি না। সে হয়ত অধিকাংশ পুরুষ জাতিরই প্রতীক। পঞ্চফুলের ভোমর হইয়া সে এক ফুলে মন মজিয়া আছে। শাশুরীর উপদেশ মত পেটরা গহনা আর কৌটা ভরা সিন্দুর দেখিয়া কি বালিকা বধু তার মনের দুঃখ পাশরিয়া থাকিতে পারে? পেটরার অষ্ট অলঙ্কার সব লুটেরে বিলাইয়া দিবে। কৌটার সিন্দুর সে বাতাসে উড়াইয়া দিবে। তবু সে রামসাধুর তালাশে বাহির হইয়া যাইবে।

সেদিন আরও দুই তিনটি গান হইল। একটি গানের প্রথম পদটি মনে আছে :

"আরে শ্যাম, গাঙে আইলরে নতুন পানি।"

এরপর প্রায়ই আমি বড়ুদের বাড়ি যাইতাম। মনে মনে কত কথা তাহাকে

তাহাকে বলিব বলিয়া কল্পনা করিয়া যাইতাম। কিন্তু ছোট তাহাদের বাড়ি। ও-ঘরে চাচী, ওখানে দাদী। আজে বাজে গল্প করিয়া চলিয়া আসিতাম। মনের কথা মনেই থাকিত। বাড়ি আসিয়া ভাবিতাম, কি কথাই বা তাহাকে বলিতে পারিতাম। সে অপরের স্ত্রী। তাকে একান্তে বলিবার মত কোন কথাই তো আমার ছিল না।

আমি তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ, পড়ি। ছুটি ফুরাইয়া গেলে কলিকাতা চলিয়া যাইতাম। পূজার ছুটিতে আবার দেশে আসিয়া বড়ুদের বাড়ি আসিতাম। এবার বড়ুর চেহারাটি আরও সুন্দর হইয়াছে। কত দেশে সুন্দর কন্যার কাহিনী খুঁজিয়া বেড়াই। আমার দেশে আমারই গাঁয়ে এমন সুন্দর কন্যা! এই চাঁদ আমারই আঙিনায় আসিয়া খেলা করিয়াছিল। তখন হাত বাড়ালেই ধরিতে পারিতাম। আজকের চাঁদ যে কত দূরের আকাশে। কোন রকমেই তাকে হাতে নাগাল পাইতে পারি না। একদিন বড়ুকে একান্তে পাইয়া বলিলাম, 'বড়ু' আগে যদি জানিতাম তোকে আমার এত ভাল লাগিবে, তবে কি তোরে অপরের ঘরনী হইতে দিতাম?" বড়ু ম্লান হাসিয়া বলিল, "ভাই! ও কথা বলিবেন না। উহাতে গুনা হয়।"

বড়ুর বর আব্বাস কুড়ের হদ্দ। একদিন যদি কাপড় বুনায় ত তিন দিন ঘুরিয়া বেড়ায়। অথবা ঘরের মেঝেয় পড়িয়া ঘুমায়। বড়ু তেনা কাড়াইয়া বসিয়া থাকে। গামলাতে তার সন্তভরা নলীগুলির সূতা শুকাইয়া যায়। তবু সে কাপড় বুনাইতে বসে না, এমন সুন্দরী বউ-এর জন্য স্বামীর যে তপস্যা করার প্রয়োজন সে তাহা মনেও আনে না। কোন দিন তাহারা খায়—কোনদিন খায় না। এজন্য স্বামীর প্রতি বড়ুর কোনই অভিযোগ নাই।

সেবার শুনিতে পাইলাম, বড়ুর হাতে গলায় যে কয়খানা সোনার গহনা তার বাপ তাহাকে বিবাহের আগে দিয়াছিল, তাহা চোরে লইয়া গিয়াছে। বড়ু বসিয়া কাঁদিতেছে। বড়ুকে কি আর সান্ত্বনা দিব! মেয়েরা গহনা ভালবাসে তার কারণ গহণাগুলি তাহাদের দুদিনের সম্বল। অভাবের দিনে এই গহনাগুলি বেচিয়া জীবন ধারণ করা যায়। এগুলি লইয়া দরকার হইলে তাহারা স্বামীর অন্যায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারে। আব্বাস ত

তাহাকে আর গহনা কিনিয়া দিতে পারিবে না। বৃথা কয়েকটি সান্ত্বনার বাক্য বলিয়া চলিয়া আসিতেছিলাম, দাদী আমাকে হাত ইশারায় ডাক দিল। কাছে যাইতেই দাদী বলিল, "ভাইরে! দুঃখের কথা কাহাকে বলিব? এই গহনাগুলি আব্বাস নিজেই চুরি করিয়াছে। কোথায় যেন বিক্রী করিয়া আসিয়াছে। সেই টাকার কিছু দিয়া চাউল কিনিয়া আনিয়াছে, তরিতরকারী কিনিয়া আনিয়াছে। কিন্তু এই পোড়ামুখী কিছুতেই একথা বিশ্বাস করিতে চাহে না। ও যদি সোয়ামীকে শাসানী দিত, তবে গহনা গুলি কি না বাহির করিয়া পারিত? কিন্তু ও তাকে কিছুই বলে না।" অনেক কথা ভাবিতে ভাবিতে গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

একবার বড়ুর সামান্য জ্বর। আব্বাস তার জন্য এক ফোঁটাও পথ্য কিনিয়া আনে নাই! আমি ঔষধ-পথ্যের জন্য কয়েকটি টাকা বড়ুর হাতে দিলাম। সে অতি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমার দিকে তাকাইয়া টাকা কয়টি গ্রহণ করিল। আমি বড়ুকে বলিলাম, "বড়ু। আব্বাসের হাতে পড়িয়া তোমার কষ্টের অন্ত নাই। সে তোমাকে দুইবেলা ভালমত আহারও দিতে পারে না। ইচ্ছা করিলেই তুমি এই অভাবের বন্ধন-কাটাইতে পার। তুমি যদি একটু আভাস দাও তোমাকে লইয়া গিয়া আমি রাণীর হালে রাখিতে পারি।"

বড়ু কিছুই বলিল না। বালিশের তলা হইতে টাকা কয়টি অনেক কষ্টে খুঁজিয়া বাহির করিয়া বলিল, "ভাই! আমার টাকার কোনই দরকার নাই। টাকা আপনি লইয়া যান।"

বড়ুর এই সামান্য কথাগুলি আমার পিঠে যেন চাবুকের আঘাত করিল। অনেক মিনতি করিয়া বলিলাম, "বড়ু। তুমি আমাকে মাফ কর। আমি তোমার দুঃখ-কষ্ট দেখিয়া সহ্য করিতে পারি নাই বলিয়াই এরূপ বলিয়াছি।"

বড়ু বলিল, "ভাই! আমার দুঃখ কি আপনি দূর করিবেন? আমি কবরে না গেলে এ দুঃখের শেষ হইবে না।"

আমি তাহার হাত দুইটি ধরিয়া বলিলাম, "বড়ু। আমি ত তোমার বড় ভাই। ছোট বোন হইয়া বড় ভায়ের অপরাধ কি মাফ করা যায় না?"

বড়ু বলিল, "ভাই। মাফ করিতে পারি, যদি আপনি কিরা করেন

এ সব কথা আর আমাকে বলিবেন না। আমার ললাটে যা লেখা ছিল তাহাই আমার হইয়াছে। তাহা আপনি কেমন করিয়া খণ্ডাইবেন?"

আমি বলিলাম, "বড়ু! তোমাকে আমি মনে মনে যে কতটা জানি তা আমার অন্তরই শুধু জানে। আমার দুনিয়ার সমস্ত জায়গা জুড়িয়া আছ তুমি। তোমার ইচ্ছার উপরে কি আমি কোন কথা বলিতে পারি? আজ তোমার দু'খানা হাত কপালে ধরিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম এরূপ কথা আর তোমাকে কোনদিন বলিব না। তুমি এই টাকা বালিশের তলায় যেখানে রাখিয়াছিলে সেইখানে রাখিয়া দাও।"

বড়ু তাহাই করিল! তারপর আমাকে যেন খুশী করিবার জন্য একথা সে কথা কত কথাই বলিল, "ভাই! তোমার শরীরটা যেন খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। ভালমত খাওয়া দাওয়া কর। আচ্ছা ভাই। তুমি এত বড় ডাঙর হইলে বিবাহ করিলে না? তোমাব বিয়ের দিন আমি যাইয়া দলবল লইয়া গান গাহিয়া আসিব।"

বাড়ি ফিরিতে কত কথাই মনে পড়িল; এই গরীব অশিক্ষিতা মেয়েটি এত বড় চরিত্রের বল কোথা হইতে পাইল। বর্তমান শিক্ষার আলোক পাইয়া আমরা একনিষ্ঠ প্রেমে বিশ্বাস হারাইয়াছি। কিন্তু এই মেয়েটি এক গা সৌন্দর্য লইয়া কোন্ শক্তির বলে এই অলস অপদার্থ স্বামীর গৃহে অনাহারে অবহেলায় দিনের পর দিন কাটাইতেছে। সে যদি মাত্র এতটুকু ইঙ্গিতও করিত, আমি তাহাকে অনায়াসে এই দরিদ্র জীবন হইতে টানিয়া আনিয়া রাণীর হালে রাখিতে পারিতাম। পদ্মা নদীতে চর পড়ায় আমার পিতা তখন অনেক জমি-জমার অধিকারী। আশে-পাশের চার পাঁচ গ্রামের মধ্যে আমার পিতার অবস্থা সব চাইতে ভাল। আমিও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সত্তর টাকা করিয়া জলপানি পাই। মেয়েটি ইহার সব কিছুই জানিত। আমার নীরব ভালবাসার ইঙ্গিত ত সে কত ভাবেই পাইত। তবু একদিনের জন্যও তাকে আপন আদর্শ হইতে কিঞ্চিৎ বিচ্যুৎ করিতে পারিলাম না। এই শক্তি সে কোথা হইতে পাইল, বার বার এই কথা আমার মনে হইতে লাগিল। আজও এই প্রশ্ন আমার মন হইতে যায় নাই। কিন্তু কোন সদুত্তরই খুঁজিয়া পাইলাম না।

এই দেশের মাটিতে বেহুলা লখিন্দরের কাহিনী জন্মলাভ করিয়াছিল।

সাত দিনের শিশু-স্বামীকে কোলে করিয়া রূপবান কন্যা বনে-বনান্তরে ঘুরিয়া নানা বিপদের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। সুদূর বানিয়াচঙ্গ অঞ্চলে আজও সোনাই বিবির কবরে পুরললনারা সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালাইয়া স্বামীর মঙ্গল কামনা করে। শিশু বয়স হইতে এই মেয়েটি সেই সব কাহিনীর অধিকারিণী। তাই আজ তার কুঁড়ে ঘরের আঙিনায় এই মেয়েটি যে সতীর পাঠ রচনা করিয়াছে, সেখানে রাক্ষস-খোক্কস আসিয়া হানা দেয় না—বনের বাঘ আসিয়া খাইতে চাহে না কিন্তু নিত্য নতুন নতুন অভাব আসিয়া তাহাকে হানা দেয়। দারুণ রোগ-ব্যাধী আসিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে চায়, নানা প্রলোভন আসিয়া তাহাকে জয় করিতে চায়। তবু সেই সতী-লক্ষ্মীর আসনটি সে চির অম্লান করিয়া রাখিয়াছে।

ইহার পর আরও কতবার বড়ুর সঙ্গে দেখা করিয়াছি। কলিকাতা হইতে শাড়ী কিনিয়া আনিয়া গোপনে তাহাকে দিয়া আসিয়াছি। ঈদের দিন আমাদের বাড়িতে সমস্ত গ্রামের লোক খাইত। বড়ুদের জন্য ভাল ভাল খাবার তুলিয়া রাখিতাম। রাত হইলে ডালায় করিয়া সেই খাবার গুলি মাথায় করিয়া বড়ুদের বাড়ি যাইতাম।

"দাদী! ঘুমাইয়া আছ নাকি! সারাদিন লোকজনের খাওয়া-দাওয়ার গণ্ডগোলে আসিতে পারি নাই। তোমার জন্য সামান্য খাবার আনিয়াছি।"

দাদী উঠিয়া কেরোসীনের কুপী জ্বালায়। খাবারগুলি নামাইয়া দেই।

"এ কিরে ভাই। এই বুঝি সামান্য খাবার? আমি বুড়ো মানুষ এত খাইতে পারিব? ও বড়ু এদিকে আয়। দেখ, তোর ভাই কত কি খাবার আনিয়াছে?" ও-ঘর হইতে কুপী জ্বালাইয়া বড়ু আসে। দাদী আর নাতনী দুইজনে মিলিয়া খাবারগুলি খায়। কোথাকার তৃপ্তিতে যেন মন ভরিয়া ওঠে। বেশীক্ষণ দেরী করি না। যদি কেহ কিছু মনে করে। যাইবার সময় চাচী উঠিয়া হাতের মধ্যে একটি পান গুঁজিয়া দেয়। "শ্বশুর! পান না খাইয়া যাইবার পারিবে না।"

যে কয়দিন দেশে থাকি চব্বিশ ঘণ্টা বড়ুদের বাড়ি যাইতে ইচ্ছা করে। কিন্তু ঘন ঘন যাই না। ওরা গরীব মানুষ। আমাকে লইয়া যদি এই পাপলেশহীন মেয়েটির কোন বদনাম হয় তবে ওরা সহ্য করিতে পারিবে না।

কোন কোনদিন অনেকগুলি সন্দেশ কিনিয়া আনিয়া দাদীকে বলি,

"দাদী ! দাদা ত তোমাকে কত মেঠাই-মণ্ডা কিনিয়া আনিয়া খাওয়াইত ! আজ দাদা ত নাই। দাদার কাজটা আজ আমিই করি।"

দাদী সন্দেশের ঠোঙাটি হাতে লইয়া বড়ই খুশী। "ও বড়ু, এদিকে আয়। দেখ, তোর ভাই আজ আবার কি আনিয়াছে !"

বড়ু আসিয়া দাদীর কাছে বসে। অধিকাংশ সন্দেশই দাদী নাতনীকে দিয়া খাওয়ায়। দাদী হয়ত মনে মনে জানে কার জন্য এই সন্দেশ আনিয়াছি।

দাদীকে জিজ্ঞাসা করি, "আচ্ছা দাদী। কও ত তোমাকে দাদা কেমন করিয়া আদর করিত ?"

দাদী কিছুতেই বলিতে চাহে না। লজ্জায় যেন দাদী ঘরের কনে-বউটি হইয়া যায়। "দাদী তোমার পায়ে পড়ি, তোমাদের কালের এতটুকু প্রেমালাপের কথা বল।"

আমার বলার ভঙ্গি দেখিয়া বড়ু হাসিয়া কুটি কুটি হয়। দাদী বলে, "দেখ ত পাগলের কাণ্ড। সেই কালের কথা কি আমার মনে আছে ?"

"আচ্ছা ! কও না দাদী ! আমরা তোমার নাতী-নাতনী। আমাদের কাছে তোমার শরম কিসের ? বিয়ের রাইতে দাদা তোমাকে কেমন করিয়া আদর করিয়াছিল ?"

দাদী আরম্ভ করে, "আরে ভাই ! সে কথা কি আমার মনে আছে ? পাঁচ ছয় বছর বয়সে আমার বিয়া হইয়াছিল। একদিনের কথা তবে বলি। তোমার দাদা আম পাড়িতেছে। আমি তলায় দাঁড়াইয়া আছি। তোমার দাদা করিল কি, গাছ হইতে নামিয়া এ-দিক ও-দিক চাহিয়া দেখিল কেউ লক্ষ্য করিতেছে কিনা। তারপর পাঁচ ছয়টি আম আমার কোঁচড়ে ঢালিয়া দিল। আমি ত বউ মানুষ। এই আম কোথায় বসিয়া খাইব। করিলাম কি জঙ্গলের মধ্যে যাইয়া আমগুলি খাইয়া হাত মুখ গাছের পাতায় মুছিয়া তবে বাড়ি আসিলাম। একবার হাট হইতে আসিয়া তোমার দাদা আমাকে বলে, "এদিকে আইস।" আমি এ-দিক ও-দিক চাহিয়া দেখি শাশুড়ী-ননদীরা কেহ কোথাও নাই। কাছে যাইতেই তোমার দাদা আমার হাতে আট দশখানা বাতাসা দিল। আমি ত সেই বাতাসা মুখে দিয়াছি, অমনি ছোট ননদী আসিয়া আমাকে এ-কথা সে-কথা জিজ্ঞাসা করে। আমি ত কথা বলিতে পারি না। মুখে বাতাসা। সে শাশুড়ীকে ডাকিতে গেল, 'মা দেখ

দেখ, ভাবী কথা বলে না কেন?

"আমি তখন তাড়াতাড়ি এক গ্লাস পানি আনিয়া মুখে দিলাম। শাশুড়ী আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, 'বউ কি হইয়াছে?' 'আমি বলি,' কিছু হয় নাই ত আম্মাজান।"

দাদীর এই সব কথা শুনিতে শুনিতে বড়ু হাসিয়া কুটি কুটি হয়! তার মুখখানি খুশীতে আরও সুন্দর দেখায়।

ছুটি ফুরাইলে কলিকাতা চলিয়া আসি। হোষ্টেলের নির্জন কক্ষে বসিয়া বড়ুর কথা মনে হয়। আহা! এমন সুন্দর মেয়েটি। আর এমন তার সুরেলা গলা। ওকে গান শিখাইলে সে কত ভাল গান গাহিতে পারিত। মনে মনে কল্পনা করি। ছোট খড়ের দুইখানা ঘর। নলখাগড়ার বেড়া দেওয়া। চারি-দিকে আঁধার করিয়া কলাবন। কলার পাতাগুলি সেই ঘরের চালার উপর নুইয়া পড়িয়াছে। ঘর দু'খানার মাঝখানে ছোট্ট উঠান। সেখানে লাল নটের কেয়ারী, জাঙলা ভরিয়া লাউ কুমড়া দোল খাইতেছে! তারই এক পাশে বড়ু গৃহ-কাজে রত। সামান্য তার অভাব। ঘরে ডোল ভরা ধান। মেঝেয় কলসী ভরা শীতল পানি। আথালে দুগ্ধবতী গাভী। বড়ুর জীবনে কি মাটির এই ক্ষুদ্র বেহেস্ত কখনও নামিয়া আসিবে? আহা? এই মেয়েটিকে যদি গান শিখাইতে পারিতাম; পাড়াগাঁয়ে যে সব গান সে জানে সেই গানগুলির মধ্যে যদি আরও একটু প্রাণ-রস ঢালিয়া দিতে পারিতাম? তারই জানা অজানা যে সব কেচ্ছা-কাহিনী গ্রাম দেশে প্রচলিত, সেগুলির এখানে ঘুরাইয়া সেখানে ফিরাইয়া যদি তার মধ্যে আরও একটু মধু ঢালিয়া তাকে শিখাইতে পারিতাম, সমস্ত পল্লী বাঙলার রূপ তার মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিত। সেই গৃহ-পরিবেশের মধ্যে সে ধরিয়া রাখিত বিস্মৃত-প্রায় পল্লী বাঙলার শিক্ষা দীক্ষা তার আদর্শবাদ—তার শত সহস্র বর্ষের সাধনায় পাওয়া ভাবপ্রবণতা। দেশ দেশান্তর হইতে লোক আসিয়া সেই ভাবপ্রবণতার উত্তরাধিকারী হইয়া যাইত। ভাবিতে ভাবিতে কোথাকার লজ্জায় যেন রাঙা হইয়া উঠিতাম। আহা! এই মেয়েটি যদি আমার ঘরের ঘরনী হইত! ওইখান দিয়া কাঁখে কলসী লইয়া নদীতে জল আনিতে যাইত। আঁকাবাঁকা গাঁয়ের পথ। দু'ধার হইতে বড় বড় গাছগুলি শাখা বাহু বিস্তার করিয়া দিত। চলিতে চলিতে কণ্টক গাছে তাহার শাড়ীর আঁচল জড়াইত। কাঁখের শূন্য কলসী

মাটিতে নামাইয়া গাছের শাখা হইতে আঁচল ছাড়াইত-এমন সময় দূর হইতে পাখিটি ডাকিয়া উঠিত—"বউ কথা কও। বউ কথা কও।" আঁচল ছাড়াইয়া হাসিতে হাসিতে সে নদীর ঘাটে যাইত।

জোছনা ধবধব রাত্রি। শিশির ভেজা কলার পাতার উপর চাঁদের আলোর ঝিকিমিকি। বারান্দায় বসিয়া বউটি রঙ-বেরঙের স্তা দিয়া সিকা বুনাইতেছে আর গুন গুন করিয়া গান গাহিতেছে। আমি এক পাশে দাঁড়াইয়া দেখিতেছি।

আহা! এই স্বপ্ন কি আমার জীবনে সফল হইবে কখনো? একদিন বড়ু বলিয়াছিল, "ভাই ও সব কথা বলিবেন না। ও সব শুনিলে গুনা হয়। সেই কথার প্রতিধ্বনি আসিয়া আমার মনের সকল কল্পনা ভাঙিয়া দেয়।

বড়ুর কোলে একটি ফুটফুটে ছেলে হইল। কি সুন্দর হাসি খুশী মুখ। বড়ুর কোল হইতে তাকে কোলে লইতে তাহার গায়ের সঙ্গে আমার হাত লাগিয়া যাইত। তার উষ্ণ দেহের তাপ বহুক্ষণ ধরিয়া মনে মনে অনুভব করিতাম। এই ছেলেটিকে বড়ু কতই না ভালবাসিত। ছেলে ত নয়, যেন তার মনের মত একটি খেলনা। শিশুর মত এই খেলনাটিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তার মায়েলী বুকের যত স্নেহ আছে সব যেন কথার ফুলে ভরিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দিত। আমি চাহিয়া চাহিয়া তার ছেলেকে আদর করা দেখিতাম। বড়ু বলিত, "ভাই! ও বড় হইয়া আপনার সঙ্গে লেখাপড়া করিতে যাইবে। এই পথে কলিকাতার গাড়ী আসিবে। আমার যাদু সেই গাড়ীতে চড়িয়া যাইবে।" বড়ু এই কথা বলিত আর খল খল করিয়া হাসিত।

এবার বড়ুর চেহারা আরও সুন্দর হইয়াছে। সারা গায়ে যেন তার রূপ ধরে না। এত যে অভাব, এত যে অনটন, বড়ুর মনে আর দেহে তার এতটুকুও দাগ কাটে নাই। দীঘির পদ্ম ফুলটির গায়ে যেমন কোন জলের দাগ লাগে না, দু'একফোঁটা জল তার এখানে সেখানে শোভা পায়, তেমনি তার ছিন্ন শাড়ীতে অবিন্যাস্ত কেশপাশে অভাব যেন মুক্তা বিন্দু হইয়া শোভা পাইতেছে। বড়ুকে কোনদিন এমন সুন্দর দেখি নাই।

সেবার কলিকাতায় অনেকদিন কাটাইলাম। নির্জন গৃহ কোণে বসিয়া বড়ুর চেহারা কল্পনা করিতে চেষ্টা করিতাম। একটি ভাল গান শুনিলে

যেমন তার পদগুলি মনে থাকে না, সুরের একটু মাত্র রেশ কণ্ঠে আসিয়া মন-প্রাণ আকুলি-বিকুলি করিতে থাকে। তেমনি বড়ুর চেহারা ভাবিয়া ভাবিয়া কিছুতেই স্পষ্ট করিয়া ভাবিতে পারিতাম না। আবছা আবছা ভাসা ভাসা তার চেহারা মনের পর্দায় আঁকিতে যতই চেষ্টা করিতাম ততই তাহা ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া যাইত। আবার নতুন করিয়া তাহাকে সেই অদৃশ্য পটে আঁকিতে চেষ্টা করিতাম। মনে মনে ভাবিতাম, এবার দেশে যাইয়া বড়ুকে বলিব, "বড়ু! তুমি আমার বোনটি হইয়াই রহিও। এই যে তোমাকে দেখিয়া আমার ভাল লাগে, এটাই কি কম লাভ? জীবনে ভাল লাগিবার লোক কোটিতে গুটিক মেলে। সুন্দর বলিয়াই তুমি আমার এত আপনার নও। ভাল বলিয়াই তোমাকে এত ভালবাসি। আমি যেন জীবনে এমন কোন কাজ না করি যাহাতে তোমার এই সুন্দর জীবনে এতটুকুও অকল্যাণ আনিয়া দেয়।"

বড়ুর জন্য এটা-ওটা কিনি। ছোট খাটো জিনিস যা গোপনে তাকে দিয়া আসা যায়। ছেলের দুধ খাইবার চামচ—সিন্দুবেব কৌটা, চিরুণী, রঙিন পাথরের মালা—আরও কত কি!

বড়ুদেব বাড়ির পূবদিক দিয়া বাড়ি যাইবার রাস্তা। হদা মল্লিকের তালগাছ ছাড়াইতে পিছন ফিবিয়া চাই। ওই ঘন আম বাগানেব ছায়ে লেপা-পোছা উঠানেব ধাবে বড়ু হয়ত ঘরেব ছোট খাটো কাজকর্ম করিতেছে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া লাল, নীল সুতা লইয়া উঠানে তেনা কাড়াইতেছে। মনে বলে, এখনই যাইয়া তাহাকে দেখিয়া আসি। তার জন্য যাহা যাহা আনিয়াছি তাহা পাইয়া সে কত সুখী হয়, দেখিয়া চক্ষু জুড়াইয়া আসি। কিন্তু পা চলে না। ছোট গ্রাম। দেশে আসিয়া এখনই যদি ওদের বাড়ি যাই পাড়ার লোকে এ-কথা সে-কথা বলিতে পারে। ওরা গরীব! কতই অসহায়! গ্রাম্য কুৎসার হাত হইতে ওরা নিজেদের রক্ষা করিতে পারিবে না। সেদিন চলিয়া যায়। তার পরের দিনও চলিয়া যায়। আমার বুকের নিশ্বাসের মত রাত যেন শেষ হইতে চাহে না। তবু রাত শেষ হইল। আরও একটু বেলা হইলে বড়ুদের বাড়ি যাইব। লস্কর তালুকদারের বাড়ির পাশ দিয়া নদীর ধার দিয়া পথ যাইয়া মিশিয়াছে শ্মশান ঘাটের রাস্তায়। দূরে

ওই পাশে হদা মল্লিকের তালগাছ তারপরে আজিম মল্লিকের বাড়ি। তাদের উঠান পার হইলেই বড়ুদের বাড়ি। চারিদিক নীরব থম থম। কেহ কোন কথা বলে না। বড়ুদের উঠানে কয়েকটি খণ্ড খণ্ড কলাগাছ। ও-পাশে সদ্য খোদিত মাটির কবর। আমগাছের ঘন ছায়া সেখানে অন্ধকার বিস্তার করিয়া আছে। উঠানে আসিতেই চাচী হামলাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, "আমার বড়ু আমাকে ছাড়িয়া চির জনমের মত চলিয়া গিয়াছে।"

তিনদিন আগে তার প্রসব বেদনা উঠিয়াছিল। গ্রাম্য হাতুড়ে দাই, ওঝা তাদের যতটা সাধ্য মন্ত্র-তন্ত্র করিয়াছে। কিছুতেই কিছু হইল না। "জবাই করা মুরগীর মত মা আমার গত তিনদিন ধরিয়া কেবল ছটফট করিয়াছে। আমাকে কাছে ডাকিয়া হাত দু'খানা বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। মাকে বলিয়াছি, 'আমি অভাগিনীর হাতে ত আল্লা এমন কোন দাওয়াই লেখেন নাই, যে তোর সকল দুঃখের উপশম হইবে। মারে! সবুর করিয়া থাক্। চুপ করিয়া সহ্য কর্। চুপ করিতে করিতে মা আমার চিরজনমের মত চুপ হইয়া গেল।" এই বলিয়া চাচী ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। খানিক কাঁদিয়া চাচী আবার বলিতে লাগিল, "মরনেও মার গায়ের বন্নক এতটুকু মৈলাম হয় নাই। মায়ের আমার সোন্দলের মত হাত পা, পিরদিমির মত চোখ মুখ। সকলে মাকে যখন নাওয়াইয়া-ধোয়াইয়া গোরের কাফন পরাইয়া লইয়া গেল তখন যদি দেখিতে বাবা মা যেন সাজিয়া গুজিয়া বেড়াইতে বাহির হইল!"

চাচীর উঠানে কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বড়ুর কবরের কাছে আসিলাম। মূক মাটির কবর কথা বলে না। আমার মনের সান্ত্বনা তাই মাটি খুড়িয়া বাহির হইল না। আজ বড়ুর কবরের পাশে বসিয়া দুই ফোঁটা চোখের জল ফেলিবারও সাধ্য আমার নাই। আমি তাহার কে, যে তাহার কবরে বসিয়া চোখের জল ফেলিব? জীবনে যাহাকে কোনদিন নিজের মনের আকুতি জানাই নাই পাছে লোকে তাকে কিছু বলে; আজ তার কবরের পাশে বসিয়া অশ্রুবিসর্জন করিয়া তার সেই শুভ্র পবিত্র জীবনে কেন কালিমা লেপন করি? পায়ের উপর পা ফেলিয়া নদীর ধারে আসিয়া বসিলাম। নদীতে আর কতটুকু পানি ধরে যে আমার অশ্রুধারার সঙ্গে প্রতিযোগীতা করিবে? কত কথাই মনে আসিতে লাগিল। আমি কেন

বাড়ি আসিয়াই বড়ুকে দেখিতে গেলাম না? আমি আসিবার পরেও বড়ু দুই তিনদিন জীবিত ছিল।

আল্লা যাহাকে লইয়া যান কেহ তাহাকে ফিরাইতে পারে না। আহা! দশজনের মত যদি এই কথা বিশ্বাস করিতে পারিতাম! জীবনে কত লোকের অসুখে কত রাত জাগিয়াছি, কত জনের জন্য ডাক্তার ডাকিয়া আনিয়াছি—ঔষধ কিনিয়া দিয়াছি। বড়ুর এই বিপদের দিনে আমি তার কোন কাজেই আসিতে পারিলাম না। মৃত্যু-যন্ত্রণায় কাতর বড়ু কি একবারও আমার কথা ভাবিয়াছিল, সে কি পথের দিকে চাহিয়াছিল, ভাই আসিয়া তাহার সকল যন্ত্রণা দূর করিয়া দিবে? যাহাকে সমস্ত দুনিয়া ধরিয়া দিতে কার্পণ্য করিতাম না, তাহার জীবনের এই চরম ক্ষণে আমি তার কোন কাজেই আসিলাম না। হয়ত আমার সেবার মধ্যে কোন কলুস লুক্কায়িত ছিল। হয়ত আমি তার উপকারের উপযুক্ত ছিলাম না। তাই জীবনের চরম ক্ষণেও সে আমার কোন দান গ্রহণ করিল না।

চাচী যতদিন বাঁচিয়াছিল দেশে গেলেই দেখা করিতাম! ছোট মেয়েটিকে লইয়া চাচী আবার বিয়ের গান গাহিয়া আমাকে খুশী করিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু আগের মত সেই গান আর জমিত না। কয়েক বছর চাচী মারা গিয়াছে। রহিমদ্দীন চাচা এখন বৃদ্ধ। আমাকে দেখিলেই গলা জড়াইয়া ধরিয়া আদর করে। তাহার বাড়ির সেই কাঁঠাল গাছটিতে এখনো বুনো পাখি আসিয়া ডাকে। সেখানে বসিয়া ভাবি, আমার জীবনের আপনজনেরা ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে। জীবন-নাট্যে যারা অভিনয় করিতে আসিয়াছিল তারা ধীরে ধীরে বিদায় লইয়া যাইতেছে। স্নেহময়ী সদা হাস্য মুখরা দাদী, সোনার প্রতিমা বড়ু, মাতৃরূপিণী চাচী, এরা কি আর ফিরিয়া আসিবে? বৃদ্ধ রহিমদ্দীন চাচার মাটির প্রদীপটি ধীরে ধীরে নিবিয়া আসিতেছে। হয়ত কোনদিন খবর পাইব, সেও চলিয়া গিয়াছে। জীবনের আগিলা পথে আরও কতজনের সঙ্গে দেখা হইয়াছে—কতজনের সঙ্গে দেখা হইবে, কিন্তু যারা চলিয়া গিয়াছে তাদের মত আর কাহাকেও পাইব না।

সমাপ্ত